দ্য সিক্রেট অভ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস

জুল ভার্ন অমনিবাস

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ 3
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 17
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 32
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 48
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 55
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 64
সপ্তম পরিচ্ছেদ 77
অষ্টম পরিচ্ছেদ 90
নবম পরিচ্ছেদ 107
দশম পরিচ্ছেদ 125
একাদশ পরিচ্ছেদ 137
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 152
এয়োদশ পরিচ্ছেদ 161

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 177
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 194
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 208
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 227
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 243
উনবিংশ পরিচ্ছেদ 250

প্রথম পরিচ্ছেদ

আর যত শিগগির পারিস আসিস কিন্তু ভাই, অঁরি; আমি খুব অধীরভাবেই তোকে আসতে লিখছি। তাছাড়া, এ-দেশটাও চমৎকার, দক্ষিণ হাঙ্গেরির এই জেলাটা সত্যি যে-কোনো এনজিনিয়ারকে উসকে দিতে পারে। অন্তত শুধু সেই কারণেও এখানে আসবার জন্যে কষ্ট স্বীকার করাটা তোর কখনও ক্ষোভের কারণ হবে না। তোকে ভালোবাসা জানাই,

তোরই

মার্ক ভিদাল

চৌঠা এপ্রিল ১৭৫৭তে আমার ছোটোভাইটির কাছ থেকে আমি যে-চিঠি পেয়েছিলুম, তা শেষ হয়েছিলো এইভাবে।

এ-চিঠি এসে পৌঁছুবার আগে কোনো অলুক্ষুণে হুঁশিয়ারি আমায় উৎকণ্ঠায় ভরে দেয়নিঃ চিঠিটা বরং এসেছে যথানিয়মে, পর-পর অনেক ডাক-হরকরার হাত-ফেরতা হয়ে, শেষটায় আমার বাড়ির দারোয়ান এবং আমার খাশ খিদমৎগার মারফৎ, এসে পৌঁছেছে।সে যথারীতি একটা রেকাবিতে চিঠিটা সাজিয়ে এনেছিলো আমার কাছে–বেচারা টেরও পায়নি এই মুহূর্তটার গুরুত্ব পরে কী-রকম ফুলে-ফেঁপে অতিকায় হয়ে উঠবে।

আর যখন ছুরি দিয়ে লেফাফার মুখ কেটে আমি চিঠিটা পড়তে শুরু করি, আমিও ছিলুম শান্তসুস্থির, এবং একনিশ্বাসে আমি গিয়ে পৌঁছেছি এই শেষ অনুচ্ছেদটায়, একবারও না-

থেমে পড়ে ফেলেছি মার্ক-এর লেখা শেষ বাক্যগুলো, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে-অদ্ভুত ঘটনাগুলোয় আমি জড়িয়ে পড়তে চলেছি, এই অনুরোধ-উপরোধে তারই বীজ লুকিয়ে আছে।

মানুষের অন্ধত্ব এইরকমই! এইভাবেই তো মানুষের অজ্ঞাতসারে তার ভবিতব্য গোপনে-গোপনে তার ভাগ্যের রহস্যময় বেড়াজাল বুনে যায়!

আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি সত্যিকথাই লিখেছিলো। হাঙ্গেরি যাবার জন্যে যত পথশ্রমই স্বীকার করে থাকি না কেন, তা কখনও আমার খেদ বা মনস্তাপের কারণ হয়নি। কিন্তু এখন এ-সব কাহন লিখতে বসে আমি কি ঠিক করছি? জীবনে এমন কিছু-কিছু ব্যাপারও কি থাকে না যে-সম্বন্ধে চিরকালই আমাদের চুপচাপ থাকা উচিত? এ-রকম অদ্ভুত-এক কাহনকে বিশ্বাসই বা করবে কে? যে-আশ্চর্য কাহিনী এমনকী সবচেয়ে দুঃসাহসী কবিও লিখতে গিয়ে দু-বার থমকে যাবেন?

তা, কেউ বিশ্বাস করুক চাই না-করুক! আমি বরং ঝুঁকিটাই নেবো। আমার কাহন কেউ বিশ্বাস করুক বা না-করুক, আমি বরং এই আশ্চর্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে করতে আরেকবার অনুভব করে নেবো এই অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোর অপ্রতিরোধ্য টান। আমার ছোটোভাইটির চিঠিটি ছিলো সেই ঘটনাচক্রেরই আপাতনিরীহ প্রস্তাবনা।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি, মার্ক, তখন আঠাশ বছরের যুবক, পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিশেবে সে এর মধ্যেই দারুণ সাফল্য অর্জন করে বসেছিলো। আমাদের দু-ভাইয়ের মধ্যে ছিলো স্নেহ-ভালোবাসার নিবিড় বন্ধন। আমার দিক থেকে স্নেহটা একটু পিতৃস্নেহের মতনই

ছিলো, কেননা আমি মার্ক-এর চাইতে ঠিক আটবছরের বড়ো। অল্প বয়েসেই আমরা বাবা-মা দুজনকেই হারিয়েছিলুম, আর তারপর মার্ক-এর দেখাশুনোর ভার এসে পড়েছিলো তার বড়োভাই এই আমারই ওপর। মার্ক মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলতে আমি নাকি বড্ড-বেশি দাদাগিরি ফলাচ্ছি, ধরনটা ঠিক নাকি বহু-কথিত বিগ ব্রাদারএরই মতো; তবে এটা ঠিক যে আমারই ওপর দায় বর্তেছিলো মার্ক-এর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করার। আর চিত্রকলায় তার আশ্চর্য ঝোঁক আর নৈপুণ্য দেখে, আমিই তাকে। তাতিয়ে ছিলুম চিত্রশিল্পী হতে–আর তারপর তো দেখা গেছে অল্পদিনের মধ্যেই তার নাম শিল্পরসিকদের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তার এই সাফল্য আদপেই পড়ে-পাওয়া কিছু ছিলো না–ছিলো সাধনা আর প্রতিভার সমন্বয়।

তো, এই-তো সেই-মার্ক এখন বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিছুকাল ধরেই সে থাকছিলো রাগৎসে-এ, দক্ষিণ হাঙ্গেরির এক প্রধান শহরে। তার আগে কয়েকটা সপ্তাহ কাটিয়েছিলো বুড়াপেস্ট-এ, সেখানে বেশ জমকালো দক্ষিণার বদলে এঁকেছিলো গোটা কয়েক প্রোট্রেট, ছবি হিশেবে সেগুলো খুব আদৃতও হয়েছিলো, আর হাঙ্গেরিতে যেভাবে শিল্পীদের সাগ্রহে বরণ করে নেয়া হয়, সেটাও মার্ক-এর খুব ভালো লেগে গিয়েছিলো। তারপর সে বুড়াপেট থেকে দানিউব ধরে গেছে দক্ষিণে–রাগৎস-এ।

এই শহরের প্রধান পরিবারগুলো অন্যতম ছিলো ডাক্তার রডারিখ-এর পরিবার, চিকিৎসক হিশেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা হাঙ্গেরিতেই। এমনিতেই উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন বিস্তর ধনসম্পদ-তার সঙ্গে যোগ হয়েছিলো চিকিৎসক হিশেবে তিনি যে বিপুল বিত্ত আহরণ করেছিলেন। বছরে একবার করে তিনি ছুটি নিয়ে দেশবিদেশ বেড়াতে বেরুতেন, আর তার ধনী মক্কেলরা কেউই তার এই দেশভ্রমণক

পছন্দ করতো না। গরিবগুরবোরাও তার এই বাৎসরিক ছুটিকে পছন্দ করতো না, কারণ তিনি চিরকালই বিনা মূল্যে, বিনা ফি-তে, তাদের চিকিৎসা করে এসেছেন। তাঁর দানধ্যানের পরিমাণও ছিলো বিপুল, দীনের থেকেও দীন তার কৃপা থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি–আর তার এই লোকসেবাই তাঁর সম্বন্ধে এক সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের কারণ হয়েছিলো।

পরিবার বলতে ডাক্তার রডারিখ-এর বাড়িতে ছিলো আরো তিনজন–তাঁর স্ত্রী, তার ছেলে কাপ্তেন হারালান, আর তার মেয়ে মাইরা। অতিথিবৎসল এই পরিবারের বাড়িতে মাঝে-মাঝে এসেছে মার্ক, আর তার ফলেই এই তরুণীর রূপলাবণ্য আর স্নিগ্ধ শ্রীর সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ না-হয়ে পারেনি–আসলে তা-ই সম্ভবত রাগৎস-এ তার অবস্থানকে প্রলম্বিত করেছে। তবে মাইরা রডারিখ যেমন মার্ক ভিদালকে আকৃষ্ট করেছিলো, তেমনিভাবে এই-কথাটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে মাইরাও মার্কের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আকৃষ্ট হয়েছে। এটাও মানতে কে আপত্তি করবে যে মার্ক ছিলো–ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখনও আছে-চমৎকার মানুষ : মাঝারি উচ্চতা, সজীব উজ্জ্বল দুটি নীল চক্ষু, চেস্টানাটরঙের চুল, কবিদের মতো ললাটদেশ, আর মুখচোখ দেখে এটাই বোঝা যেতো যে জীবন তাকে শুধু বেঁচে-থাকার মধুর দিকগুলোই দেখিয়েছে; বন্ধুবৎসল, দরাজদিল, আর শিল্পীদের যেমন হয়ে থাকে–রূপমুগ্ধ।

আর মাইরা রডারিখ? তার কথা আমি শুধু মার্কের উচ্ছ্বাসে-ভরা চিঠিগুলো থেকেই জেনেছি, আর এই চিঠিগুলো পড়েই তাকে একবার চাক্ষুষ দেখবার জন্যে আমি খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম। আর ভ্রাতৃপ্রবর আমার সঙ্গে শুধু তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে থাকেনি, আমাকে প্রায় কাকুতি-মিনতি করে লিখছিলো রাগৎস এ

চলে আসতে, বাড়ির কর্তা হিশেবেই, আরো জোর দিচ্ছিলো আমি সেখানে গিয়ে যেন অন্তত মাসখানেক থাকি। তার বাগদত্তা–অনবরত আমাকে লিখে জানিয়েছে সে–অধীরভাবে আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে, আর আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুবামাত্র তারা বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলবে। কিন্তু তার আগে মাইরা, নিজের চোখে, আমাকে একবার দেখে নিতে চায়, জানতে চায় কে তার হবু ভাশুর, কার সম্বন্ধে মার্ক এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে–অন্তত সেইভাবেই মাইরা নাকি তার মনের কথা মার্ককে খুলে বলেছে। যে-পরিবারে বিয়ে করে বউ হয়ে আসতে যাচ্ছে, সে-পরিবারের অন্যান্য মানুষরা কেমন, এটা জানবার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই তার কৌতূহল জন্মাতে পারে, আগ্রহ জাগতে পারে। বস্তুত, সে নাকি চূড়ান্ত সম্মতি দেবেই না, যতক্ষণ-না অঁরির সঙ্গে মার্ক তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

এই-সমস্ত কথাই আমার উত্তেজিত ভাইটি চিঠিগুলো বারবার করে লিখেছে আর সে-সব চিঠির ভাব ও ভাষা থেকে এটা বুঝতে আমরা অসুবিধে হয়নি যে মাইরার প্রেমে সে তখন একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আমি তাকে বুঝিয়ে লিখেছি যে আমি তো মেয়েটিকে শুধু মার্কের উচ্ছ্বাসভরা চিঠি থেকেই জেনেছি। আর, আমার ভাই শিল্পী বলেই, বিশেষত পোর্ট্রেট-আঁকিয়ে বলেই, এটা আশা করেছি যে মার্কের পক্ষে ভাষায় নিজেকে প্রকাশ না-করে রেখা ও রঙে তাকে ফুটিয়ে-তোলাই সহজ আর স্বাভাবিক হতো, সে মাইরাকে মডেল করে ছবি এঁকে, ক্যানভাস না-হোক, কাগজেই এঁকে আমার কাছে পাঠাতে পারতো, আর আমি তখন তার ছায়ারূপ–তা-ই তো বলে লেখকরা, ছায়া-মাইরা–দেখে তার তারিফ করতে পারতুম।

কিন্তু মাইরার তাতে সায় নেই। মডেল হতে সে নারাজ। মার্ক ঘোষণা করে জানিয়েছে, সশরীরেই সে আমার ধাঁধিয়ে-যাওয়া চোখের সামনে আবির্ভূতা হবে। পড়ে আমার মনে হয়েছে মার্ক হয়তো মেয়েটির সিদ্ধান্ত পালটাবার জন্যে খুব-একটা চেষ্টাই করেনি। দুজনে মিলে একযোগে এটাই চেয়েছে যে অঁরি ভিদাল তার এনজিনিয়ারিং বিদ্যে ও দায়িত্ব শিকেয় তুলে রেখে যেন সরাসরি হাঙ্গেরি গিয়ে রডারিখভবনের বৈঠকখানায় নিজের এত্তেলা দেয়–বিয়ের উৎসবের সর্বপ্রথম অতিথি হিশেবে।

আমার মনস্থির করে ফেলবার জন্যে সত্যি কি এতসব যুক্তির দরকার ছিলো? মোটেই না। আমার ছোটোভাইটি বিয়ে করবে অথচ সেখানে আমি সশরীরে হাজির থাকবো না, এ আমি কিছুতেই হতে দিতুম না। বেশি দেরি না-করে এক্ষুনি বরং আমার উচিত মাইরার সঙ্গে আলাপ করে নেয়া–সে আমার ভ্রাতৃবধূ হবার আগেই।

তাছাড়া, অধিকন্তু, চিঠি আমায় বলেছে, হাঙ্গেরির ঐ অঞ্চলে গেলে আমার যে শুধু ভালোই লাগবে তা নয়, আখেরে আমার লাভই হবে। একে তো এটা মাগিয়ারদের দেশ, যাদের অতীত শৌর্যবীর্যের গৌরবগাথায় ভরা, যারা জার্মানদের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে না-চেয়ে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, মধ্যইওরোপের ইতিহাসে একটা মস্ত ভূমিকা নিয়েছে।

আমি ঠিক করেছিলুম খানিকটা রাস্তা আমি যাবো ডাকের গাড়িতে, তারপর যাবার সময় বাকি রাস্তাটা যাবো দানিউব ধরে দক্ষিণে, আর ফেরবার সময় পুরো রাস্তাটাই আসবো ডাকের গাড়িতে। দানিউবের সৌন্দর্য আর মহিমার কথা কেই বা জানে না? আমি ভিয়েনা থেকেই দানিউব ধরে যাবো। আমি যদি তার সাতশো লিগ ধারাপথ ধরে

পুরোপথটা নাও যাই, অন্তত দানিউবের তীরের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চলগুলো আমার চাক্ষুষ দেখা হয়ে যাবে–অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির মধ্য দিয়ে যে-দানিউব গেছে, সরাসরি একেবারে রাগৎস অব্দি, সার্বিয়ার একেবারে সীমান্তে।

আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত আপাতত শেষ হবে সেখানে গিয়েই। সময়ের অভাবেই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না লৌহতোরণ পেরিয়ে কৃষ্ণসাগরে যেখানে গিয়ে দানিউব যেখানে সমুদ্রের অথৈ জলে পড়েছে, সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে যাওয়া। আমি যতদূর যাবো তার জন্যে তিন মাসের ছুটিই যথেষ্ট হবে বলে আমি ভেবেছি। পারী থেকে রাগৎস গিয়ে পৌঁছুতে লাগবে একমাস; মাইরা রডারিখ নিশ্চয়ই এতটা অধীর হয়ে নেই যে আমাকে পথের জন্যে অন্তত এই সময়টুকু ব্যয় করতে দেবে না। আমার ভাইয়ের নতুন দেশে গিয়ে তারপর আমি একটা আস্ত মাস কাটাবো, আর তারপর সেখানে থেকে ফ্রান্স ফিরে

আসতে আরো-একটা মাস আমি ব্যয় করতে পারবো। . আমার জরুরি কাজগুলো চটপট সেরে নিলুম। মার্ক কতগুলো দলিলপত্র নিয়ে যেতে লিখেছিলো, সেগুলোও জোগাড় করে নিলুম। এবার যাত্রার জন্যে তৈরি হতে হবে। তৈরি-হওয়া বলতে বিস্তারিত বা বিশদ-কিছু করার ছিলো না। বেশি মালপত্র নিয়ে অহেতুক পথের ঝামেলা বাড়াবার ইচ্ছে আমার আদপেই ছিলো না। নেবো তো শুধু একটা তোরঙ্গ, মোটামুটি প্রমাণ মাপেরই, কিছু জামাকাপড়, বিয়ের উৎসবে যোগদান করার জন্যে যথোচিত পোশাক, আর টুকিটাকি যা-সব লাগে। ও-দেশের ভাষা নিয়ে আমার অযথা কোনো মাথাব্যথা ছিলো না–এর আগে কাজে-অকাজে আমায় জার্মানি যেতে হয়েছে, তাই আলেমান ভাষা আমার জানা। আর মাগিয়ার ভাষা? সেটা বুঝতে আমায় হয় তো তেমন মুশকিলে পড়তে হবে না। তাছাড়া সারা হঙ্গেরিতেই তো চমৎকার ফরাশি চলে, আর-কেউ জানুক না-জানুক

অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা তো জানবেই, তাছাড়া মার্ক জানিয়েছে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে ভাষার জন্যে তাকে কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি।

আপনি যেহেতু ফরাশি, হাঙ্গেরিতে আপনার নাগরিক অধিকার আছে বলে জানবেন, একবার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের দেশের কাউকে জানিয়েছিলেন। আর সেই উষ্ণ অভ্যর্থনাতেই বোঝা যাচ্ছিলো ফ্রাসের প্রতি মাগিয়ারদের প্রকৃত মনোভাব কী ।

কাজেই মার্কের শেষ চিঠির উত্তরে আমি তাকে লিখে জানিয়েছি যে সে যেন মাইরাকে জানিয়ে দেয় তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমিও তারই মত সমান অধীর হয়ে আছি। আরো যোগ করেছি : ভাবী ভাতৃবধূর সঙ্গে দেখা করতে আমি অচিরেই হাঙ্গেরির উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ছি, তবে ঠিক কবে যে রাগৎস-এ গিয়ে পৌঁছুবো তা আমি নিজেই সঠিক জানি না, কেননা সেটা নির্ভর করবে পথের অবস্থা ও ঘটনাসংযোগের ওপর। তবে সেইসঙ্গে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে এও ভরসা দিয়ে জানিয়েছি যে পথে আমি কখনোই লেটলতিফ চালে চলবো না। কাজেই রডারিখ পরিবার যদি চান তো অবিলম্বেই মে মাসের শেষে বিয়ের জন্যে একটা দিন স্থির করে নিতে পারেন।

দয়া করে আমাকে দুমদাম করে অভিশাপ দিসনে, আমি যোগ করেছি চিঠিতে, যদি পথের বিভিন্ন স্থান থেকে নাও লিখে জানাই যে কবে কোথায় গিয়ে হাজির হয়েছি, এটা জানিস যে অন্তত মাঝে-মধ্যে মাদমোয়াজেল মাইরাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আমি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবো তাদের পৈতৃক ভবন থেকে আমি ঠিক কত লিগ দূরে আছি– যাতে সে আমার পৌঁছুনো সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারে। তবে পরে

তোকে ঠিকই জানিয়ে দেবোযথাসময়েই-ঠিক ক-টার সময় গিয়ে রাগৎস-এ। পৌঁছুবো, সম্ভব হলে এমনকী ক-টা বেজে কত মিনিটে তাও জানিয়ে দেবো।

রওনা হবার আগের দিন সন্ধেবেলায়, ১৩ই এপ্রিল, আমি পুলিশ-লিউটেনাস্টের দফতরে গিয়ে হাজির হয়েছি; লিউটেনান্টের সঙ্গে আমার সম্ভাবই ছিলো, বন্ধুতাই প্রায়; ফলে পাসপোর্টটা নেয়া এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেয়া–এক ঢিলে দুই পাখিই খতম করার জন্যে তার দফতরে যেতে চেয়েছি আসলে। পাসপোর্টটা হাতে তুলে দেবার সময় পুলিশ-লিউটেনান্ট আমার ভাইয়ের উদ্দেশে সহস্র অভিনন্দন জানিয়েছেন; মার্কের বিস্তর খ্যাতি ছড়িয়েছে আজকাল, অনেকেই তার নাম জানে, তবে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবেও জানতেন, তাছাড়া তার বিয়ের কথা নাকি সম্প্রতি তিনি কার কাছ থেকে শুনেছেন।

আর এটাও জানি, পুলিশ-লিউটেনান্ট আরো বলেছেন, আপনার ভাই যে-রডারিখ পরিবারে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, রাগৎস-এ সে-পরিবারের দারুণ সুনাম আছে।

আপনাকে কেউ এ-সম্বন্ধে জানিয়েছেন বুঝি? আমি জিগেস করেছি।

হ্যাঁ, এই তো গতকালই, অস্ট্রিয়ার অ্যামবাসাডারের বাড়িতে সন্ধের সময় পার্টি ছিলো, তখনই তো–

আর তিনিই আপনাকে এই খবর দিয়েছেন?

বুডাপেটের একজন উঁচু অফিসার-হাঙ্গেরির রাজধানীতে থাকবার সময় আপনার ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধু হয়েছিলো–তিনি তো তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তার সাফল্য

ছিলো তর্কাতীত, আর বুডাপেস্ট তাঁকে যেমন উষ্ণভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো, রাগৎস-এ গিয়ে তিনি তার চেয়েও বেশি সমাদর পেয়েছেন–খ্যাতি তো হাওয়ার বেগে দৌড়োয়। তাতে অবশ্য আমাদের অবাক হবার কিছু নেই, ভিদাল।

কিন্তু, আমি নাছোড়ভাবে খুঁচিয়েছি, সেই অফিসার রডারিখ পরিবারের প্রশংসাতেও কি তেমনি উচ্ছ্বসিত ছিলেন?

খুবই উচ্ছ্বসিত। ডাক্তার রডারিখকে সবাই প্রায় ঋষির মতো শ্রদ্ধাভক্তি করে। অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরি-দু-দেশের সর্বত্রই তার খুব নাম। যত-রকম ভূষণ, পদক, খেতাব সম্ভব–সবই তিনি পেয়েছেন। কাজেই আপনার ভাই চমৎকার একটি পরিবারেই বিয়ে করতে যাচ্ছেন, কারণ যতটুকু শুনেছি মাদমোয়াজেল মাইরা রডারিখও খুব আকর্ষণীয়া ব্যক্তিত্ব।

আপনি নিশ্চয়ই অবাক হবেন না, উত্তরে আমি তাকে বলেছি, যখন বলবো যে মার্কেরও ধারণা ও-রকম মেয়ে কেউ হয় না; সে প্রায় আপ্লুত হয়ে আছে মাইরাতে।

সে-তো দারুণ ব্যাপার, ভিদাল, খুবই ভালো কথা। আমার শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন তাকে জানিয়ে দেবেন–আমি ঠিক জানি নবদম্পতির সুখসমৃদ্ধি বিস্তর লোকের ঈর্ষার কারণ হবে।...তবে, একটু দোনোমনা করেছেন পুলিশ-লিউটেনান্ট, জানি না কোনো বেস কথা বলে ফেলছি কি না...তবে–

বেফাঁস কথা? আমি তাজ্জব হয়ে গেছি।

তাহলে মার্ক আপনাকে জানাননি যে তিনি রাগৎস-এ যাবার মাস কয়েক আগে...

মার্ক রাগৎস-এ যাবার আগে? আমি বুঝি হতভম্বের মতো ঐ কথাই আবার আউড়েছি।

হ্যাঁ...মাদমোয়াজেল মাইরা রডারিখ...তা, ভিদাল, এমনও হতে পারে যে আপনার ভাই সে-কথা শোনেনইনি।

হেঁয়ালি ছেড়ে বলে ফেলুন তো কী ব্যাপার–কারণ আপনি যে কী বলতে চাচ্ছেন সেটা আমার মগজে ঢুকছেই না।

বেশ, বলছি। যদুর শুনেছি–এবং তাতে, আশ্চর্য হবারও কিছু নেই মাদমোয়াজেল রডারিখ-এর বিস্তর পাণিপ্রার্থী ছিলো–আর তাদের মধ্যে একজন অন্তত ছিলো যার সম্বন্ধে খুব-একটা শ্রদ্ধা হবার কোনো কারণ নেই। এই কস্কাই সেদিন পার্টিতে আমার বন্ধু আমাকে বলেছিলেন। ব্যাপারটা ঘটেছিলো পাঁচ সপ্তাহ আগে, তখন আপনার ভাই ছিলেন বুড়াপেস্ট-এ।

আর এই প্রতিদ্বন্দ্বীটি–?

ডাক্তার রডারিখ তাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

তাহলে আর এ-ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে। তাছাড়া, মার্ক যদি না জানে যে তার কোনো-একজন প্রণয়প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো, অন্তত কোনো চিঠিতেই সে ঘুণাক্ষরেও এমন-কোনো কথা উল্লেখ করেনি, তাহলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশি দূরে গড়ায়নি-সেটা নিশ্চয়ই তেমন গুরুতর-কিছু নয়।

তা ঠিক।

আপনি আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ঠিকই করেছেন-নেহাৎ যদি কেচ্ছাগুজব—না হয়...

না, ভিদাল। যে-খবরটা পেয়েছি তা মোটেই হালকা-কিছু নয়–

খবরটা হয়তো হালকা নয়, তবে বিষয়টার কোনো গুরুত্বই নেই। আমি বলেছি, আর সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। আমি ওঠবার উপক্রম করেছি। কিন্তু আপনার বন্ধু কি সেই প্রতিদ্বন্দ্বীটির নাম বলেছিলেন–ঐ যাকে ডাক্তার রডারিখ দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন?

বলেছিলেন।

আর তার নাম?

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস?! রসায়ন-পণ্ডিতের–না, না, সেই কিমিয়াবিদের ছেলে?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, এটা একটা নাম বটে! এমন-এক বিজ্ঞানসাধকের নাম যাঁর আবিষ্কারগুলো তাকে দারুণ বিখ্যাত করেছিলো।

এবং যাঁর সম্বন্ধে গোটা জার্মানি সংগতভাবেই খুব গর্বিত।

কিন্তু তিনি কি মারা যাননি?

হ্যাঁ, বেশ কবছর আগেই মারা গেছেন, কিন্তু তার ছেলে বেঁচে আছে–এবং, আমার কাছে যে-খবর আছে, সেই অনুযায়ী, এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তেমন সুবিধের লোক নয়।

সুবিধের লোক নয়? অর্থাৎ?

কীভাবে যে আপনাকে কথাটা বলবো, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার অফিসারবন্ধুর কথা বিশ্বাস করতে হলে বলতে হয় এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আদৌ তার বিখ্যাত বাবার মতো নয়।

তাই নাকি? আমি তখন আবহাওয়াটা হালকা করবার জন্যে রসিকতা করেছি। তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হয়। তা এই প্রণয়প্রার্থীটির কি তিনটে পা আছে–না কি চারটে হাত-না কি শুধুই আছে যষ্ঠেন্দ্রিয়?

তা অবশ্য তেমন স্পষ্ট নয়, আমার বন্ধু হেসে উঠেছেন, তবে আমার ধারণা বাবার মতো নয় কথাটার মর্মার্থ কিন্তু শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলছে না, বরং তার নৈতিক দিক সম্বন্ধেই কটাক্ষ করছে। এর সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকাই উচিত।

বেশ, সাবধানই থাকবো না-হয়–অন্তত বিয়েটা চুকে না-যাওয়া অব্দি নিশ্চয়ই চোখকান খোলা রাখবো।

অতঃপর এই তথ্যটি নিয়ে আর-তেমন মাথা না-ঘামিয়ে, আমি পুলিশ লিউটেনান্টের সঙ্গে করমর্দন করেছি, তারপর বাড়ি গিয়ে আমার যাত্রার প্রস্তুতি সাঙ্গ করতে লেগে গিয়েছি।

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডাকের গাড়িতে করে আমি পারী ছেড়েছি ১৪ই এপ্রিলের সকালবেলায়, সাতটার সময়। দশদিনের মধ্যেই আমার অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে পৌঁছে-যাওয়া উচিত।

আমার যাত্রার প্রথম অংশটার কেবল বুড়ি ছুঁয়ে যেতে চাই আমি। পথে তেমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি, আর যে-সব জায়গায় ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ি গেছে তা পাঠকের এতই জানা যে সে নিয়ে নতুন-কিছু বলতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।

আমরা প্রথম গিয়ে থেমেছি স্ট্রাসবুর্গে, আর আমি বেশ কয়েকটা রাত্রি কাটিয়েছি রাজপথের খোয়র ওপর চলন্ত চাকার গান শুনে-শুনে, আর এই অবিশ্রাম গুঞ্জনটা এমনই যা স্তব্ধতার চেয়েও অনায়াসে যে-কাউকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আরো-কতগুলো শহরের মধ্য দিয়েও গেছি আমি, তারপর অস্ট্রিয়ার সীমান্তের কাছে এসে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে সাৎসবুর্গে আটকে থাকতেও হয়েছে। তারপর, অবশেষে, ২৫শে এপ্রিল, সন্ধে ছটা পঁয়ত্রিশে, মুখে-ফেনা-তোলা ঘোড়াগুলো খটাখট আওয়াজ করে গিয়ে ঢুকেছে। ভিয়েনার সেরা হোটেলটার চত্বরে।

সেখানে আমি সবশুদু মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা থেকেছি–শুধু দুটো রাত্রিই কাটিয়েছি ঐ রাজধানীতে। ফেরবার পথে ঠিক করেছি আরো ভালো করে দ্বীন বা ভিয়েনার একটা সরেজমিন তদন্ত করবো।

দানিউব কিন্তু ভিয়েনার মধ্য দিয়েও যায়নি, অথবা গা ঘেঁসেও যায়নি; আমাকে অন্য-একটা কোচবাক্সে করে এক লিগ পেরিয়ে তবেই যেতে হয়েছে সেই নদীর তীরে যার সহায় সলিল আমাকে সরাসরি রাগৎস-এ এগিয়ে পৌঁছে দেবে। আগের রাত্তিরেই আমি হালকা জলপোত ডরোথিতে যাত্রীদের ভিড়ভাট্টা সত্ত্বেও একটা টিকিট কেটে রাখতে পেরেছি।

ডরোথিতে উঠে দেখি সেখানে প্রায় সকলেরই কিছু-না-কিছু আছে : সব ধরনের লোক, আলেমান, অস্ট্রিয়ান, মাগিয়ার, রুশী, ইংরেজ-কে বাদ নেই। যাত্রীরা আছে ডেকে, গলুইয়ের কাছে, নিচে খোলের মধ্যে মালপত্র এত ঠাশা যে কারুই কোনো জায়গা হতো না সেখানে।

আমার প্রথম ভাবনাটা ছিলো কী করে সার্বজনীন ডরমিটরিতে একটা বাঙ্ক বাগিয়ে নেয়া যায়। আমার তোরঙ্গটা সেখানে নিয়ে যাবার কোনো কথাই ওঠেনিঃ খোলা হাওয়ায় সেটা ডেকের ওপরেই ফেলে যেতে হবে, পারলে কোনো বেঞ্চির কাছে, যাতে তার। ওপর বসে অনেকক্ষণ সময় কাটাতে পারি দানিউবকে দেখতে-দেখতে, আর তাতে আমার তোরঙ্গটার ওপরও নজর রাখতে পারবো।

একে স্রোতের বেগ ক্ষিপ্রপ্রবল, তায় জোর হাওয়া দিচ্ছিলো-এই দুয়ের যোগসাজসে বজরাটা ভেসে চলেছিলো দ্রুতবেগেই, গলুইটা তরতর করে গেরি জল কেটে এগুচ্ছিলো, কারণ কিংবদন্তি যা-ই বলুক না কেন দানিউব ঠিক নীল ছিলো না, যেন গেরুয়া রঙেই ছোপানো ছিলো। পথে অনেক নৌযানের দেখা পাওয়া গিয়েছে, হাওয়ায় ফাঁপাননা তাদের পাল, দেশগাঁয়ের জিনিশপত্র নিয়ে বড়ো গঞ্জে বা শহরগুলোর উদ্দেশে চলেছে। সেই

বিশাল ভেলাগুলোর একটার পাশ কাটিয়ে গিয়েছে ডরোথি, ভেলাটা যেন আস্ত একটা জঙ্গলের গাছপালা জুড়ে-জুড়ে বানানো, আর তার ওপর যেন তুলে

আনা হয়েছে আস্ত একখানা গ্রামকেই, যেটা ঠিক যাত্রার সূচনায় বানিয়ে নেয়া হয় আর। গন্তব্যে পৌঁছুলে ফের খুলে ফেলা হয়, ঠিক মনে করিয়ে দেয় আমাজোনের ওপর মস্ত সব ভাসমান গ্রামগুলো, ব্রাজিলের যা বৈশিষ্ট্য। তারপর ছোটো-ছোটো দ্বীপের পর দ্বীপ, যেন কোনো পরিকল্পনা না-করেই বসানো হয়েছে একেকটা মাটির ঢিবি, তার কোনো কোনোটা নেহাৎ ছোটোও নয়, তবে তাদের বেশির ভাগই যেন জল থেকে মাথাটা একটুখানি শূন্যে তুলে তাকিয়ে আছে-ভয় পেলেই ফের ভুউশ করে ডুবে যাবে-এতই নিচু জমি যে বান ডাকলে সবই জলের তলায় মিলিয়ে যাবে। অথচ কী উর্বর জমি, কী সতেজ, কী প্রফুল্ল, গাছপালার সবুজ আর কত রঙের ফুলেরই যে বর্ণালি তাতে, কত রংবাহার; কত গন্ধময় হাওয়া তাতে খেলে বেড়ায়। আমরা আরো পেরিয়ে গিয়েছি। জলের ওপর গড়ে-তোলা গ্রাম, নৌকোয় গড়া গ্রাম, বজরায়-বজরায় থাকার আস্তানা, তীরের খুঁটির গায়ে দড়ি বা লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা, অনবরত হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দু-একবার তো এমন হয়েছে যে আমাদের পালতোলা বজরা এদের দড়ির তলা দিয়ে। গেছে, একতীর থেকে আরেকতীরে খুঁটিতে-খুঁটিতে বাঁধা দড়ি, মনে হয়েছে আমাদের বজরার পাল বুঝি তাতে ধাক্কা খাবে, অথচ আশ্চর্য, কেমন সন্তর্পণে যেন সে-সব পেরিয়ে এসেছে ডরোথি।

এইভাবেই অবশেষে আমরা এসে পৌঁছেছি বুড়াপেস্ট; সেখানে আমি কয়েকদিন কাটিয়েছি, আশপাশে সব দ্রষ্টব্য ঘুরে-ঘুরে দেখে। যাত্রার আগের দিন আমি একটা বড়ো হস্টেলে গিয়েছি বিশ্রাম করতে। আমি হাঙ্গেরির বিখ্যাত শাদা ওয়াইন খাচ্ছিলুম, এমন

সময় আমার চোখ পড়েছে একটা খোলা খবরকাগজের ওপর। কিছু না-ভেবেই সেটা আমি হাতে তুলে নিয়েছি, আর অমনি আমার চোখে পড়ে গেছে মস্ত-মস্ত গথিক হরফে লেখা দুটি শব্দ :

স্টোরিৎস্ স্মৃতিবার্ষিকী

এই নামটাই তো বলেছিলেন পুলিশ-লিউটেনান্ট, এটাই তো সেই নামজাদা আলেমান কিমিয়াবিদের নাম, এটা তো মাইরা রডারিখের হলেও-হতে-পারতো পাণিপ্রার্থীর নামও। সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই আমার ছিলো না।

সেই কাগজে যা পড়েছি তা এই :

আর তিন সপ্তাহ পর, ২৫শে মে, অটো স্টোরিৎস-এর স্মৃতিবার্ষিকী উদ্যাপিত হবে স্প্রেমবার্গ-এ। এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে এই প্রসিদ্ধ জ্ঞানসাধকের জন্মস্থলে দলে-দলে লোক গিয়ে গোরস্থানে হাজির হবে।

এটা সকলেরই জানা যে, এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁর আশ্চর্য সব উদ্ভাবনী মারফৎ সারা জার্মানিকেই বিখ্যাত করে গেছেন, বস্তুবিজ্ঞানের অগ্রগতির পিছনে এই বিজ্ঞানসাধকের কাজের অবদান যে কতটা, তাও কারু নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নেই।

নিবন্ধকার যে কোনো অত্যুক্তি করেননি, সেটা ঠিক। অটো স্টোরিৎ-এর নাম সংগত কারণেই ভৌতবিজ্ঞানজগতে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। কিন্তু যেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলো, সেটা এর পরের কথাগুলোই :

এ-কথাও নিশ্চয়ই কারু অজ্ঞাত নেই যে তাঁর জীবদ্দশায় অতিপ্রাকৃতে যাঁদের বিশ্বাস ছিলো তাঁদের কাছে অটো স্টোরিৎস প্রায় ঐন্দ্রজালিক হিশেবেই গণ্য হতেন। দু-এক শতাব্দী আগে এটাও সম্ভব ছিলো যে তিনি নিশ্চয়ই গ্রেফতার হতেন কোতোয়ালির হাতে, তারপর বিচারের পর হাটের মাঝখানে তাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো। আমরা আরো জানাতে চাই যে তার মৃত্যুর পর অনেক লোকই –বিশেষত গালগল্প শুনে যাঁরা মজে যান–তাঁকে এখন আরো বেশি করে জাদুবিদ্যার সাধক বলেই ভাবছেন, ভাবছেন যে তিনি নিশ্চয়ই অতিমানুষিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁদের যা আশ্বস্ত করে সেটা এই তথ্য যে তিনি তাঁর নিজের যাবতীয় গুপ্তকথা নিয়েই কবরে গেছেন। তাঁদের কাছে অবশ্য অটো স্টোরিৎস চিরকালই থেকে যাবেন মন্ত্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক, এমনকী নব্য শয়তানিবিদ্যারও উপাসক।

যে যা-খুশি তা-ই ভাবুক, কিন্তু তথ্য হলো এটাই যে–আমি ভেবেছি-তার ছেলেকে ডাক্তার রডারিখ কিছুদিন আগে তার দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা না-হলে কে কী ভাবলো, তাতে আমার বয়েই যেতো।

নিবন্ধটি অবশ্য তার পরেও এই কথাগুলো বলে উপসংহার টেনেছিলো :

কাজেই এ-কথা ভাবা যুক্তিসংগত হবে যে জনসমাবেশ হবে বিপুল, যেমন প্রতিবারই স্মৃতিবার্ষিকীর দিনে হয়ে থাকে। আর তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব যে চিরকালই তাঁর অনুরক্ত থেকে যাবেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। এটা ভাবলেও বাড়াবাড়ি হবে না প্রেমবার্গ-এর কুসংস্কারগ্রস্ত লোকজন কোনো অলৌকক কীর্তির জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তারা

এই আশ্চর্য ও অলৌকিককে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে চায়। শহরে আজকাল যে-সব জনরব শোনা যাচ্ছে, তা থেকে অনুমান হয় গোরস্থান সেদিন অদ্ভুত অসম্ভব কোনো দৃশ্যের পটভূমি হয়ে উঠবে। যদি সাধারণ ভয়ভীতির মধ্যে সেদিন কবরের পাথর ঠেলে সরিয়ে এই অদ্ভুতকর্মা কিমিয়াবিদ আবার উঠে দাঁড়ান, প্রেমবার্গ-এর লোক তাতে আদৌ অবাক হবে না।

কারু-কারু মতে, অটো স্টোরিৎস আদৌ মারা যাননি, এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টি ছিলো নিছকই একটি ধাপ্পা।

এই আজগুবি বুজুর্গ-এর অবিশ্বাস্য কীর্তিকথা নিয়ে আমরা অধিকতর বাক্যব্যয় করতে চাই না। তবে সকলেই তো জানেন, কুসংস্কারের সঙ্গে কদাপি যুক্তি বা কাণ্ডজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। এবং কাণ্ডজ্ঞান যখন এইসব হাস্যকর কিংবদন্তির সমূহ বিনাশ ঘটাবে, তার আগে নিশ্চয়ই আরো-অনেক বছর জাদুবিশ্বাসেই কেটে যাবে।

এই লেখাটা পড়ার পর কতগুলো মন-খারাপ-করা চিন্তার উদয় হয়ে গিয়েছিলো আমার মধ্যে। অটো স্টোরিৎস যে মারা গেছেন, তাকে যে যথারীতি কবর দেয়া হয়েছে, এ সম্বন্ধে ককখনো কারু মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। ২৫শে মে সেই তার কবরটা যে খুলে যাবে আর তিনি কোনো নতুন ল্যাজারাসের মতো ভিড়ের সামনে এসে আবির্ভূত হবেন–এটা এমনই-এক অদ্ভুত কুসংস্কার যে এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার কিছু ভাবারও অবকাশ নেই। তবে পিতার মৃত্যু বিষয়ে কোনো প্রশ্ন যেমন ওঠে না, তেমনি এটাও তো মেনে নিতে হবে পুত্রটি বহালতবিয়তেই আছেন, এবং রডারিখ পরিবার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই যে ঐ পুত্রসন্তান সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। সে-যে মার্ককে

কোনো মুশকিলে ফেলবে না–এটা কিন্তু কেউই নিশ্চয় করে জানে না; বিয়ের সময় সে নানারকম ওজর-আপদ তৈরি করতেই পারে।

নাঃ, কাগজটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে আমি নিজেকেই বুঝিয়েছি, আমি বড্ড যুক্তিহীন হয়ে উঠছি। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মাইরার পাণিপ্রার্থনা করেছিলো, এবং তার প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয়েছিলো...তো কী? তারপর থেকে এই স্টোরিসের তো কোনো পাত্তাই পাওয়া যায়নি, আর মার্কও এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। আমার তবে কেন খামকা মনে হচ্ছে এই ঘটনাটার মধ্যে বিপদের বীজ লুকিয়ে আছে।

আমি তক্ষুনি মার্ককে একটা চিঠি লিখতে বসে গিয়েছি, তাকে জানিয়েছি যে আমি পরদিনই বুড়াপেস্ট থেকে রওনা হয়ে যাবো, আর রাগস গিয়ে পৌঁছুবো ১১ই মে-র অপরাহ্‌,ে কারণ আমি তো রাগৎস থেকে এখন মাত্র পঁয়ষট্টি লিগ দূরে আছি। এটাও উল্লেখ করেছি যে এ-যাবৎ আমার যাত্রায় না-কোনো অযথা বিলম্ব করার কারণ ঘটেছে, না-বা কোনো অভাবিত উৎপাত এসে হাজির হয়েছে, ফলে আমার ধারণা বাকি পথটুকুও উপদ্রবহীন কেটে যাবে। সেইসঙ্গে অবশ্য ডাক্তার ও মাদাম রডারিখকে সম্ভাষণ জানাতে আমি ভুলিনি, মাদমোয়াজেল মাইরারও কুশল কামনা করেছি; ঠিক। জানতুম মার্ক পত্রপাবামাত্র যথাস্থানে বার্তা পৌঁছে দেবে।

পরদিন সকাল আটটায় ডরোথি তার নোঙর তুলে তার গন্তব্যের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, ভিয়েনা ছাড়ার পর থেকেই যতবার আমরা থেমেছি ততবারই যাত্রীদের ওঠানামা চলেছে, পুরোনো যাত্রীরা অনেকেই নেমে গেছে, আবার নতুন যাত্রীরা এসে বজরায় উঠেছে। শুধুমাত্র পাঁচ-ছজন যাত্রীই–তাদের মধ্যে দু-তিনজন

ইংরেজও ছিলো–অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে বজরায় উঠেছিলো–তারা নামেনি, তারা সরাসরি কৃষ্ণসাগরের দিকে চলেছে। অন্য জায়গার মতো, বুড়াপেস্টেও, কিছু নতুন যাত্রী এসে ডরোথিতে উঠেছিলো। তাদের মধ্যে একজন তার অদ্ভুত চেহারার জন্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। যাত্রীটির বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, ঢ্যাঙা, গলানো সোনার মতো চুল মাথায়, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে নীল, মুখ-চোখে কেমন-একটা রূঢ় বিরূপ ভঙ্গি। তার হাবভাবে কেমন-একটা বিশ্রী ঔদ্ধত্যের ছাপ। যতবারই সে ডরোথি-র কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছে, ততবারই তার কথাবার্তায় একটা রুক্ষ কাটা-কাটা ভঙ্গি ফুটে বেরিয়েছে। এই যাত্রীটির মধ্যে অন্য-কারু সম্বন্ধে কোনো গরজ বা কৌতূহলই ছিলো না। তাতে অবশ্য আমার কিছুই এসে যায়নি, কেননা অ্যাদ্দিন অব্দি আমি সহযাত্রীদের সঙ্গে একটা ভদ্র ও শোভন দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছি। শুধু বজরার কাপ্তেনের সঙ্গেই আমার যা দু-চারটে কথাবার্তা হয়েছে।

এই যাত্রীটির কথা যতবারই আমার মনে হানা দিয়েছে, ততবারই আমার ধারণা হয়েছে সে নিশ্চয়ই আসলে আলেমান, সম্ভবত প্রশিয়া থেকে এসেছে–সেটা প্রায় যেন বোঝাই যাচ্ছিলো, কেননা তার সবকিছুর মধ্যেই কেমন-একটা রুক্ষ টিউটনিক ছাপ। মাগিয়ারদের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলাটা আদপেই যেন সম্ভব ছিলো না–তাছাড়া বীর মাগিয়াররা চিরকালই ছিলো ফ্রাসের প্রকৃত বন্ধু।

পাঠক নিশ্চয়ই অবাক হবেন–যদি ধরেই নেয়া যায় কোনোদিন আমার কোনো পাঠক জুটবে!–যদি আমার যাত্রাটা এতই নির্বিঘ্ন ও ঘটনাহীন হয়ে থাকে, তবে কেন এই কাহন আমি শুরু করেছিলুম যাত্রাটাকে অদ্ভুত বা আশ্চর্য বলে অভিহিত করে। তা যদি তার মনে হয়ে থাকে, তবে আমার সেই পাঠককে একটু ধৈর্য ধরতে বলবো। একটু পরেই

তিনি দেখতে পাবেন আমার এই ভ্রমণবৃত্তান্তটা সত্যি কতটা রহস্যময় আর অদ্ভুত হয়ে উঠেছিলো।

সত্যি-বলতে, বুড়াপেস্ট ছাড়ার পর-পরই একটা ঘটনা ঘটেছিলো যার কথা ভাবলে এখনও আমার আশ্চর্য লাগে। সত্যি-বলতে ঘটনাটি ছিলো অতীব তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। এমন তুচ্ছ-কোনো বিষয় নিয়ে কাহন ফঁাদতে গিয়ে এই খটকাটা জাগবেই যে সত্যি একে কোনো ঘটনা বলা যাবে কি না। তাছাড়া হয়তো পুরোটাই ছিলো কল্পনার সৃষ্টি–অন্তত ব্যাপারটা যে আদপেই বাস্তব নয় তার প্রমাণ আমি তো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পেয়েছিলুম। ব্যাপারটা না-হয় খুলেই বলা যাক।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম গলুইয়ের কাছে, আমার তোরঙ্গটার পাশেই–তার ডালার ওপর একটা কাগজ সাঁটা ছিলো, তাতে যে-কেউই আমার নাম, ধাম, পেশা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই পেয়ে যেতে পারতো। রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে আমি অলস শূন্য চোখে দানিউবের দৃশ্য দেখছিলুম; আর এটাও সোজাসুজি বলে রাখি, আমি তখন কিছুই ভাবছিলুম না।

হঠাৎ কেমন-একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো আমার–কে যেন ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

এটা সত্যি যে আমাদের কারুই পেছনে কোনো চোখ নেই, তবু অনেকেই নিশ্চয়ই এই অনুভূতি বোধ করেছেন যদি তাদের অজ্ঞাতসারেই কেউ একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আসলে যে-অনুভূতিটা তখন হচ্ছিলো, আমি তা হয়তো ঠিক বুঝিয়ে বলতে

পারছি না। আর-কিছু না-হোক, অনুভূতিটা কেমন যেন কুহেলিভরা ছিলো। এটা ঠিক যে অন্তত সেই মুহূর্তে আমি তা-ই অনুভব করেছিলুম।

এবং অমনি আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছি–আর আশ্চর্য!-আমার আশপাশেই কেউ তখন ছিলো না।

পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পাবো–এই ধারণাটা এমনই তীব্র ছিলো যে পেছন ফিরে সত্যি যখন কাউকে দেখতে পাইনি, আমি কেমন ভড়কে গিয়েছি। শেষটায় অবশ্য প্রত্যক্ষ (কিংবা অপ্রত্যক্ষ) প্রমাণটাকেই স্বীকার না-করে উপায় থাকেনি–আমার সহযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে কাছে যিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার দূরত্ব ছিলো অন্তত দশ ফ্যাদম।

স্নায়ুর এই বেশামাল অবস্থার জন্যে নিজেকেই তিরস্কার করতে-করতে আমি আবার রেলিঙ ধরে নদীর দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছি, আর নিশ্চয়ই এই নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনাটা আমার মনেই থাকতো না যদি-না এর পরে যে-সব অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলির আবর্তে গিয়ে আমি পড়েছিলুম সেগুলো এই অলৌকিক ঘটনাকে ফের আমার স্মৃতির মধ্যে জাগিয়ে দিতো।

তখন অবশ্য এ-ব্যাপার নিয়ে আমি আর কিছুই ভাবিনি, মনের ভুল বলেই সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি, আর তাকিয়ে থেকেছি বদলে-যেতে-থাকা দানিউবের জলের দিকে–জলের ওপর রোদ্দুর পড়ে কেমন-একটা মরীচিৎকার মতো মায়া রচনা করে বসেছিলো তখন।

পরের দিনে আর-কোনোকিছুই ঘটেনি, আর ৯ই মে আমরা আবার যথাসময়ে নোঙর তুলে বেরিয়ে পড়েছি।

ন-টা নাগাদ, ঠিক যখন আমি ক্যাবিনে ঢুকতে যাবো, দেখি সেই সোনালিচুল আলেমান যাত্রীটি ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসছে। প্রায় ধাক্কাই খেতে যাচ্ছিলুম তার সঙ্গে এমন আচমকা সে বেরিয়েছিলো, আর তারপরে সে যে-রকম অদ্ভুত চোখে আমাকে নিরীক্ষণ করেছিলো তাইতেই আমি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলুম। এই-প্রথম দৈব আমাদের মুখোমুখি এনে ফেলেছে, অথচ তবু তার দৃষ্টিতে কেমন-একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্যের ভাব–আর সেইসঙ্গে দৃষ্টির মধ্যে মেশানো ছিলো–আমি হলফ করে বলতে। পারি–অদ্ভুত-একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব।

আমার বিরুদ্ধে কী রাগ সে পুষে রেখেছিলো? আমি ফরাশি বলেই কি তার মধ্যে অমন তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ভাব? কেননা তক্ষুনি আমার মনে পড়ে গিয়েছিলো যে সে তো ক্যাবিনে আমার তোরঙ্গটার ওপরই আমরা নামধাম পড়ে ফেলতে পেরেছে। হয়তো সেইজন্যেই সে অমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। বেশ, সে যদি আমার নাম জেনেই থাকে, তো কী? আমি গায়ে পড়ে তার নামধাম জানতে যাবো না। তার সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই নেই আমার। তার সঙ্গে আলাপ করারও গরজ নেই কোনো।

দশ তারিখে লোকটার সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে ডেকের ওপর, আর প্রতিবারই সে যেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে যেটা আমার মনে হয়েছে ভারি বিরক্তিকর। আমি এমনিতে গায়ে পড়ে কখনও কারু সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে চাই না, সেটা আমার ধাতেই নেই, কিন্তু তাই বলে এমন বিচ্ছিরিভাবে ঠোঁট বেঁকিয়ে কেউ আমার

দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকবে, সেটা বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করে চলাও ছিলো আমার পক্ষে মুশকিল। তার যদি আমাকে কিছু বলারই থেকে থাকে, তবে এই উদ্ধত লোকটা সে-কথা সরাসরি মুখ ফুটে বলে ফেলছে না কেন? এ-রকম পরিস্থিতিতে কেউ তো শুধু চোখের ভাষাতেই কথা বলে না, আর সে যদি ফরাশি না-ই জানে আমি তো তার নিজের ভাষাতেই তার কথার জবাব দিয়ে তার সব কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পারতুম। তবে দৈবাৎ যদি এই টিউটন মাতব্বরটির সঙ্গে আমাকে কখনও কথাই বলতে হয়, তবে তার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নেয়া উচিত আমার। কাজেই আমি ডরোথির কাপ্তেনের কাছে গিয়ে জিগেস করেছি তিনি এর সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না।

এঁকে এই প্রথমবারই চোখে দেখছি আমি, কাপ্তেন আমায় জানিয়েছেন।

লোকটা জার্মান, আমি তাকে তাতাবার চেষ্টা করেছি।

তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই, মঁসিয় ভিদাল, তবে আমার মনে হয় এ হচ্ছে ডবোল-জার্মান, সাধারণ জার্মানের দুনো, নিশ্চয়ই পুঁশিয়ান।

তা, দুনো না-হয়ে নিছক-জার্মান হলেই হতো! আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এসেছে । জানি, কথাটা বলা ঠিক হয়নি, কোনো ভদ্রলোকের মুখে এমনতর কথা মানায় না, এ মোটেই সুস্থ মার্জিত রুচির পরিচয় হয় না, তবে কাপ্তেন এ-কথা শুনে একটু খুশিই হয়েছেন, কেননা জন্মসূত্রে তিনি মাগিয়ার, হাঙ্গেরীয় ।

পরদিন, নদীর অগুনতি বাঁক ঘুরে, ডরোথি শেষকালে গিয়ে পৌঁছেছে ভুকোভার এ। সেই শহরটা ছেড়ে আসবার পর সেই জার্মানটিকে জাহাজে আর দেখতে পাইনি আমি, তার

মানে সে নিশ্চয়ই ভুকোভার-এই নেমে গিয়েছে। যাক, আমি ভেবেছি, লোকটার হাত থেকে অবশেষে রেহাই পাওয়া গেলো, না-হলে আমাকে হয়তো তার কাছে ঐ অস্বাভাবিক তাকিয়ে-থাকার জন্যে একটা কৈফিয়ৎ চাইতে হতো।

তবে, তখনও, আমার মন অন্য-কতগুলো চিন্তায় ভারাক্রান্ত ছিলো। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তো রাগৎস-এ গিয়ে পৌঁছুবো। এক বছরেরও ওপর হলো মার্কের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে-এবার আবার তার সঙ্গে দেখা হবে, তার মারফৎ তার হবু-শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও আলাপ হবে। আমি সেই চিন্তাতেই মশগুল হয়ে ছিলুম।

বেলা পাঁচটা নাগাদ, বামতীরের গাছপালার আড়াল দিয়ে, কতগুলো চার্চের দেখা পাওয়া গেলো, কতগুলোর মাথায় উঁচু-উঁচু গম্বুজ, কতগুলোর মিনার আবার যেন আকাশের পটে এঁকে রেখে গেছে কেউ। সেই মস্ত শহরটার প্রথম যা চোখে পড়ে জাহাজ থেকে, তা এই চার্চগুলোই, নদীর শেষ মোহানাটায় শহরটা পুরোপুরি উম্মোচিত হয়েছে চোখের সামনে, কতগুলো উঁচু পাহাড়ের তলায় ছবির মতো সাজিয়ে বসানো –একটু উঁচু পাহাড়ের ওপর দেখা গেলো পুরোনো-একটা দুর্গ, হাঙ্গেরির পুরোনো শহরগুলোর যেন কুললক্ষণই এ-সব কেল্লা।

হাওয়ার চালে বজরাটা যখন জেটিতে এসে ভিড়বে, ঠিক তখনই আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তের দ্বিতীয় রহস্যময় ঘটনাটি ঘটেছে। এটা ঠিক বলবার মতো কোনো তথ্য কিনা, তা আমার জানা নেই।... পাঠককে নিজেই তার বিচার করে নিতে হবে।

আমি দাঁড়িয়েছিলুম গ্যাঙওয়েতে, তীরের দিকে তাকিয়ে; বেশির ভাগ যাত্রীই তাড়াহুড়ো করে তখন নামবার চেষ্টা করছে। তীরে, যেখানে গ্যাঙওয়ে গিয়ে লেগেছে, সেখানে কয়েকটা ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়েছিলো–মার্ক যে এদেরই মধ্যে কোথাও আছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না।

তারপর, যখন আমি মুখ তুলে তাকিয়ে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি, তখন শুনতে পেলুম, খুব কাছে থেকেই কে যেন আলেমান ভাষায় কাটা-কাটা ভাবে অপ্রত্যাশিত কথাগুলো বলছে : মার্ক ভিদাল যদি মাইরা রডারিখকে বিয়ে করে, তবে সর্বনাশ হোক মাইরার, সর্বনাশ হোক মার্কের!

শোনবামাত্র, আমি তড়াক করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি... কেউ নেই আমার আশপাশে, আমি একই আছি! অথচ এইমাত্র কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেছে! আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি কথাগুলো, আর আমি এ-কথাও জোর দিয়ে বলতে পারি এই অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর আদৌ আমার অপরিচিত ছিলো না!...

অথচ কেউই নেই আশপাশে, আবারও বলছি, কেউই ছিলো না ধারে-কাছে! কথাগুলো শুনেছি বলে যে মনে হয়েছে তা নিশ্চয়ই আমার বিভ্রম, নাস্তানাবুদ ঘাবড়ে যাওয়া কল্পনার ফসল, কোনো অলীক ও বেঘোর মায়া... আমার স্নায়ুগুলো নিশ্চয়ই কোনোকারণে একবারে ছিঁড়ে যেতে বসেছে, না-হলে দু-দিনের মধ্যেই দু-দুবার এমন ভুল।... হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা, আমি আবারও চারপাশে তাকিয়ে দেখেছি!... তারপর কাধ আঁকিয়ে, অসহায়ভাবে, নিজেকে মনের জোর আনতে বলে, তীরে নেমে-যাওয়া ছাড়া আমার আর কীই-বা করার ছিলো।

আর আমি তা-ই করেছি, তীরে নেমে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এসে চেষ্টা করেছি মার্ককে কোথাও চোখে পড়ে কিনা, তাকিয়ে দেখতে।

.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যা ভেবেছি, মার্ক আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। দেখেই, দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছি। তারপর মার্ক আমার হাত চেপে ধরে রুদ্ধ স্বরে বলে উঠেছে : আঁরি ... আঁরি! শুধু-যে তার গলাতেই আবেগ ছিলো তা নয়, তার চোখে দুটোও জলে ভরে উঠেছিলো– ওদিকে সারা চোখমুখে আবার সেইসঙ্গেই ফুটে উঠেছে আনন্দের উদ্ভাস।

আয়, মার্ক, আমি বলেছি, ফের হাতে হাত দেয়া যাক। তারপর অনেক দিন পর দুই ভাইয়ের মধ্যে দেখা হবার প্রথম আবেগপ্লুত মুহূর্ত কেটে যাবার পর আমি তাকে বাস্তব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছি, বলেছি :চল। এখান থেকে যাওয়া যাক। তুই আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছিস তো!

হ্যাঁ । তোকে আমার হোটেলেই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। হোটেলটা কাছেই, দশ মিনিটের পথও নয়। কিন্তু আয়, তার আগে তোর সঙ্গে আমার হবু শ্যালকের আলাপটা করিয়ে দিই।

ততক্ষণ অব্দি আমি খেয়াল করিনি যে মার্কের পেছনেই সামরিক ধরাচুড়ো পরা পদাতিক বাহিনীর একজন কাপ্তেন দাঁড়িয়ে আছে। বয়েস বেশি হলে হবে আঠাশ বছর, ঢ্যাঙা, চেস্টনাট রঙের দাঁড়িগোঁফ, কী-রকম একটা মাগিয়ার আভিজাত্য ফুটে বেরুচ্ছে চেহারা থেকে, যেন আজন্ম লোককে হুকুম করতেই সে অভ্যস্ত। অথচ তার চোখে অভ্যর্থনার ছাপ, মুখে মৃদু হাসি।

মার্ক পরিচয় করিয়ে দিয়েছে : কাপ্তেন হারালান রডারিখ!

কাপ্তেনের প্রসারিত হাত দু-হাতে তুলে নিয়ে আমি সম্ভাষণ জানিয়েছি।

আর সে বলেছে : মঁসিয় ভিদাল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে আমরা সবাই যে কতটা খুশি হয়েছি তা বলে বোঝাতে পারবো না। আপনি ভাবতেও পারবেন না আমাদের গোটা পরিবারটা কেমন অধীরভাবে আপনার আগমনের প্রতীক্ষা করছিলো!

মাদমোয়াজেল মাইরাও খুশি হয়েছেন তো? আমি একটু ফোড়ন কেটেছি।

মার্ক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছে : নিশ্চয়ই! আর অঁরি, এটা মোটেই মাইরার দোষ নয় যে তোরা ভিয়েনা ছাড়বার পর থেকে ডরোথি ঘণ্টায় দশ লিগ পথও যেতে পারেনি!

একটুক্ষণের মধ্যেই আমি টের পেয়েছি যে কাপ্তেন হারালান চমৎকার ফরাশি বলে, সাবলীলভাবে, তার বাড়ির সকলেই স্বচ্ছন্দে ফরাশি বলে, কারণ তারা ফ্রাসে বেড়িয়ে গিয়েছে আগে । তাছাড়া আমার আর মার্কের আলেমান ভাষায় দখলও যথেষ্ট, আর হাঙ্গেরীয় ভাষারও দুটো-একটা কথা আমি জানি। ফলে আমাদের কথাবার্তায় এই তিনটে ভাষাই অনায়াসে মিলে-মিশে যাচ্ছিলো।

একটা কোচবাক্সে করে মালপত্তর সমেত আমরা হোটেলে এসে পৌঁছেছি।

পরদিন প্রথমবার আমি রডারিখ পরিবারকে সম্ভাষণ জানাতে যাবো, এই ব্যবস্থা। করে মার্কের সঙ্গে হোটেলের মস্ত আরামপ্রদ ঘরটায় তারপর কয়েকঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি আমি, মার্ক থাকে এই হোটেলেরই পাশের ঘরে, রাগৎস-এ পদার্পণ করার পর থেকেই এইঘরেই সে থাকে।

তারপর মার্ক, আমি বলেছি, তাহলে আবার দুই ভাইয়ে দেখা হলো–দুজনেরই তো শরীরস্বাস্থ্য দিব্বি ভালোই আছে।

হ্যাঁ, অঁরি, আমার ছোটোভাইটি বলেছে, ক্যালেণ্ডারের হিশেবে একবছরের একটু বেশি, অথচ মনে হচ্ছে কতদিন যেন দুজনের মধ্যে দেখা হয়নি। মাইরা না-থাকলে এই সময়টাকেই আরো দীর্ঘ ও অসহ্য বলে বোধ হতো। শেষের কয়েক মাস মাইরার সঙ্গে আলাপ হবার পর যেন চক্ষের পলকে কেটে গিয়েছে। তা, অবশেষে, এখানে তোর আবির্ভাব হলো। এটা ভাবিসনি যে এই ক-দিনের অনুপস্থিতিতে আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছি তুই আমার বড়োভাই-তোর দাদাগিরির কথা আমি মোটেই ভুলিনি।

দাদাগিরি বলছিস কেন, মার্ক? আমরা তো ভালো বন্ধুও।

তা তুই ভালো করেই জানিস, অঁরি। সেইজন্যেই তোর অনুপস্থিতিতে কিছুতেই আমাদের বিয়েটা হতে পারতো না। আর, তাছাড়া, বিয়ের আগে আমি তোর কাছ থেকে একটা অনুমতিও তো চাচ্ছি।

অনুমতি?

বাঃ রে, বাবা বেঁচে থাকলে তার কাছ থেকে অনুমতি চাইতুম না বুঝি আমি? তবে বাবাও যেমন বিয়ের প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতেন না, তেমনি তুইও কোনো বাগড়া দিবি না–এটা আমি জানি। বিশেষত একবার মাইরার সঙ্গে দেখা হলেই তুই বুঝতে পারবি...।

তোর চিঠি থেকেই মনে হয় তাকে আমি জেনে গিয়েছি। তাছাড়া এও আমি জানি তুই কত সুখী হয়েছিস।

তুই ভাবতেও পারবি না আমি কীরকম সুখী হয়েছি। তবে তোর সঙ্গে তো ওর দেখা হবে, তুই নিজেই আন্দাজ করে নিতে পারবি ওকে কেমন পছন্দ করা যায়, তুইও ওকে স্নেহ করবি-এ আমি ঠিক জানি। সত্যিকার এক ছোটোবোন পাবি

তা, ছোটোবোনটিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই। তোর পছন্দে যে কোনো খুঁত থাকবে না, এ আমি জানি, মার্ক । কিন্তু আজই কেন আমরা ডাক্তার রডারিখের বাড়ি যাচ্ছি না।

না-না, কাল যাবো... আমরা ভাবতেও পারিনি যে তোর বজরা এত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছুবে, ভেবেছি তুই আজ সন্ধের পর এসে পৌঁছুবি। নেহাৎ বিচক্ষণ আর দূরদর্শী বলেই আমি আর হারালান সকালবেলায় জাহাজঘাটায় গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম। সাবধানের মার নেই–ডরোথি হয়তো আগেই চলে আসতে পারে। সেইজন্যেই তুই ঘাটে পা দেবামাত্র তোর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। ইশ! মাইরা যদি জানতো!... তোকে অভ্যর্থনা করতে যেতে পারেনি বলে বেচারা নিশ্চয়ই ভারি কষ্ট পাবে ।... হ্যাঁ, যা বলছিলুম, কালকের আগে তুই আসতে পারবি না ভেবে, মাদাম রডারিখ তার মেয়েকে

নিয়ে আজ এক জায়গায় নিমন্ত্রণে গেছেন । কাল তারা তোর কাছে এইজন্যে ক্ষমা চাইবেন।

বেশ। তা-ই হবে তাহলে। এখন বরং শোনা যাক এই দীর্ঘ একবছরে তুই কী করেছিস।

মার্ক তারপর কাহন কেঁদেছে, পারী ছাড়বার পর থেকে সে কী-কী করেছে, কোথায় কোথায় গেছে, কোন-কোন শহরে তার নামডাক হয়েছে, ভিয়েনা আর স্পেমবার্গ-এ কেমন ছিলো সে, বিশেষত কীভাবে ও-সব শহরে শিল্পের আর শিল্পীদের জগৎ কেমন সাগ্রহে দুয়ার খুলে তাকে বরণ করে নিয়েছিলো। কিন্তু এ-সব গল্প আমায় নতুন-কোনো তথ্যই জোগায়নি। মার্ক ভিদালের নাম স্বাক্ষর করা যে-কোনো পোর্ট্রেটই এখন ধনী অস্ট্রিয়ান আর ধনী মাগিয়ারদের মধ্যে যে চড়া দামে বিকোয়, তা তো আমি আগেই জেনে গিয়েছি।

এত লোকের চাহিদা আমি আদপেই মেটাতে পারিনি, অঁরি । সবখান থেকে অনবরত তাগিদ আসছিলো, বায়না আসছিলো। প্রেমবার্গের বুর্জোয়াদের মধ্যে মুখে মুখেই ছড়িয়ে গিয়েছিলো যে প্রকৃতির চাইতেও ভালো করে কাউকে খুটিয়ে তুলতে পারে মার্ক ভিদাল। কাজেই, মার্ক রসিকতা করে বলেছে, শিগগরিই একদিন হয়তো ভিয়েনার রাজসভা থেকে তলব আসবে, রাজসভার সবাইকার পোর্ট্রেট এঁকে দিতে হবে।

সাবধান কিন্তু, মার্ক, সাবধান। তোকে যদি এখন রাগস ছেড়ে ভিয়েনার রাজসভায় গিয়ে পারিষদদের ছবি আঁকতে বসে যেতে হয়, তবে সেটা তেমন সুবিধের ব্যাপার হবে না!

জাগতের সবচেয়ে জাহাবাজ এত্তেলা পেলেও আমি তাকে কোনো পাত্তা দেবো না, আঁরি । অন্তত এই মুহূর্তে কারু কোনো পোর্ট্রেট আঁকার প্রশ্নই ওঠে না। কিংবা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতে পারি, আমার শেষ পোট্রটটা আমি এঁকেই ফেলেছি।

মাইরার?

মাইরার–আর ওতে কোনো সন্দেহই নেই যে আমার জীবনের সবচেয়ে উঁচা কাজ হয়েছে ওটাই।

কে জানে? আমি বলে উঠেছি, কোনো শিল্পী যখন কোনো পোর্ট্রেটের চাইতে তার মডেল নিয়েই বেশি মাথা ঘামায়

তা, আঁরি, সেটা তুই নিজের চোখেই দেখতে পাবি।... আবারও তোকে বলছি, প্রকৃতির নিজের হাতের কাজের চাইতেও ভালো–সত্যি যা হওয়া উচিত!... লোকে তো বলে, সেটাই নাকি আমার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা!... তবে, এটা ঠিক যে মাইরা যখন ছবি আঁকবার জন্যে বসেছিলো, আমি ছবি আঁকবো কি, ওর ওপর থেকে চোখই সরাতে পারিনি। ওর কাছে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ঠাট্টা ছিলো না। সে তো আর বাত্তকে নয়, শিল্পীকেই ঐ দুটি ঘণ্টা দিতে চেয়েছিলো,... আর আমার তুলি পটের ওপর যেন ছিটকে চলেছিলো... আর কেমন দুর্ধর্ষ আবেগ ছিলো তুলির... মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো গালাতেয়ার মূর্তির মতো এই ছবিটাও বুঝি জ্যান্ত হয়ে উঠবে।

ধীরে, পিগমালিয়ন, ধীরে! বরং খুলে বল তো রডারিখ পরিবারের সঙ্গে তোর আলাপ হলো কী করে?

সে-তো কপালে লেখা ছিলো।

তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু...

আমি রাগৎস এসে পৌঁছুবামাত্র এখানকার অভিজাত মহলের ড্রয়িংরুমের দরজা আমার জন্যে খুলে গিয়েছিলো। আর আমারও তাতে কোনো আপত্তি ছিলো, না-বিদেশ বিভুঁয়ে একটা অচেনা শহরে অন্তত দীর্ঘ সন্ধ্যাবেলাগুলো কাটাবার একটা উপায় হলো তো! এইরকমই একটা বাড়িতে সন্ধেবেলার একটা পার্টিতে কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপ জমাবার সুযোগ হয়ে গেলো।

আবার? মানে?

হ্যাঁ, অঁরি, আবার। কারণ বুড়াপেস্ট-এ এর আগে তার সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিলো। সামরিক বাহিনীতে তার দারুণ সুনাম, সকলেরই ধারণা ভবিষ্যতে একজন কেউকেটা হবে, অথচ দারুণ ভদ্র, আদৌ দেমাক-টেমাক নেই। তা, তারপর থেকেই রোজই সন্ধেবেলায় তার সঙ্গে দেখা, আড্ডা, শেষটায় বন্ধুতাই হয়ে গেলো। একদিন এসে বললে বাড়ির লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে চায়, আর আমিও তক্ষুনি একপায়ে খাড়া, কারণ তারই আগে একটা পার্টিতে মাইরার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিলো, আর...

আর, আমি হেসে বলেছি, বোনটিও যেহেতু ভাইয়ের চাইতে কম মনোহারিণী নন, অতএব তুই রডারিখদের বাড়ি যাওয়া শুরু করে দিলি।

হ্যাঁ, অঁরি, আর গত তিনমাসে একটা সন্ধেও বাদ যায়নি, যেদিন আমি ওদের বাড়ি যাইনি। কিন্তু আমি মাইরা সম্বন্ধে যা-ই বলি না কেন, তুই নিশ্চয়ই ভাববি আমি বাড়িয়ে বলছি...

না, তা আমি বলছি না মোটেই। আমি ঠিক জানি তোর ভাবী স্ত্রী সম্বন্ধে তুই নিশ্চয়ই কিছু বাড়িয়ে বলছিস না। তাছাড়া এটা তো ঠিক যে তুই হাঙ্গেরির একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করতে যাচ্ছিস

হ্যাঁ, অঁরি, মার্ক বলেছে, চিকিৎসক হিশেবে ডাক্তার রডারিখকে সারা দেশের লোক শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাছাড়া মাইরার মাতৃদেবীও সম্মানিতা মহিলা, সমাজসেবার জন্যে তাঁর দারুণ নাম–

এবং এই দম্পতি যেন আসলে অপার্থিবই। সারা ফ্রান্স ছুঁড়ে বেড়ালেও তুই হয়তো এঁদের মতো শ্বশুর-শাশুড়ি খুঁজে পেতিস না। তাই না, মার্ক?

হ্যাঁ, তুই ঠাট্টাই করে চল। যত-ইচ্ছে ফোড়ন কাট। তবে এটা মনে রাখিস আমরা এখন আর ফ্রান্সে বসে নেই, বরং হাঙ্গেরিতে রয়েছি–মাগিয়ারদের এই দেশে পুরোনো দিনের ঐতিহ্য এখনও ধরে রেখেছে লোকে, অভিজাত্যকে লোকে এখানে। দাম দেয়

তারপর, বলুন, অভিজাতমশাই, কেননা ক-দিন পর তুইও তো আভিজাত্যের বড়াইই করবি।

অভিজাত্য থাকার মধ্যে আবার মন্দ কী আছে?

তা জানি না, তবে তোর এই প্রণয়োপাখ্যান খুব-একটা অসাধারণ-কিছু নয়–বরং এ-রকম গল্প হাজারগণ্ডা বলে দেয়া যায়। কাপ্তেন হারালানের সৌজন্যে তার পরিবারের সঙ্গে তোর আলাপ হলো, তারা ভদ্রতা করে তোকে সমাদর করেছেন, আর সেটাও অবাক কাণ্ড কিছু না–কারণ শিল্পী হিশেবে এরই মধ্যে তোর বেশ নামডাক হয়েছে। আর তারপর তুই মাদমোয়াজেল মাইরার রূপ দেখে একেবারে ভির্মি খেয়ে পড়েছিস

বল, তোর যা-ইচ্ছে।

সেইসঙ্গে মাদমোয়াজেল মাইরাও মার্ক ভিদালকে দেখে একেবারে মোহিত–

আমি কিন্তু তা বলিনি, অঁরি!

কিন্তু আমি বলছি–অন্তত সত্যের খাতিরে। আর ডাক্তার এবং মাদাম রডারিখ–তারা যখন বুঝতে পারলেন কী ঘটতে চলেছে, তারা কোনো আপত্তি করেননি। ফলে একদিন শুভক্ষণে মার্ক ভিদাল তার হৃদয়টা কাপ্তেন হারালানের কাছে খুলে ধরলেন। এবং কাপ্তেন হারালানও ব্যাপারটাকে বিরূপভাবে নেননি। বরং তিনি তার পিতামাতার কাছে গোপন কথাটি খুলে বললেন, তারা তারপর বললেন তাদের বিদুষী ও রূপসী কন্যাটিকে। তারপর মার্ক ভিদাল একদিন প্রকাশ্যে বিবাহের প্রস্তাব করলেন, কন্যাপক্ষ সেটি সানন্দে লুফে নিলে এবং প্রণয়োপাখ্যানটি এ-রকম বহু উপাখ্যানের মতোই ঘটাপটা করে শেষ হতে চলেছে–

তুই যাকে শেষ বলছিস, অঁ‍ঁরি, মার্ক মাঝখানে পড়ে বলেছে, আমার কাছে সেটাই কিন্তু সত্যিকার শুভারম্ভ বলে মনে হচ্ছে।

তুই ঠিকই বলেছিস, মার্ক, আমার গোড়া থেকেই শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত ছিলো...তা বিয়ের দিনটা ধার্য হয়েছে কবে?

তুই এলে পর দিন ঠিক হবে, এইজন্যে অ্যাদ্দিন আমরা অপেক্ষা করছিলুম।

বেশ, যখন তোদের ইচ্ছে, তখনই হতে পারে...ছ-হপ্তা...ছ-মাস...কিংবা ছ বছর...

শুনুন, এনজিনিয়ার অঁরি, মার্ক উত্তর দিয়েছে, আমি জানি যে একজন এনজিনিয়ারের কাছে সময় কতটা মূল্যবান, এবং আপনি যদি ততদিন এই রাগংস নগরে কাটাতে চান তাহলে সারা সৌরজগৎই তো বানচাল হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমিই যাবতীয় বান, বন্যা, ভূমিকম্প এবং ঐজাতীয় সমস্ত দুর্বিপাকের জন্য দায়ী হবো!

হ্যাঁ, তা-ই। আর সেইজন্যেই আমরা অনুষ্ঠানটিকে ততদিন পেছিয়ে দিতে পারবো না।

বেশ, তাহলে পরশুই বিয়েটা হয়ে যাক, কিংবা চাইলে আজ সন্ধেতেই বিয়ে হতে আটকাচ্ছে কীসে?... তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, মার্ক, যা দরকার আমি তা-ই বলবো। তুমি যতটা ভাবছিস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মমতো চালাতে আমার অবশ্য ততটা কারদানি লাগে

না। তাই মাসকাবারের আগেই আমি মঁসিয় ও মাদাম মার্ক ভিদালের বাড়িতে সান্ধ্যনেমন্তন্ন চাই।

সে-তো চমৎকার হবে!

কিন্তু, মার্ক, ঠাট্টা থাক। তোর সত্যিকার প্ল্যানটা কী বল তো? বিয়ের পরই কি তুই রাগৎস ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিস?

সেটা এখনও ঠিক হয়নি, মার্ক আমায় জানিয়েছে, সে নিয়ে ভাববার জন্যে পরে ঢের সময় পাওয়া যাবে। ভবিষ্যৎ নয়, আমি এখন বর্তমান নিয়েই মশগুল। ভবিষ্যৎ বলতে শুধু এই বুঝি যে শিগগিরই আমার বিয়ে হতে চলেছে। তারপর কী হবে, সে আর আমি এখন ভাবতে পারছি না।

অতীত আমাদের আঁকড়ে ধরে নেই, আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি, ভবিষ্যৎও এখনও এসে হাজির হয়নি। বর্তমানই সবকিছু।

এইভাবেই খাবার সময় আসা অব্দি আমাদের কথাবার্তা চলেছে। পরে, খাওয়া দাওয়া শেষ হলে পরে, আমরা দুজনে দুটো চুরুট জ্বালিয়ে দানিউবের বাম তীর ধরে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছি। বলাই বাহুল্য, তখনও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু তেমন একটা পালটায়নি, তখনও মাইরা রডারিখকে ঘিরেই আমাদের কথা চলেছে। আর এই আলোচনা চলতে-চলতেই কী-একটা কথা থেকে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেছে : আমি পারী ছাড়বার আগে পুলিশ-লিউটেনান্ট আমায় কী বলেছিলেন। মার্ক এমন-কিছু ঘুণাক্ষরেও বলেনি যাতে মনে হতে পারে তাদের রোম্যান্সের মধ্যে কখনও-কিছু

গণ্ডগোলের বিষয় ছিলো। অথচ এই প্রেমে মার্কের যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না-থেকে থাকে, সে নিশ্চয়ই অতীতে কখনও ছিলো, কেননা অটো স্টোরিৎস-এর ছেলে একদিন তার পাণিপ্রার্থনা করেছিলো। এ-রকম কোনো সম্ভ্রান্ত এবং বিদুষী ও রূপসী তরুণীর যে অনেক গুণমুগ্ধ ভক্ত থাকবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেছে ডরোথি থেকে নামবার সময় আচমকা কী কথা আমি শুনতে পেয়েছিলুম বলে আমার মনে হয়েছিলো। তখনও আমার মনে হচ্ছিলো পুরোটাই নিশ্চয়ই আমার বিভ্রম ছিলো। সত্যি-যদি এই হুঁশিয়ারি কেউ উচ্চারণ করে থাকে, তবে তা থেকে কী সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি? কে-যে এই কথাগুলো বলতে পারে তা কিছুই আমার মাথায় ঢোকেনি। কার স্বার্থ, এই হুমকি দিয়ে? বুড়াপেটে সেই যে জার্মানটি এসে বজরায় উঠেছিলো এ হয়তো তারই কাজ–কিন্তু তাও তো নয়-সে তো ভুকোভার-এই বজরা ছেড়ে নেমে গিয়েছিলো। তাহলে এ হয়তো অচেনা কারু মজা করবারই নমুনা–যদিও এমনতর মজার ধারণা আমার অন্তত ককখনো হতো না। ঘটনাটার কথা আমি অবশ্য মার্ককে বলিনি। তবে কোনো ছুতোয় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এর কথা পাড়বো বলেই আমি ঠিক করে রেখেছিলুম।

নামটা করতে-না-করতেই মার্ক তার স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর অবহেলার সুরে বলেছে, হ্যাঁ, হারালান একবার লোকটার কথা বলেছিলো বটে। সে-ই সম্ভবত মায়াসিদ্ধ অটো স্টোরিৎস-এর একমাত্র ছেলে-অন্তত জার্মানিতে অটো স্টোরিসের পরিচয় ইন্দ্রজালবিদ্যায় ওস্তাদ হিশেবেই। অথচ এটা ভারি অন্যায়-অটো স্টোরিৎস বোধহয় বড়ো বৈজ্ঞানিকও ছিলেন–রসায়নে আর পদার্থবিদ্যায়

তার নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। হ্যাঁ, তার ছেলে যদি কোনো প্রস্তাব করেও থাকে, সে-প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলো।

তোর প্রস্তাব গৃহীত হবার অনেক আগেই নিশ্চয়ই?

তার অন্তত চার-পাঁচ মাস আগে।

তাহলে এই দুয়ের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই নেই বলছিস?

কিছুমাত্র না।

মাদমোয়াজেল মাইরা কি জানে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এককালে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো?

বোধহয় না।

আর তারপর আর-কিছুই হয়নি?

কিসসু না। লোকটা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছিলো যে তার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ফলে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে-বুকে গিয়েছে।

কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না কেন? সে কি তার বদনামের জন্যে?

না। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর সে-রকম কোনো বদনামই নেই। লোকটা ভারি রহস্যময়। কী করে, না-করে, সব কুহেলিঢাকা। সবসময়েই সে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকে।

এখানে থাকে? রাগৎস-এ?

হ্যাঁ, বুলভার তেকেলির এককোণায় একটা বিচ্ছিন্ন বাড়িতে থাকে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস। কেউই এমনিতে ও-তল্লাটটা মাড়ায় না। লোকে তাকে একটু ভয়ই পায়–লোকটা নাকি কেমনতর; বিদঘুঁটে, উদ্ভট সব বাতিক আছে নাকি তার; এছাড়া তার আর-কোনো খ্যাতি-কুখ্যাতি কিছুই নেই। কিন্তু সে তো আগাপাশতলা জার্মান-আর ডাক্তার রডারিখ যে তার প্রস্তাবটায় পাত্তাই দেবেন না, সেজন্যে সে-যে জামান, এই তথ্যটাই যথেষ্ট। কারণ মাগিয়াররা সাধারণত টিউটনদের খুব-একটা পছন্দ করে না।

তোর সঙ্গে তার কখনও দেখা হয়েছে?

হয়েছে দু-তিনবার, একবার আর্ট গ্যালারিতেও। সে আমাদের দেখতে পায়নি। কাপ্তেন হারালানই তার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সে কি এখন রাগৎস-এ আছে নাকি?

সেটা তোকে সঠিক বলতে পারবো না। শুধু এটুকু জানি যে গত দু-তিন হপ্তায় কেউ তাকে একবারও এখানে দ্যাখেনি।

শহর ছেড়ে চলে গিয়ে থাকলেই ভালো।

মার্ক তখন বলেছে :যাক, লোকটা যে-চুলোয় যেতে চায়, যাক! তবে যদি কখনও কোনো ফ্রাউ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস দেখা দেন, তিনি যে মাইরা রডারিখ হবেন না, এটা ঠিক...

তা ঠিক, কেননা তখন তিনি হবেন, আমি হেসে বলেছি, মাদাম মার্ক ভিদাল।

জাহাজঘাটার পাশ দিয়েই, স্ট্র্যাণ্ড ধরে, আমরা হাঁটছিলুম। এই পদব্রজে ঘুরে বেড়ানোটা ইচ্ছে করেই প্রলম্বিত করছিলুম আমি। কেননা বেশ কিছুক্ষণ ধরেই আমার মনে হচ্ছিলো কেউ যেন সারাটা পথ আমাদের অনুসরণ করে আসছে। শুধু অনুসরণই করছে না, এমনভাবে পেছনে লেগে আছে যেন আমাদের কথাবার্তা শুনতে চাচ্ছে আড়ি পেতে। আমি এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলুম।

সেতুর ওপর এসে আমরা মিনিট কয়েকের জন্যে থেমেছিলুম। এই অবকাশে আমি পেছন ফিরে দেখতে চাচ্ছিলুম কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে কি না। কিছুটা দূরে মাঝারি উচ্চতার একটা লোককে দেখা গেলো বটে, কিন্তু তার চলাফেরার শ্লথমন্থর ভঙ্গিতে মনে হলো লোকটার নিশ্চয়ই অনেক বয়েস হয়েছে।

সে যা-ই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি। আমি তখন মার্ককে আশ্বস্ত করে বলেছি তার শেষ চিঠিতে মার্ক যে-সব দলিলপত্তর সঙ্গে আনতে বলেছিলো সব আমি নিয়ে এসেছি। বিয়ের জন্যে যে-সব দলিল জরুরি, সে-সম্বন্ধে তাকে কিছু। ভাবতে হবে না–এই বলে তাকে আশ্বস্ত করতে চেয়েছি আমি।

আমাদের কথাবার্তা ঘুরে-ফিরে মাইরার দিকেই চলেছে সারাক্ষণ–ঠিক যেমন করে চুম্বককে টানে মেরুতারা। আমরা হোটেলের দিকে ফিরে এসেছি তারপর। হোটেলের

কাছে এসে শেষবারের মতো একবার আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছি। রাস্তাটা তখন ফাঁকা, জনশূন্য। যে এতক্ষণ আমাদের পিছু নিয়েছিলো–যদি পুরোটাই আমার বেঘোরবিভ্রম না-হয়ে থাকে–সে যেন মায়াবলে হাওয়ায় উবে গিয়েছে, কেননা আমাদের পেছনে কোনো জনমানুষ নেই।

সাড়ে-দশটার সময় মার্ক আর আমি হোটেলে যে যার ঘরে। আমি তক্ষুনি গিয়ে শুয়ে পড়েছি বিছানায়, তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়েও পড়েছি। কিন্তু হঠাৎ আঁৎকে উঠেছি ঘুম থেকে। কোনো স্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন? কোনো আবেশ? কেননা ঘুমের ঘোরেও আবার আমি শুনতে পেলুম, যে-কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলুম ডরোথিতে! যে-কথাগুলো মার্ক আর মাইরাকে বিষমভাবে শাসিয়েছিলো।

.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরের দিনই আমি সামাজিক সৌজন্যের খাতিরে রডারিখদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছি।

ডাক্তার রডারিখের বিশাল বাড়ির চারপাশে মস্ত একটা বাগান থাকলে কী হবে, ভবনটি বস্তুত আধুনিক কারিগরিবিদ্যারই ফসল–আর সর্বত্রই সুরুচির চিহ্ন ছড়ানো। চমৎকার একটা স্ফটিক বসানো দরদালান-সারি-সারি দরজা বসানো, দরজাগুলোর ওপর প্রাচীন মাগিয়ার দারুশিল্পের নিদর্শন। এ-রকমই একটি দরজা নিয়ে যায় ডাক্তার রডারিখের পড়ার ঘরে, একটা যায় বৈঠকখানায়, আর আরো-একটা খাবারঘরে। টানা, লম্বা বারান্দাটার একপাশে একটা ইজেল, আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখেছি মাদমোয়াজেল মাইরার পোর্ট্রেট-না, মার্ক নেহাৎ তার নাম সইই করে দেয়নি, সত্যি একটা চমৎকার পোর্ট্রেটও এঁকেছে।

ডাক্তার রডারিখের বয়েস হবে পঞ্চাশ, যদিও তাকে দেখে অত বয়েস হয়েছে। বলে মনে হয় না; ঋজু, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ শরীর; ঝাকড়াচুল শাদা হয়ে আসছে; উপচে পড়া স্বাস্থ্যের আভা দেখে মনে হয় কখনও কোনো রোগ ভোগ করেননি। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবামাত্র তার উষ্ণ করমর্দন থেকেই প্রতিভাত হয়েছে যে মানুষটা সত্যি সিধে-সহজ।

মাদাম রডারিখ, তার বয়েস হয়তো পঁয়তাল্লিশ বছর, এখনও তার যৌবনের সৌন্দর্য সারা শরীরে ধরে রেখেছেন; স্নিগ্ধ সৌজন্যের প্রতিমা, দেখে মনে হয়েছে বাড়িঘর ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি খুবই হৃষ্ট ও সুখী। আমার সঙ্গে পরিচয় হবামাত্র যেভাবে

সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেছিলেন, তা আমাকে খুবই স্পর্শ করেছিলো। আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, মার্ক ভিদালের ভাইও এ-বাড়িরই লোক, তবে একটা শর্ত আছে : আঁরি ভিদালকেও কিন্তু এ-বাড়িটাকে নিজের বাড়ি বলে মনে করতে হবে।

আর মাইরা? তার সম্পর্কে আর কী বলবো? সে মৃদু হেসে প্রায় দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়েই সম্ভাষণ করতে এগিয়ে এসেছিলো। হ্যাঁ, সত্যি, এই তরুণীটি আমার ছোটোবোনের অভাব পূরণ করে দেবে। না, মার্ক কিছুই বাড়িয়ে বলেনি। বাইরে, ক্যানভাসে যে মেয়েটির প্রতিরূপের দিকে আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলুম, এ তারই জীবন্ত প্রফুল্ল রূপ। তার সুগঠিত মাথাটিতে সোনালি চুলের ঢাল, মুখটি যেন সদ্যফোঁটা হাঙ্গেরীয় কারনেশন, ঘন নীল দুই চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, বুদ্ধির সঙ্গে কৌতুকও মেশানো, মুখের ডৌলটি ভারি সুন্দর, আধোখোলা রক্তিম ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়ে দেখা গেলো ফেনশুভ্র দন্তরুচি। সাধারণের চাইতে একটা লম্বাই, সাবলীল সচ্ছন্দ ভঙ্গি, সে যেন নিজেই কোনো উজ্জীবন্ত মায়া। মার্ক যদি চারপাশে এইজন্যে সমাদর পেয়ে থাকে যে সে তার পোর্ট্রেটের মধ্যে ভেতরের মানুষটিকে ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পাবে, তবে বলতেই হয় মাইরার ছবিতে সে মেয়েটির অনেকটা অংশই ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

তার মায়ের মতো, মাইরা রডারিখও পরে ছিলো মাগিয়ার পোশাক, গলাবন্ধ এক জামা, মণিবন্ধ অব্দি নেমে-আসা সূচিকাজ করা হাতা, ধাতুর বোতাম-আঁটা ঢোলা ঘাগরা, জরি-বসানো কোমরবন্ধ, আর নরম চামড়ায় তৈরি চপ্পল–যেন আলেমান ফ্যাশনের কোনো পোশাক পরবে না বলেই বিশেষ করে এই দেশীয় সাজ-অথচ বাড়াবাড়ি বা দেখানেপনা নেই কোথাও।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কপ্তেন হারালানও ছিলো সেখানে, কড়াইস্ত্রিকরা সামরিক উর্দিতে ফিটফাট, আর এখন একসঙ্গে দুজনকে দেখে দুই ভাইবোনের চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্যটাও চোখে। পড়লো। সেও হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে, সেও তার বড়োভাইয়ের মতোই ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে, আর আমার তো মনে হচ্ছিলো তার সঙ্গে আমার যেন। কতকালের ভাব, যদিও তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়েছে মাত্র একদিন আগে।

তাহলে পুরো পরিবারটিকেই এখন আমি জানি।

আপনাকে এ-বাড়িতে দেখে কী ভালোই যে লাগছে, মঁসিয় ভিদাল! অভ্যর্থনা জানাবার ভঙিতে হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে আবারও-একবার আমায় বলেছে মাইরা রডারিখ। পথে বোধহয় বড় বেশি সময় লেগেছে আপনার–আমরা তো ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলুম। বুডাপেস্ট থেকে আপনার চিঠি আসার আগে অব্দি আমরা কেউই কোনো স্বস্তি পাইনি।

নিজেকে বড় দোষী ঠেকছে, মাদমোয়াজেল মাইরা, আমি উত্তরে বলেছি, পথে এতটা সময় নিয়ে নেয়ার জন্য বড় অপরাধী লাগছে। ভিয়েনা থেকে ডাকের গাড়িতে করে এলে আমি আরো আগেই রাগৎস এসে পৌঁছুতে পারতুম। তবে হাঙ্গেরির কেউই কখনও আমায় ক্ষমা করতো না যদি দানিউবকে আমি অবহেলা করতুম।

ঠিক আছে, দানিউবের সুবাদেই আপনাকে না-হয় ক্ষমা করা গেলো, মঁসিয় ভিদাল, মাদাম রডারিখ আমায় আশ্বস্ত করেছেন, কেননা অবশেষে আপনি তো সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন–এখন আর এই ছেলেমেয়ে দুটির বিয়েটা স্থগিত রাখার কোনো কারণ

নেই। কথা বলার সময় তিনি অবশ্য মার্ক আর মাইরার ওপর একবার প্রশ্রয় ও স্নেহের ভঙ্গিতে তাকিয়েছেন।

সেদিন অপরাহ্নে বেড়াতে বেরুবার কোনো কথাই ওঠেনি। মা আর মেয়ে ঘুরে ঘুরে সারা বাড়িটা দেখিয়েছেন আমায়, দেখিয়েছেন কত-কী অপরূপ মাগিয়ার শিল্পকর্মে সারা বাড়ি সাজানো।

আর মিনারটা? মাইরা যেন টগবগ করে উঠেছে, মঁসিয় ভিদাল কি ভেবেছেন মিনারটায় না-উঠে এ-বাড়িতে তার পদার্পণ আদৌ সম্পূর্ণ হবে?

না, মাদমোয়াজেল মাইরা, না! আমি বলেছি, সত্যি-বলতে, মার্কের এমন-কোনো চিঠি আমি পাইনি, যাতে এই মিনারটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিলো না। আমি তো ফ্রান্স থেকে এসেছি শুধু এই মিনারটার ওপরে ওঠবার জন্যেই!

আমার রসিকতাকে বিন্দুমাত্র আমল না-দিয়ে মাদাম রডারিখ বলেছেন, তাহলে আমাকে বাদ দিতে হবে। আমার পক্ষে মিনারটা বড় উঁচু।

বাঃ-রে! মাইরা আপত্তি করেছে, মাত্র-ততা একশো ষাটটা ধাপ!

তোর বয়েসে তাকেই মাত্র চারটে ধাপ বলে মনে হয়। বলেছে কাপ্তেন হারালান। বেশ, মা, তুমি তবে বাগানেই থেকো–আমরা এসে সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

তাহলে চলো মহাকাশবিজয়ে, খিলখিল করে হেসে উঠেছে মাইরা।

সে প্রায় ছুটেই উঠেছে ওপরে। তার হালকা পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমাদের বেশ কষ্টই হচ্ছিলো। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে যখন ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছি পুরো ল্যাণ্ডস্কেপটা যেন গোটানো পটের মতো আচমকা আমাদের চোখের সামনে খুলে গিয়েছে। চমৎকার!

সত্যিই, দিগন্ত অব্দি ছড়ানো এই চমৎকার ভূদৃশ্য দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। মাইরার মনে হচ্ছিলো, এতেও শেষ হয়নি, কতগুলো বিশেষ দ্রষ্টব্য নির্দেশ করে দেখানোই যেন রাগৎস-এর বাসিন্দা হিশেবে তার কাজ।

ঐ-যে, দেখছেন, সে বিশদ করে বলেছে, ওটা হলো এখানকার অভিজাত পাড়া–বলতে পারেন বৈভবমহল্লা। জমকালো প্রাসাদ, চকমেলানো ইমারত, লাল চক নীল চক, সারি-সারি মূর্তি-কী নেই ওখানে। ঐ দিকেই আরো এগিয়ে গেলে আপনি গিয়ে পড়বেন বড়োবাজারে, এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র, ভিড়ভাট্টা, দোকানপাট, ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি–সব পাবেন।...আর দানিউব-ঘুরে-ফিরে সবসময়েই আমরা দানিউবে ফিরে আসি-দানিউবকে এখন কী-রকম ঝলমলে দেখাচ্ছে, না! আর ঐ সবুজ দ্বীপটা, তার ঝোঁপঝাড়, বীথিকা, কুঞ্জবন আর হাজার রকমের ফুল! আমার ভাই যেন আপনাকে শিগগিরই একদিন সবুজ দ্বীপটা দেখিয়ে আনে।

তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, কাপ্তেন হারালান তক্ষুনি বলে উঠেছে, রাগৎস এর সবচেয়ে ঘিঞ্জি গলিটাও আমি মঁসিয় ভিদালকে দেখাতে ছাড়বো না।

আর আমাদের চার্চগুলো, মাদমোয়াজেল মাইরার মুখ থেকে ফুলঝুরি ছুটেছে, দেখতে পাচ্ছেন ঐ চার্চগুলো আর তাদের ঘণ্টাঘর? রোববার দিন শুনতে পাবেন ঘন্টার শব্দ– একের পর এক, সুরে মেলানো। আর আমাদের পুরভবন–তার গুণিজন-সম্বর্ধনা ঘর, তার উঁচু ছাত, তার বিশাল সব রঙিন কাঁচ বসানো জানলা, আর ঘণ্টাঘর–যেখান থেকে দানাদার গলার স্বর প্রতিঘণ্টায় প্রহর হাঁকে!

কালকেই, আমি তাকে নিশ্চিন্ত করেছি, কালকেই গিয়ে আমি পুরভবনে হাজিরা দেবো– আমি যে এ-শহরে এসেছি সেটা তো জানাতে হবেই।

তারপর মঁসিয়, মাদমোয়াজেল মাইরা তখন মার্কের দিকে ফিরেছে, আমি যখন আপনার ভ্রাতৃদেবকে পুরভবন দেখাচ্ছিলুম, আপনি তখন কী দেখছিলেন?

ক্যাথিড্রালটি, মাদমোয়াজেল মাইরা, ক্যাথিড্রালটি। কী তার আশ্চর্য কাজকরা গম্বুজ, কী তার বিশাল আয়তন, আর মাঝখানের ঐ উঁচু মিনারটা যেন প্রার্থনার মতোই আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে

ছবির মতো খুলে গিয়েছিলো রাগৎস, দেখে-দেখে যেন আশ মেটে না। তবু একসময় আমরা নিচে নেমে এসেছি বাগানে, যেখানে মাদাম রডারিখ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

সেদিন রডারিখ পরিবারেই আমাকে আতিথ্য নিতে হয়েছে; শুধু ভোজই নয়, সারা সন্ধেটাই কাটিয়েছি আমরা একসঙ্গে, সবাই মিলে। একাধিকবার, মাইরা গিয়ে বসেছে ক্লাভিকর্ডে, আর সুললিত কণ্ঠে গেয়ে শুনিয়েছে সেইসব আশ্চর্য মাগিয়ার লোকগীতির

সুর, যা যেমন উচ্ছল তেমনি মনমাতানো। শেষটায় একসময় কাপ্তেন হারালান যদি সময় সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়ে না-দিতো তাহলে আরো-কতক্ষণ যে ওভাবে মশগুল কেটে যেতো, কে জানে।

হোটেলে ফিরে আসার পর, নিজের ঘরে যাবার আগে, মার্ক আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘরে এসেছে ঢুকেছে। কী? আমি কি বাড়িয়ে বলেছিলুম? সোজাসুজি আক্রমণ করেছে সে আমাকে, জগতে কোথাও এ-রকম আর-কোনো মেয়ে–

আর-কোনো? আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে উলটে চড়াও হয়েছি, আমার তো এর মধ্যেই মনে হচ্ছে ও-রকম কেউ সত্যি আছে কি না? একজনও? পুরোটাই মায়া, না মতিভ্রম? মাদমোয়াজেল মাইরা বলে সত্যি কি কেউ আছে?

ওঃ, আঁরি, তুই বুঝতেই পারবি না আমি কী-রকম প্রেমে পড়ে গিয়েছি!

তাতে আমি আশ্চর্য হইনি, মার্ক। বরং তুই যদি প্রেমে না-পড়তিস, তবে তোকে আমার ভাই বলে স্বীকার করতেই বাধতে।

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন ভোর-ভোরই কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে আমি রাগৎস সরেজমিন ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। বিয়ের জোগাড়যন্তরতদ্বিরে মার্ক ব্যস্ত ছিলো বলে আমাদের সঙ্গে যায়নি, বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে পয়লা জুন, তিন হপ্তার মধ্যেই। এদিকে কাপ্তেন হারালান ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো তার জন্মভূমি কত সুন্দর, কত ঐতিহ্যমণ্ডিত-সেটাই ঘুরে-ঘুরে দেখাতে। এর আগে কোথাও গিয়ে এমন-কোনো গাইড পাইনি আমি যে শুধু শিক্ষিত, পরিশীলিত, দক্ষই ছিলো না যে তার নিজের বিষয়কে এমন ভালোবাসতো।

যদিও স্মৃতির মধ্যে একগুয়ের মতো বারেবারে হানা দিয়ে আমাকে চমকে-চমকে দিচ্ছিলো সেই বেঘোর-বিভ্রমে শোনা হুঁশিয়ারগুলো (যা হয়তো নিছকই মতিভ্রম ছিলো – যার কোনো বাস্তব ভিত্তি অন্তত আমার নজরে পড়েনি), তবু আমি একবারও ঘুণাক্ষরেও ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের নাম করিনি। কাপ্তেন হারালান এ নিয়ে কোনো কথাই বলেনি, হয়তো এ-কথা কখনও তার মাথাতেই আসেনি।

সারা শহর আমরা চষে বেড়িয়েছি, সব-শেষে এসেছি সেই চকে, যেখানে রৌদ্রে ঝলমল করে উঠেছিলো রাজভবন। সেখানে একটু থমকে থেমে সব খুঁটিয়ে দেখেছি। আমরা। কাপ্তেন হারালান আমাকে জানিয়েছে :এটা রাজভবন–রাজ্যপালের বাসভবন। এখানেই বিয়ের অনুষ্ঠানে ক্যাথিড্রালে যাবার আগে মার্ক আর মাইরাকে এসে রাজ্যপালের কাছ থেকে অনুজ্ঞাপত্র দিতে হবে।

অনুজ্ঞাপত্র? তার মানে বিয়ে করতে হলে রাজ্যপালের অনুমতি চাই?

হ্যাঁ। এটা এখানকার ভারি প্রাচীন একটা রীতি। নগরের সর্বোচ্চ অধিনায়কের অনুমতি ছাড়া কোনো বিয়েই হতে পারে না এখানে। শুধু তা-ই নয়, এই অনুজ্ঞাপত্র পাত্রপাত্রীর মধ্যে একটা দৃঢ় বন্ধন তৈরি করে। তখনও বিয়ে হয়নি অবশ্য, কেননা চার্চের অনুষ্ঠান হয়নি, তবে নিছক বান্দানের চাইতে আরো-সুদৃঢ় একটা স্বীকৃতি পাওয়া যায়–যদি কোনো অপ্রত্যাশিত অভাবিত কারণে বিয়ে পেছিয়ে যায় তবুও পাত্রপাত্রী কেউই নতুন-কোনো বন্ধন স্বীকার করে নিতে পারবে না।

এই স্মরণীয় রীতিটি ব্যাখ্যা করতে-করতে কাপ্তেন হারালান আমাকে নিয়ে এসেছিলো সেই রাস্তায়, যা গিয়ে শেষ হয়েছে সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালের সামনে। এয়োদশ শতাব্দীর পুরোনো এই ক্যাথিড্রালটির যত বৈশিষ্ট্য ছিলো, সব বেশ খুঁটিয়ে বলেছিলো কাপ্তেন হারালান। পরে কখনও ভেতরে গিয়ে খুঁটিনাটি সব ঘুরে-ঘুরে দেখা যাবে। এখন বরং চলুন দুর্গটা গিয়ে দেখে আসি। তারপর বুলভার ধরে-ধরে সারা শহরটা ঘুরে ঠিক লাঞ্চের আগেই আমরা ফিরে যেতে পারবো।

দুর্গের দিকে যেতে হলে ঐ ছোটো-বড়ো বাজারগুলোর একটার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তখনই পুরোদমে বিকিকিনি চলেছে, সবখানেই ব্যস্ততা আর হুড়োহুড়ি, কিন্তু আমরা বাজারটার মধ্যে গিয়ে পড়বার আগেই সেখানে এমন-একটা শোরগোল উঠলো, যেটাকে নিছকই দৈনন্দিন কেনাবেচার গুঞ্জন বলে মনে হয়নি।

কয়েকজন স্ত্রীলোক একটা লোককে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, লোকটা মাটিতে পড়ে কারাচ্ছে, চেষ্টা করেও উঠতে পারছে না।

কেউ-একজন ধাক্কা দিয়েছে আমাকে...জোরে ঠেলা দিয়েছে...এত জোরে ধাক্কা মেরেছে যে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছি।

কিন্তু তোমায় ধাক্কাটা দিলে কে? স্ত্রীলোকদের একজন জিগেস করেছে। আমার দোকান থেকে স্পষ্ট দেখেছি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার সময় তোমার আশপাশে কেউই ছিলো না। কেউ না।

ছিলো, নিশ্চয়ই ছিলো। লোকটা চেঁচিয়ে বলেছে। ঠিক বুকে ধাক্কা মেরেছে! শয়তানে নিক হতচ্ছাড়াকে, এখনও বুকে ব্যথা করছে!

কাপ্তেন হারালান লোকটাকে জিগেস করে যা জানতে পেলে, তা এইরকম : চাষীটি রাস্তা দিয়ে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলো, এমন সময় সজোর একটা ধাক্কা খায়, যেন কোনো দশাসই পালোয়ান এসে তার গায়ে বেশামাল পড়েছে। এতই জোরে, যে সে প্রায় ডিগবাজি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সত্যি–তার কোনো সংশয়ই নেই-কারু সঙ্গে ধাক্কা খেয়েই এই চোটটা পেয়েছে সে। কিন্তু সে-যে কে তাকে অমনভাবে ধাক্কা দিয়েছে, সে-সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই–কোনোরকমে ওঠবার চেষ্টা করার সময় সে নিজেও আশপাশে কাউকে দেখতে পায়নি।

কতটা সত্য ছিলো এই গল্পে? সত্যিই কি লোকটা আচমকা ও-রকম বেদম একটা ধাক্কা খেয়েছে? কিন্তু ধাক্কা খাওয়ার মানে কেউ তাকে সেই ধাক্কা দিয়েছে–এমনকী দমকা

হাওয়া এসেও যখন আচমকা ঠেলা দেয় তখন তো এটা জানা থাকে যে দমকা হাওয়া এসেছিলো। কিন্তু হাওয়াও তো শান্ত এখন। শুধু একটা জিনিশই নিশ্চিত: লোকটা আচমকা পড়ে গিয়েছে, এবং তার কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে না। আর সেইজন্যেই এখানে এত উত্তেজনা। কেউ-কেউ বলতে শুরু করেছে লোকটা হয় মতিচ্ছন্ন মাতাল, আর নয়তো জেগে-জেগেই দুঃস্বপ্ন দ্যাখে। শুধু মাতালরাই বেটাল চলতে গিয়ে দুমদাম পড়ে যায়। লোকটা কিন্তু সজোরে উলটো কথাই বললে : গত চব্বিশ ঘণ্টায় সে একফোঁটাও মদ খায়নি। শেষটায় একজন পাহারাওলা এসে লোকটাকে আর গোল না-পাকিয়ে কেটে পড়তে বলেছে।

আমরা তারপর উৎরাই বেয়ে একটা রাস্তা ধরে দুর্গের দিকে এগিয়েছি-একটা ছোটো টিলার ওপর নিরেট বসানো দুর্গা।

এবারও কাপ্তেন হারালান ঘুরে-ঘুরে তার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখিয়েছে। শেষটায় তারই ইঙ্গিতে সদর দরজাটাও খুলে গিয়েছে। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে আমরা দুশো চল্লিশটা ধাপ পেরিয়ে শেষটায় এসে পৌঁছেছি তার ছাতে। আর সেখান থেকে আবার শহরটাকে দেখা গেছে, ঠিক যেমনভাবে পাখির চোখ দূরের আকাশ থেকে নিচের সবকিছু দ্যাখে।

শুধু দ্রষ্টব্য বিষয় নিয়েই নয়, আরো নানা বিষয়ে সারাক্ষণ আমরা আলোচনা চালিয়ে গিয়েছি। একবার কাপ্তেন হারালান আমায় বলেছে :আমাদের শহরে কিন্তু আপনি তেমন গরিব মানুষ দেখতে পাবেন না। দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ দেখা গেলেই কর্তৃপক্ষ নানারকম ব্যবস্থা নিয়ে দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করেন।

সেটা বোঝা যায়। আমি বলেছি, ডাক্তার রডারিখ যে কখনও গরিবদের চিকিৎসার জন্যে কোনো ত্রুটি করেন না, সেটা আমি এখানে আসার আগেও লোকের কাছে শুনেছি! তাছাড়া শুনেছি মাদাম রডারিখ আর মাদমোয়াজেল মাইরাও নানারকম সমাজসেবার কাজে লেগে আছেন!

আমার মা-বোন যা করেন তা যে-কোনো অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষেরই করা উচিত। আমার মতে, মানুষ সমাজে থাকে বলেই সমাজসেবা মারফৎ সে সমাজের কাছে তার ঋণ শোধ করবার একটু চেষ্টা করতে পারে। তাছাড়া এ-শহরটা এমনিতে নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয়। তেমন-কোনো রাজনৈতিক উত্তেজনা বা হুলুস্থুলও নেই। অথচ তবু শহরের সকলেই নিজের দাবি ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন–কেন্দ্রীয় সরকার ককখনও কোথাও বাড়াবাড়ি করলেই তার প্রতিবাদ ওঠে। এখানকার লোকদের শুধু একটাই দোষ।

আর, সেটা?

তাদের নানারকম সংস্কার আছে; অলৌকিকে বিশ্বাস করে, অতিপ্রাকৃত নিয়ে মাথা ঘামায়। ভূতের গল্প আর শয়তানের কীর্তি সম্বন্ধে বড় বেশিই মাথা ঘামায়।

এমনকী সব শিক্ষিত মানুষও?

সব না-হলেও বেশির ভাগই। বিজ্ঞানচেতনা বা শিক্ষা এ-দিকটায় তেমন প্রভাব ফ্যালেনি। কেন-যে লোকদের এই দুর্বলতা, তা জানি না। আমি তো ভেবে-ভেবে এর কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাইনি। কেন-যে ভুত-প্রেতে লোকের এমন বদ্ধমূল বিশ্বাস, তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

দুর্গটা দেখে বেরিয়ে আসার সময় কাপ্তেন হারালান জানিয়েছে, শহরে একটা পুরোনো কেল্লায় মস্ত খাবারঘরে একটা হোটেল থেকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সেখানেই দুপুরবেলায় খেয়ে নেবো। আবারও কথা বলতে-বলতেই আমরা শহরের অন্যপ্রান্তের দিকে এগিয়েছি। একটু পরেই আমরা বুলভার তেকেলিতে এসে পড়েছি, আর অমনি চোখে পড়েছে একটা বিরাট বাগানের মধ্যে একটা মস্ত অট্টালিকা। দেখে মনে হয় পোড়োবাড়ি, ছন্নছাড়া পরিত্যক্ত চেহারা, বন্ধ জানলাগুলো বোধহয় স্মরণকালের মধ্যে কখনও খোলা হয়নি, দেয়ালে শ্যাওলা আর পরগাছা গজিয়েছে। শহরের অন্য বাড়িগুলোর পাশে এটাকে কেমন-যেন হানাবাড়ি বলেই মনে হয়। রেলিঙঘেরা বাড়িটার সামনে লৌহফটক, তারপর উঠোন, খোয়ারিবিছানো রাস্তার দুপাশে দুটো উইলো গাছ, শুকনো, মরা–গাছ দুটি এতই প্রাচীন যে যেন বয়েসের ভারেই মরে গিয়েছে। বাড়িটার সামনের দিকে আরো-একটা দরজা, তার ওককাঠের পাল্লাগুলো রংচটা, জীর্ণ। তিনটে ভাঙা সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পৌঁছুনো যায় ঐ দরজায়। দোতলাও আছে, তারপর উঁচু দর্শন-অলিন্দ। পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা সরু-সরু গবাক্ষ। যদি-বা বাড়িটা বাসযোগ্যও হয়, দেখে মনে হয় না বাড়িটায় কেউ থাকে।

আমি জিগেস করেছি : কার বাড়ি এটা?

ভারি আজব একজন লোকের, কাপ্তেন হারালান বলেছে।

আমি বলেছি : বুলভারের বাকি বাড়িগুলোর পাশে ভারি বেমানান । পুরসভার উচিত বাড়িটা কিনে নিয়ে ভেঙে ফেলে নতুন করে কিছু তৈরি করে দেয়া।

সত্যি তা-ই উচিত। বাড়িটা ভেঙে ফেললে হয়তো তার অদ্ভুত মালিকটিও শহর, ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। শহরের জনরব বিশ্বাস করলে বলতে হয় তাহলেই হয়তো সে তার নিকটতম আত্মীয় বীলজেবারের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেবে।

তা-ই না কি? তা এই বিদঘুটে ব্যক্তিত্বটি কে?

একজন জার্মান।

জার্মান?

হ্যাঁ, প্রুশিয়ার লোক।

আর তার নাম?

ঠিক যখন কাপ্তেন হারালান নামটা বলতে যাবে, অমনি আচমকা বাড়ির সামনের ঐ দরজার রংচটা কবাটগুলো খুলে গেলো, আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দুটি লোক। দুজনের মধ্যে যে বড়ো, তার সত্যি বয়েস হয়েছে, অন্তত ষাট তো হবেই, সে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইলো, অন্যজন নেমে চলে এলো ফটক বেরিয়ে বুলভারে।

আচ্ছা! কাপ্তেন হারালান কেমন অদ্ভুত স্বরে বললে। মহাশয় তবে এখানেই আছেন। আমি ভেবেছিলুম সে চলে গিয়েছে শহর ছেড়ে!

সে ফিরতেই লোকটা আমাদের দেখতে পেলে। সে কি চেনে কাপ্তেন হারালানকে? সন্দেহ করার জো কী–কেননা দুজনেই প্রচণ্ড বিদ্বেষের চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছে।

আমিও তখন লোকটাকে চিনতে পেরেছি। সে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আমি বলে উঠেছি : তাহলে সত্যি-সত্যি এ-ই সেই লোক?

আপনার সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছে? কাপ্তেন হারালান একটু আশ্চর্যই হয়েছে।

হয়েছে। আমি জানিয়েছি, বুডাপেস্ট থেকে ভুকোভার অব্দি এর সঙ্গেই আমি ডরোথিতে করে এসেছি। তবে এটা বলবো যে এর সঙ্গে যে রাস-এ ফের দেখা হয়ে যাবে, এটা আমি আশা করিনি।

কাপ্তেন হারালানও সায় দিয়ে বলেছে :এ এখানে না-থাকলেই ভালো হতো। মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে এই জার্মানের খুব-একটা ভাব নেই?

কারই বা ভাব থাকবে? তাছাড়া আমার তো একে অপছন্দ করবার বিশেষ কারণ আছে। এর ধৃষ্টতা একবার ভেবে দেখুন। এ কি না আমার বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো! কিন্তু বাবা আর আমি এমনভাবে প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়েছি যে দ্বিতীয়বার সে আর এই প্রস্তাবটা করতে সাহস পাবে না।

তার মানে? তবে এ-ই সেই লোক?

আপনি তাহলে একে চেনেন?

হ্যাঁ, কাপ্তেন। এতক্ষণে আমি বুঝে গিয়েছি যে এইমাত্র যাকে দেখতে পেয়েছি সে হলো ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, প্রেমবার্গের বিখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অটো স্টোরিৎস এর সুপুত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এটা কবুল করতেই হয় যে আমার সমস্ত সচেতন চেষ্টা সত্ত্বেও পরের দু-দিনে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের নাম বারেবারে আমার মনের মধ্যে হানা দিয়েছে। তাহলে এই রাগৎস এই সে সাধারণত থাকে, আর এটাও আমি তারপরেই জেনে গিয়েছি যে তার সঙ্গে থাকে একজনই মাত্র ভৃত্য, হেরমান, সেও তার প্রভুর মতোই রূঢ়, ভ্রূকুটিপরায়ণ, এবং প্রভুর মতোই সে সারাক্ষণ তার মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। আমার কেবলই থেকে থেকে এটাও মনে হচ্ছিলো যে, সেদিন যে-লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছিলো বলে আমার ধারণা হয়েছিলো, যাকে আমি ভেবেছিলুম চোখের ভুল অথবা মতিভ্রম বলে, তার চলাফেরার ভঙ্গির সঙ্গে এই হেরমানের চলাফেরার ভঙ্গির কোনোই তফাৎ নেই।

বুলভার তেকেলিতে আমি আর কাপ্তেন হারালান আচমকা কার মুখোমুখি গিয়ে পড়েছিলুম, তা মার্কের কাছে বলে দিয়ে কোনো লাভ হবে না বলেই আমি ভেবেছিলুম। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে রাগৎস-এ ফিরে এসেছে এটা শুনলে মার্ক হয়তো বেশ বিচলিত হয়েই পড়বে। শঙ্কার ছায়া ফেলে খামকা বেচারার মনখারাপ করে দিয়ে কী লাভ? আমি নিজে অবশ্য মনে-মনে একটু ঘাবড়েই গিয়েছি–মার্ক আর মাইরার বিয়ের আগেই মার্কের প্রতিদ্বন্দ্বীর এই আবির্ভাব কোনো গণ্ডগোলের সূত্রপাত নয় তো?

ষোলো তারিখ সকালবেলায় আমি যখন হাঁটতে বেরুবো বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ কাপ্তেন হারালান এসে হাজির। একটু অবাকই হয়ে গেছি আমি তাকে দেখে,

কেননা এটা স্থির হয়েছিলো সেদিন আর হারালানের সঙ্গে আমার দেখা হবে না, কেননা তার নাকি সামরিক বাহিনীতে কী-একটা জরুরি কাজ আছে।

আরে! তুমি! আমি বিস্মিতভাবে বলে উঠেছি, হঠাৎ যে! তা, ভালোই হলো?

আমার হয়তো দেখারই ভুল হয়ে থাকবে, কিন্তু তার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন কোনো কারণে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সে শুধু বললে, মঁসিয় ভিদাল, বাবা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। তিনি বাড়িতে আপনারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।

চলো, তোমার সঙ্গেই যাই, আমি উত্তর করেছি; খুবই আশ্চর্য বোধ করেছি আমি, একটু যেন অস্বস্তিও–যদিও এর কোনো স্পষ্ট কারণ ছিলো না। আবার কী নতুন উৎপাত হলো যে ডাক্তার রডারিখ এই সাতসকালে আমাকে তলব করে পাঠিয়েছেন? মার্কের বিয়ে সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেই কি? কোনো কথা না-বলেই দুজনে আমরা তারপর হেঁটে গিয়েছি রডারিখ-ভবনে।

ডাক্তার একাই বসেছিলেন তার পড়ার ঘরের টেবিলে। মুখ তুলে তাকাতেই মনে হলো ছেলের চেয়েও বেশি যেন ঘাবড়ে গিয়েছেন তিনি।

নিশ্চয়ই কিছু-একটা হয়েছে, আমি মনে-মনে ভেবেছি, আর ছোটোহাজরির টেবিলে সকালে যখন মার্কের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তখন সে এর বিন্দুবিসর্গও কিছু জানতো না।

আমি ডাক্তার রডারিখের মুখোমুখি একটা আরাম কেদারায় বসে পড়েছি, কাপ্তেন হারালান ম্যান্টলপীসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর আমি একটু শঙ্কিতভাবেই

ডাক্তার কী কথা পাড়েন, তার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করেছি। আপনি যে সব কাজ ফেলে এক্ষুনি দেখা করতে এসেছেন, সেইজন্যে, ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, সেইজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি উত্তর দিয়েছি, আমি সবসময়েই আপনার কাজ করতে প্রস্তুত, ডাক্তার রডারিখ।

আমি হারালানের উপস্থিতিতেই আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

বিয়ের ব্যাপারে কিছু?

হ্যাঁ, বিয়ের ব্যাপারেই।

তার মানে আপনি যে-কথা বলতে চাচ্ছেন তা নিশ্চয়ই খুবই সিরিয়াস-কিছু?

হ্যাঁও বটে, আবার নাও বটে, ডাক্তার একটু ইতস্তত করেছেন, তবে এ-ব্যাপারটা কিন্তু আমার স্ত্রী-কন্যা অথবা আপনার ভাই–কেউই কিছু জানেন না। আপনাকে যা বলতে যাচ্ছি, তা এঁদের কানে উঠুক, এটা আমি ঠিক চাই না। সবকিছু শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমার এ-সিদ্ধান্ত ঠিক কি না।

প্রায় যেন আঁতের মধ্যেই আমি ততক্ষণে টের পেয়ে গেছি বুলভার তেকেলির হানাবাড়ির সামনে সেদিন যার সঙ্গে আমার আর হারালানের দেখা হয়েছিলো, সে-ই কোনোভাবে এই প্রহেলিকাটির মূলে।

গতকাল, অপরাহ্,ে ডাক্তার রডারিখ ততক্ষণে প্রসঙ্গটি পেড়েছেন, মাদাম রডারিখ আর মাইরা যখন বাড়ি ছিলো না, আর আমার রুগি দেখার সময় এগিয়ে এসেছে, হঠাৎ আমার পরিচারক এসে জানালে যে এমন-একজন ব্যক্তি আমার দর্শনপ্রার্থী, যার সঙ্গে আমার ঠিক দেখা করার ইচ্ছে ছিলো না। সেই দর্শনপ্রার্থীই হলো ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, কিন্তু আপনি হয়তো এই জার্মানটার কথা কিছু শোনেননি...

আমি তার সম্বন্ধে জানি, আমি বাধা দিয়ে জানিয়েছি।

তাহলে এও নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে প্রায় মাস ছয়েক আগে, আপনার ভাই মাইরার পাণিপ্রার্থনা করার অনেক আগে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। আমার স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে কথা বলে–তার সম্বন্ধে তাদেরও একই রকম বিতৃষ্ণা ছিলো–আমি ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে আমি তার প্রস্তাবে সম্মত হতে অপারগ। এই প্রত্যাখ্যানটা মেনে না-নিয়ে সে সরাসরি সরকারিভাবে বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠায়–আমিও সরাসরি এমনভাবে তাকে আমাদের অসম্মতি জানিয়ে দিই যে তার যে এ-ব্যাপারে কোনোই আশা নেই, সেটা বুঝতে পারার কোনো অসুবিধে তার ছিলো না।

ডাক্তার রডারিখ যখন পুরো ব্যাপারটা বিশদ করে আমায় জানাচ্ছিলেন, কাপ্তেন হারালান তখন কেমন অস্থিরভাবে সারা ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলো। বেশ কয়েকবারই একটা জানলার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বুলভার তেকেলির দিকে তাকাচ্ছিলো।

ডাক্তার রডারিখ, আমি ততক্ষণে তাকে জানিয়েছি, এই প্রস্তাবের কথা আগেই আমার কানে এসেছে। আমি এও জানি যে আমার ভাই বিয়ের প্রস্তাব করার আগেই

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তার প্রস্তাব করেছিলো।

হ্যাঁ, প্রায় তিন মাস আগে।

কাজেই, আমি বলেছি, এ তো আর এমন নয় যে মার্কের সঙ্গে আগেই বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিলো বলে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে উপেক্ষা করা হয়েছে, বরং তাতে এটাই বোঝা যায় যে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে আপনাদের আদপেই ইচ্ছে করেনি

তা তো করেইনি! আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, এ-রকম কোনো বিবাহসম্বন্ধে আমরা কিছুতেই সম্মতি দিতুম না–তাছাড়া মাইরা নিজেও সে-বিয়েতে বেঁকে বসেছিলো, সে নিজেই এ-বিয়েতে রাজি হয়নি।

সে কি ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের সামাজিক পদমর্যাদার জন্যে? না কি আরো-কোনো ব্যক্তিগত আপত্তি ছিলো?

তার সামাজিক পদমর্যাদা হয়তো অনেকের চাইতেই বেশ ওপরে, ডাক্তার রডারিখ আমায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, এটা ধরেই নেয়া যায় যে তার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পিতৃদেব তার জন্যে অতুল বৈভব রেখে গিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি হিশেবে সে নিজেই

আমি তাকে জানি, ডাক্তার রডারিখ।

আপনি ওকে চেনেন?

আমি তখন খুলে বলেছি কী করে আমার সঙ্গে ডরোথিতে তার দেখা হয়েছিলো, যদিও তখন আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি সে আসলে কোন মহাশয়। কারণ সেই জার্মান তো মাত্র তিন-চারদিনই আমার সহযাত্রী ছিলো, আর আমি যখন রাগস পৌঁছেছি সে তখন বজরায় ছিলো না–সেইজন্যেই আমি ধরে নিয়েছিলুম যে সে ভুকোভারে নেমে গিয়েছে।

সেদিন, আমি আরো বলেছি, আমি আর কাপ্তেন হারালান তার বাড়ির পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলুম, শুধু তখনই তাকে ঐ বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে আমি বুঝতে পারি যে আমার সেই সহযাত্রীটিই আসলে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস।

অথচ তবু কি না লোকের মুখে শুনেছি সে কয়েক সপ্তাহ আগেই রাগৎস ছেড়ে চলে গিয়েছে, বলেছেন ডাক্তার রডারিখ।

লোকে তা-ই ভেবেছে। আর সে-যে অন্তত কিছুদিনের জন্যে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো তার আরো প্রমাণ হলো যে মঁসিয় ভিদাল তাকে বুডাপেস্ট-এ দেখেছেন, এবার কাপ্তেন হারলান তার মত ব্যক্ত করেছে, তবে সে-যে আবার রাগৎস-এ ফিরে এসেছে, তাতে আর-কোনো সন্দেহই নেই।

ডাক্তার রডারিখ আবার নিজের কথার খেই তুলে নিয়েছেন, তার সামাজিক পদমর্যাদা সম্বন্ধে আমার কী ধারণা, তা তো আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি, মঁসিয় ভিদাল। আর তার জীবনযাপনের ধরন–তার বাঁচনরীতি-সেটা যে কী, তা কেই-বা বুকে হাত দিয়ে

বলতে পারে যে সে তা জানে? সেটা পুরোপরি কুহেলিঢাকা, প্রহেলিকায় ভরা। লোকটা যেন মনুষ্যসমাজের বাইরেই তার সময় কাটায়।

এটা কি আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন না? আমি আপত্তি জানিয়েছি।

আমি জানি যে এতে একটু হয়তো অতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু তবু এটা তো ঠিক যে তার উদ্ভব হয়েছে কোনো সন্দেহজনক বংশে। তার আগে তার বাবা অটো। স্টোরিৎসও বিস্তর উদ্ভট কিংবদন্তির বিষয় হয়েছিলেন।

সেই কিংবদন্তিগুলো তার মৃত্যুর পরও যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ তার সম্বন্ধে আমি ভারি অদ্ভুত সমস্ত কথা বুড়াপেশটের একটা খবরকাগজে পড়েছি। উপলক্ষ ছিলো তার মৃত্যুবার্ষিকী, যেটা প্রতি বছরই প্রেমবার্গে ধুমধাম করে উদযাপিত হয়–প্রেমবার্গে ঠিক নয়, উদযাপিত হয় তার কবরখানায়। সেই খবরকাগজটাকে যদি সাক্ষী মানতে হয় তবে বলতেই হয় যে কুসংস্কারে-ভরা যে-সব কিংবদন্তির কথা আপনি বললেন, সময় তাতে একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি। মৃত বৈজ্ঞানিক এখনও নিজের সম্বন্ধে যাবতীয় উপকথাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। লোকের মতে, তিনি না কি ছিলেন মায়াবিদ্যায় সুপণ্ডিত এক ঐন্দ্রজালিক, যিনি পরলোকের সব রহস্য জানেন এবং এখনও যাবতীয় অতিপ্রাকৃত শক্তির চর্চা করে থাকেন। পড়ে মনে হলো, লোক আশা করে প্রতি বছরই তার বার্ষিকীর দিনে তার গোরস্থানে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছু ঘটবে।

তাহলে, মঁসিয় ভিদাল, ডাক্তার রডারিখ আলোচনায় ইতি টেনেছেন তারপর, প্রেমবার্গে লোকে কী বিশ্বাস করে এটা জানবার পর আপনার নিশ্চয়ই এটা জেনে বিস্ময় জাগবে

না, রাগৎস-এ লোকে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে কী অদ্ভুত চোখে দ্যাখে। ... আর সেই লোকই এসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। শুধু তা-ই নয়, তার ধৃষ্টতা এমনই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, গতকাল এসেও সে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

গতকাল! আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছি।

হ্যাঁ, গতকাল, যখন কাল বিকেলে সে এখানে এসেছিলো।

আর, কাপ্তেন হারালান তখন ঘোষণা করেছে, আর-কিছু যদি সত্যি নাও হয়, সে-যে প্রশিয়ান এটা তো ঠিক। আর তার প্রস্তাব উপেক্ষা করার পেছনে সেটাই যথেষ্ট কারণ।

ঐতিহ্য এবং পরম্পরা মাগিয়ারদের রক্তে জার্মানদের সম্বন্ধে যে-ঘৃণা যে জাতিবৈরিতা বুনে দিয়েছে, কাপ্তেন হারালানের এই ঘোষণায় সেটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

কী হয়েছিলো, বলছি, শুনুন। ডাক্তার রডারিখ বিশদ করে বলেছেন। আপনার ব্যাপারটা পুরোপুরি জানাই ভালো। আমাকে যখন এসে বললে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এসেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমি একটু দোনোমনা করেছিলুম... তাকে কি ভেতরে আসতে বলবো, নাকি সরাসরি বলে দেবে যে তার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়?

হয়তো সেই কথাই জানিয়ে দেয়াই ভালো হতো, বাবা,কাপ্তেন হারালান মাঝখানে পড়ে মন্তব্য করেছে, কারণ প্রথমবারে তার বিয়ের প্রস্তাব উপেক্ষা করার পর লোকটার বোঝা

উচিত ছিলো, কোনো অছিলাতেই তার আর এ-বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে পা দেয়া উচিত নয়।

হ্যাঁ, সে হয়তো ঠিক, ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, তবে আমার আবার এ-রকম কাঠখোট্টাভাবে কিছু বলে দিতে ভয় করে–তা থেকে না আবার কোনো কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হয়।

তাহলে আমি তার একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতুম, বাবা!

আর শুধু তোকে আমি জানি বলেই, ডাক্তার রডারিখ তার ছেলের হাত চেপে ধরেছেন, ঠিক সেইজন্যেই আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে, কোনো গোলমাল যাতে না-হয়, তার চেষ্টা করেছি... যা-ই হোক না কেন, আমি তোকে তোর মা, বোন বা আমার কথা মনে রাখতে আরজি জানাচ্ছি–যদি কোনো প্রকাশ্য কেলেঙ্কারির মধ্যে মাইরার নাম একবার উঠে পড়ে তাহলে সেটা তার পক্ষে ভারি বেদনাদায়ক হবে। এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি কোনো গোল পাকায়, তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ-টুদ্ধ তার কোনো উত্তর। হবে না।

কাপ্তেন হারালানকে আমি তো সবে গত কয়েকদিন ধরে দেখেছি, তাতেই আমার মনে হচ্ছিলো যতই ভদ্র বা শীলিত হোক না কেন, তার মাথায় বড় চট করেই রক্ত চড়ে যায়, নিজের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন, বংশের সুনামে একটা ছোট্ট আঁচড় পড়লেও সে তা আদপেই সহ্য করবে না। আর সেইজন্যেই আমার মনে হলো মার্কের এই প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বীর পুনরাবির্ভাব এবং পুনরায় বিবাহপ্রস্তাব পাঠানো কেন যেন একটা শোচনীয় সর্বনাশের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ডাক্তার রডারিখ তখন সেদিনকার মোলাকাটার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন–যাবতীয় খুঁটিনাটি সমেত। আমরা যে-ঘরটায় বসে আলোচনা করছি, সেই ঘরটাতেই ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিলো। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস গোড়ায় এমন সুরে কথা বলেছে, যাতে বোঝা যাচ্ছিলো সে একেবারে নাছোড়বান্দা লোক, একটা-কিছু তার মাথায় এলে সে তাতে আঠার মতো লেগে থাকতে পারে। তার বক্তব্য ছিলো, সে-যে ডাক্তার রডারিখের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছে এতে অবাক হবার কিছু নেই, রাগৎস-এ ফিরেই সে সবিনয়ে আবার-একবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করে দেখবে বলে সে আগেই ঠিক করে রেখেছিলো।

মিথ্যেই তখন ডাক্তার রডারিখ ভদ্রভাবে তার প্রস্তাবটি আবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যুদ্ধে বা প্রণয়ে হারবার পাত্র নয়, তার গলার স্বর ক্রমশ চড়েছে, শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, সে চেঁচিয়ে বলেছে মাদমোয়াজেল মাইরার সঙ্গে মার্ক ভিদালের যে-বাগদান হয়েছে সেটা এক্ষুনি নাকচ করে দিতে হবে, তার দাবিটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য, সে এই তরুণীর প্রণয়াসক্ত, এবং এই তরুণী যদি শেষ পর্যন্ত তার না-হয়। তবে সে যাতে আর-কারু না-হয় সেই ব্যবস্থা সে করবে।

কী ঔদ্ধত্য!... কী আস্পর্ধা! চেঁচিয়ে উঠেছে কাপ্তেন হারালান, এমন কথা বলবার দুঃসাহস তার হয় কী করে! আমি যদি তখন এখানে থাকতুম তবে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতুম!

ঠিক জানি, আমি মনে-মনে ভেবেছি, এরা দুজনে যদি কখনও পরস্পরের মুখোমুখি হয় তবে ডাক্তার রডারিখ যে-ভয় পাচ্ছেন তা-ই হবে–একটা রক্তারক্তি কাণ্ড এড়ানো মুশকিল হবে–সংঘর্ষ একটা অনিবার্য।

শেষে যখন সে চেঁচিয়ে এই হুমকিটা দিয়েছে, ডাক্তার রডারিখ বলেছেন, আমি তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে ইঙ্গিত করেছি আমি তার এ-রকম কথা শুনতে আদৌ প্রস্তুত। নই। বিয়ের সব কথা ঠিক হয়েছে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠানটা পাকাপাকিভাবে ঘটে যাবে।

কয়েকদিন কেন, কোনোদিনই আর ঐ অনুষ্ঠান হবে না, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস হুমকি দিয়েছে।

মহাশয়, আমি তখন তাকে দরজাটা দেখিয়ে বলেছি, অনুগ্রহ করে বিদেয় হোন! অন্য যে-কেউ হলে বুঝতে পারতো তার পক্ষে এই আলোচনা প্রলম্বিত করা মোটেই উচিত নয়।

কিন্তু ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অন্য ধাতে গড়া, সে বসেই থেকেছে, আবার নামিয়ে এনেছে গলার স্বর, ভয় দেখিয়ে যা আদায় করতে পারেনি তা সে এবার বিনয় দেখিয়ে বশে আনতে চেয়েছে–অন্তত এই কথাটা আদায় করতে চেয়েছে যে মাইরা ও মার্কের বিয়ের প্রস্তাবটা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। আর-কোনো উপায় না-দেখে দরজার কাছে গিয়ে আমি ঘণ্টা বাজিয়েছি ভৃত্যদের জন্য। সে অমনি আমার হাতটা চেপে ধরেছে, আবার তার ঐ বদরাগ ফিরে এসেছে শতগুণে-আরক্ত চোখে, ধমকের সুরে, চীৎকারে –এতটাই

সে চাঁচাচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো বাইরে থেকেও তা শোনা যাচ্ছে। ভাগ্যিশ আমার স্ত্রী বা কন্যা কেউই তখন বাড়ি ছিলেন না।

অবশেষে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-অগত্যা–যেতে রাজি হলো, কিন্তু যাবার আগে ভয়ংকর-সব হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলো। মাইরা যেন কিছুতেই মার্ককে বিয়ে না-করে। এমন সমস্ত বাধাবিপত্তির উদ্ভব হবে যে অনুষ্ঠানটাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। স্টোরিৎসদের এমন অনৈসর্গিক শক্তি আছে যা সমস্ত মানুষী চেষ্টাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে, আর তাকে যে-পরিবার এমন উপেক্ষা করেছে, তুচ্ছ করেছে, তার বিরুদ্ধে এই অনৈসর্গিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে সে মোটেই দ্বিরুক্তি করবে না... তারপর সে স্টাডির দরজা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সজোরে খুলে দাপাতে-দাপাতে চলে গেলো; আর আমি তার ঐ-সব দুর্বোধ হুমকিতে বিচলিত হয়ে হতভম্বভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলুম।

ডাক্তার রডারিখ আবারও পইপই করে আমাদের বলেছেন, এর একটা কথাও যেন ঘুণাক্ষরেও মাইরা বা মাদাম রডারিখের কানে গিয়ে না-পৌঁছোয়–মার্ক যে এর বিন্দুবিসর্গও টের পাক, তাও তার ইচ্ছে নয়। তাদের অন্তত এই উদ্বেগ ও আশঙ্কা থেকে অব্যাহতি দেয়া উচিত। তাছাড়া, আমিও এটা ভালো করেই জানতুম যে মার্কও কাপ্তেন। হারালানের মতোই ব্যাপারটার এক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চাইবে, চাইবে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা। কাপ্তেন হারালান অবশ্য তখনকার মতো তার বাবার কথা গত্যন্তর না-দেখে মেনে নিয়েছে। বলেছে, বেশ, আমি গিয়ে ঐ হতভাগাটাকে কোনো সাজা দেবো না। কিন্তু ধরো সে নিজেই যদি গোল পাকাতে আমাদের কাছে আসে?... ধরো সে-ই গিয়ে যদি আচমকা মার্কের ওপর হামলা করে?... ধরো সে যদি ক্রমাগত খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আমাদের উত্ত্যক্ত করেই চলে?

না, ডাক্তার রডারিখ এ-সব অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার কোনো উত্তরই দিতে পারেননি।

এই বিমূঢ় দশাতেই তখনকার মতো আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। যা-ই ঘটুক কেন, আমাদের শুধু অপেক্ষাই করে যেতে হবে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি নেহাৎই কথার কথা না-বলে থাকে, যদি হুমকিগুলো সত্যি-সত্যি সে কাজে খাটাতে চায়, তাহলে ঝুলির বেড়াল তো বেরিয়ে পড়বেই, কোনো কথাই আর ধামাচাপা থাকবে না। কিন্তু তা না-হলে, আমরা কেউই যদি এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য না-করি, তাহলে কেউই কোনোদিন এই বিশ্রী অবাঞ্ছিত ব্যাপারটার কথা জানতে পারবে না। কিন্তু কীই-বা করতে পারে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস? বিয়েটা সে বন্ধ করবে কোন উপায়ে? সে কি প্রকাশ্যে সকলের সামনে মার্ককে অপমান করে তাকে বাধ্য করবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে? মাইরাকে সে কি বীর্যশুল্কা হিশেবেই মানুষের পর্যায় থেকে একেবারে নামিয়ে আনবে নিছক পুরস্কার বা পণ্যে–আবারও পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষ হাঁকিয়ে জাঁকিয়ে বসবে এইখানে?

আর তক্ষুনি খবর এলো প্রথম দফায় কী কাণ্ড ঘটাবে তার ঐ অপার্থিব ক্ষমতা! পুরভবনের দেয়ালে, যেখানে মার্ক আর মাইরার বিয়ের নোটিস টাঙানো ছিলো, সেটা নাকি দিনের বেলায়, প্রকাশ্যে, সকলের চোখের সামনে হাঁচকা টানে উপড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে কেউ। কে-সে? কেউ-না। কারণ সবাই যা চোখে দেখেছে, তা হলো : নিজে নিজেই দেয়াল থেকে উঠে এলো কাগজটা, আর ছিঁড়ে গেলো–আপনা থেকেই, নিজে-নিজেই। কেননা দেয়ালের গা ঘেঁসে কোত্থাও কেউ তখন ছিলো না ।

.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই প্রহেলিকা-ব্যাখ্যারও-অতীত এই-যে ব্যাপারটা ঘটে গেলো, কে তার ঘটক হতে পারে? তাতে যার নিজের স্বার্থ জড়িয়ে আছে, সে-ই তো। এই প্রথম আক্রমণের পর আরো-আক্রমণ হবে, এর চেয়েও গুরুতর, সাংঘাতিক? রডারিখ পরিবারের বিরুদ্ধে শোধ নেবার জন্যে একটানা যত-সব ভীষণ কাণ্ড ঘটানো হবে, এ তারই সূচনা নয় তো? তখন আমরা শুধু এই কথাই ভেবেছি।

পরদিন ভোরবেলায়–কাপ্তেন হারালান যখন তার বাবাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেছিলো, তখন, বোঝাই যেতে পারে, তিনি কী-রকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

নিশ্চয়ই ঐ বদমায়েশটার কাজ এটা, বিষম চটে গিয়ে হারালান বলে উঠেছিলো, কেমন করে যে কাণ্ডটা বাধিয়েছে, সেটা অবশ্য আমার মাথায় ঢুকছে না। এখানেই সে-যে থেমে থাকবে না, তা জানি–কিন্তু ফের কোনো গোল না-পাকাতে পারে, আমাকে তারই কোনো-একটা উপায় ভেবে বার করতে হবে?

মাথা ঠাণ্ডা রাখো, হারালান, আমি বলছি, আর এমন-কিছুই কোরো না যা গোটা ব্যাপারটাকে আরো-গোলমেলে করে তুলবে।

বাবা যদি, লোকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে, আমায় হুঁশিয়ার করে দিতেন, কিংবা তার পরেও যদি আমাকে কিছু-একটা করবার অনুমতি দিতেন, তবে এতক্ষণে

আমরা হতচ্ছাড়ার হাত থেকে নিষ্কৃত পেয়ে যেতুম।

আমার কিন্তু এখনও মনে হয়, হারালান, তোমার নিজের এ-ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়া মোটেই ঠিক হবে না।

আর ও যদি জ্বালাতন করতেই থাকে?

তাহলে তখন পুলিশকে ব্যাপারটা হাতে নিতে বলতে হবে। তোমার মা-র কথা ভাববা, বোনের কথা ভাবো–

কী ঘটেছে, তারা কি তা আর জানতে পাবে না?

আমরা ওঁদের কিছুই বলবো না, মার্ককেও কিছুই জানাবো না, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে কী করে এর একটা সুব্যবস্থা করা যায়।

পরে...? বলেছে কাপ্তেন হারালান, কিন্তু তখন যদি বড়-বেশি দেরি হয়ে যায়?

ডাক্তার রডারিখের মনের ভেতরটায় যতটাই না বিষম উদ্বেগ থেকে থাকুক, সেদিন তার স্ত্রী বা কন্যার মনের ভেতর কিন্তু আসন্ন সান্ধ্য-মজলিশের কথা ছাড়া আর-কোনো ভাবনাই ছিলো না–সেই রাত্তিরেই বিয়ের চুক্তিটায় সই করা হবে। ডাক্তার অনেক লোককেই নেমন্তন্ন চিঠি পাঠিয়েছিলেন, আর এখানে, যেন কোনো নিরপেক্ষ ভূমিতেই, মাগিয়ার অভিজাত সমাজ সরকারি-সব কর্মচারীর সঙ্গেই মেশামিশি করবে, সামরিক বাহিনী, বিচারবিভাগ, পৌর দফতর–সব জায়গার লোকই থাকবে এখানে। মস্ত সব ঘর,

অনায়াসেই দেড়শো অভ্যাগত ধরে যাবে এখানে, আর সান্ধ্য-মজলিশের পর গ্যালারিতে। আয়োজন করা হবে নৈশভোজের।

মাইরা রডারিখ যে তার প্রসাধনের ব্যাপারে মশগুল হয়ে ছিলো, এতে নিশ্চয়ই অবাক হবার কিছু নেই, যদিও মার্ক তার সাজগোজের বহর আর বাহার দেখেই তার প্রতি আসক্ত হয়নি।

অপরাহ্নে, প্রস্তুতি সমস্তই যখন সারা আর মহিলারা বিশ্রাম করছেন, আমি হঠাৎ একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে দেখে বুঝি বেশ-একটু উত্ত্যক্তই বোধ করেছি। সে কি দৈবাৎ এখানে এসে হাজির হয়েছে? মনে তো হয় না। নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছে সে, মন্থর পায়ে, মাথাটা একটু নোয়ানো। কিন্তু যেই সে বাড়িটার উলটো দিকটায় এসে পৌঁছেছে, অমনি থমকে থেমে গিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সে, আর তার চোখ থেকে যেন আগুন বর্ষাতে শুরু করেছে।

বেশ কয়েকবার বাড়িটার বিপরীত দিকের শানরাস্তায় এদিক-ওদিক পায়চারি করেছে। সে, শেষটায় এমনকী মাদাম রডারিখেরও নজরে পড়ে গিয়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু ডাক্তার তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, ভাবনার কিছু নেই- এই অদ্ভুত লোকটা যে সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, সেটা তিনি ঘুণাক্ষরেও ফাস করেননি।

এখানে এই তথ্যটাও জুড়ে দেয়া উচিত মার্ক আর আমি যখন আমাদের হোটেলে যাবো বলে বেরিয়েছি, তখন একটা চকের মাথায় লোকটার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

মার্ককে দেখবামাত্র সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, একটু যেন দোনোমনা করেছিলো, পথের মাঝেই আমাদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা পাকাবে কি না। কিন্তু সে অনড় দাঁড়িয়েই রইলো, নিশ্চল, মুখটা থেকে সব রং যেন শুষে নিয়েছে কেউ, হাত দুটো এমনভাবে আড়-ধরা যেন সে বিষম এক মৃগীরোগেরই শিকার-ওখানে রাস্তাতেই আচমকা দুম করে পড়ে যাবে নাকি? তার চোখ দুটো–জ্বলজ্বলে বিস্ফারিত আগুন ধরা চোখ দুটি-মার্ককে পারলে যেন ভস্মই করে ফেলতো। মার্ক অবিশ্যি এমন ভান করেছে যেন লোকটাক সে দেখতেই পায়নি!

ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরেই মার্ক আমাকে জিগেস করেছে : ঐ লোকটাকে তুমি দেখলে?

হ্যাঁ, মার্ক।

ও-ই হলো ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, যার কথা সেদিন আমি তোমায় বলেছিলুম।

আমি জানি।

তাহলে একে তুমি চেনো?

কাপ্তেন হারালানই একে চিনিয়ে দিয়েছে–

আমি ভেবেছিলুম লোকটা বুঝি রাস ছেড়ে চলে গিয়েছে, মার্ক বলেছে।

দেখাই তো যাচ্ছে যে যায়নি–অথবা ক-দিনের জন্যে যদি গিয়েও থাকে, তবে আবার ফিরে এসেছে।

অবিশ্যি এতে কিছুই এসে-যায় না।

না, কী-ই বা এসে-যায়? মুখে এ-কথা বলেছি বটে, তবু ভেতরে-ভেতরে নিশ্চয়ই ভেবেছি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এখানে না-থাকলেই বুঝি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করা যেত।

সন্ধে নটা নাগাদ, ডাক্তার রডারিখের বাড়ির সামনে প্রথম কোচগাড়িগুলো এসে থামলো, আর ঘরগুলো লোকের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠলো। সামরিক উর্দি আর পোশাকি বেশভূষার মাঝে চারপাশ আলো করেই যেন ঝলমল করছে মহিলাদের পোশাক। অতিথিরা ঘরে বা গ্যালারিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, ডাক্তার রডারিখের পড়ার ঘরে সাজিয়ে-রাখা ছিলো ঝকঝকে সব বিয়ের উপহার–সবাই তার তারিফ করছে, হাসি-ঠাট্টা রসিকতা চুটকি গল্প দিয়ে কেউ-কেউ আসর জমাবার চেষ্টা করছে। মস্ত বৈঠকখানাটার একটা টেবিলে সাজিয়ে-রাখা আছে বিয়ের চুক্তিপত্র, একটু পরেই সেটাতে স্বাক্ষর করা হবে; অন্য-একটা টেবিলে জমকালো একটা গোলাপের তোড়া আর নারঙ্গি মুকুল–আর মাগিয়ার ঐতিহ্য অনুযায়ী, তার পাশেই, মখমলের জাজিমে, শোভা পাচ্ছে কনের মাথার মুকুট, বিয়ের দিন যখন মাইরা ক্যাথিড্রালে যাবে তখন সেটা পরবে।

ঠিক ছিলো, সন্ধের আসরটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে : কনসার্ট আর বলনাচের মজলিশের মাঝখানে সম্পাদিত হবে সবচেয়ে জরুরি কাজ–চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হবে। ত্রিগানেস-এর বিখ্যাত অর্কেস্ট্রার ওপরই সংগীত পরিবেষণের ভার পড়েছে, তাদের

দলের নেতাকে নিয়ে সবশুদ্দু জনা-বারো বাজিয়ে সেইজন্যে এখানে এসে জমায়েৎ হয়েছে।

মাগিয়ারদের সংগীতপ্রীতির কথা ইওরোপে কে না জানে, তবে মার্কের মন এই গানবাজনার দিকে ছিলো কি না সন্দেহ; সে সারাক্ষণ যেন অনিমেষ-লোচনেই তাকিয়েছিলো মাইরার দিকে। হাততালির উচ্ছ্বাস থেমে-যাবার পর বাজিয়েরা একে-একে যে যার আসন থেকে উঠতেই ডাক্তার রডারিখ আর কাপ্তেন হারালান এমন উচ্ছ্বসিতভাবে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তারিফ করলেন যে অর্কেস্ট্রার লোকেরা যেন লজ্জাই পেলে একটু।

এর পরেই এলো বিবাহ-চুক্তিতে স্বাক্ষরের পালা, যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গেই সাঙ্গ হলো সেটা, আর তারপরে সাময়িক একটা বিরতি এলো আসরের কাজে। অতিথিরা নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হয়ে আড্ডা দিচ্ছে, কেউ-কেউ গেছে আলোঝলমল বাগানটায় খোলা হাওয়ায়; পানপাত্রগুলো কখনোই আর শূন্য থাকছে না।

এতক্ষণের মধ্যে মজলিশের কোনো অনুষ্ঠানেই কোনো ঝামেলা হয়নি। যেমন হর্ষ ও আনন্দে তার সূচনা হয়েছে তেমনি হর্ষ ও আনন্দেই তার কেন সমাপ্তি হবে না, তার কোনো কারণ আমি অন্তত দেখিনি। সত্যি-বলতে, আগে মনের মধ্যে একটা কাটা যদি খচখচ করেও থাকে, এখন কিন্তু আমি রীতিমতো আশ্বস্তই বোধ করছিলুম–স্বস্তিও। কাজেই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্যে মাদাম রডারিখকে অভিনন্দন জানাতে আমার ভুল হয়নি।

মানুষের স্মৃতি ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়, ঠিক যেন একটা ধাঁধার মতো। কোথায় কখন কী কথার অনুষঙ্গে কোন কথা মনে পড়ে যায়, কে বলবে। কেন-যে হঠাৎ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর কথাই আমার মনে হানা দিচ্ছে, জানি না। তবে এও জানি, এই স্মৃতিও মন থেকে একদিন উধাও হয়ে যাবে।

অর্কেস্ট্রা আবার তৈরি হয়ে আছে, কাপ্তেন হারালানের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাবামাত্র তারা ফের বাজানো শুরু করে দেবে। কিন্তু গ্যালারির দিকে, যেখানে বাগানের দিকে দরজা খুলে গেছে, সেখান থেকে কার একটা গলা ভেসে এলো। আওয়াজটা এখনও বেশ দূরে, কিন্তু বড় যেন রূঢ়, রুক্ষ আর কর্কশ, আর উৎকট একটা গানের সুরে বেজে উঠেছে গলাটা, কিম্ভুত তার লয়, বিদঘুঁটে তার ছন্দ, গলায় সুরের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, বেতালা, বেসুরো, অদ্ভুত একটা গান।

প্রথম ভার্জ নাচের জন্যে যে-যুগলরা প্রায় পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলো তারা কেমন যেন থমকে গিয়েছে... উৎকর্ণ হয়ে গানটা শুনছে তারা-সান্ধ্য আসরের অংশ হিশেবেই কি এই চমকটার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

কাপ্তেন হারালান আমার দিকে এগিয়ে এলো।

কী এটা? আমি জিগেস করলুম।

জানি না, এমন-একটা সুরে সে উত্তর দিলে যার মধ্যে উদ্বেগের ভাবটা স্পষ্ট।

কোত্থেকে আসছে গানটা? রাস্তা থেকে?

উঁহু... সে-রকম তো মনে হচ্ছে না।

সত্যিই, অমন উৎকট বেসুরো গানটা যে গাইছে সে যেন বাগান থেকে ক্রমেই গ্যালারির দিকে এগিয়ে আসছে–প্রায় যেন ঢুকেই পড়েছে ভেতরে, বলা যায়।

কাপ্তেন হারালান আমার হাতটা চেপে ধরে আমাকে বাগানে যাবার দরজাটার দিকে টেনে নিয়ে গেলো। আমি বুঝি একটু আঁৎকে গিয়েই তার অনুসরণ করেছি, বাগানটা আলোয় ঝলমল করছে, এখান থেকে সম্ভবত পুরো বাগানটাকেই আমরা দেখতে পাবো...

কিন্তু কাউকেই আমরা দেখতে পাইনি।

ততক্ষণে ডাক্তার ও মাদাম রডারিখও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, ডাক্তার রডারিখ নিচু গলায় কী যেন বলেছেন তার ছেলেকে, আর সে শুধু ঘাড় নেড়েই তার উত্তর দিয়েছে।

অথচ সেই উৎকট বেতালা গানটা কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে–কেউ যেন গলা ছেড়ে গান গাইছে, আর শুধু তা-ই নয়, গানটা যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে কাছে...

মার্কও, মাইরার হাতে ধরে, গ্যালারিতে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে; মাদাম রডারিখ ফিরে গেছেন অন্য মহিলাদের মধ্যে–তারা ঘাবড়ে গিয়ে নানারকম প্রশ্ন করছেন, কিন্তু মাদাম রডারিখ তার কোনো জবাব দেবেন কী, তিনি নিজেই তো জানেন না এই অদ্ভুত হেঁড়েগলার গানটি কার অবদান।

আমি গিয়ে দেখছি কী ব্যাপার!বলে, কাপ্তেন হারালান সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো। আর তার পেছন-পেছন গেলেন স্বয়ং ডাক্তার রডারিখ, তার কয়েকজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে। কৌতূহলী হয়ে আমিও তাদের পেছন-পেছন গেলুম।

আচমকাই, যখন মনে হচ্ছে, এই গায়ক গ্যালারিটা থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে আছে, তখন গানটা থেমে গেলো।

আমরা বাগানে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলুম। সবখানেই আলো জ্বলছে, কোথাও এমন-কোনো কোণা নেই যেটা ঝাপসা অন্ধকারে বা ছায়ায় ঢাকা-খুঁজতেও আমরা কোনো কোণা বাকি রাখিনি, অথচ তবু কাউকেই আমাদের চোখে পড়লো না...

এই হেঁড়ে গলাটা তবে কার? বুলভার তেকেলির সেই ভবঘুরে গায়কটির?

সেটা সম্ভব বলে মনে হলো না, তাছাড়া দেখতে পেলুম বুলভারটিও সম্পূর্ণ জনশূন্য পড়ে আছে।

শুধু একটা আলো জ্বলছে, বামদিকে, পাঁচশো গজ দূরে, অতদূর থেকে সেই মিটমিটে আলোটা স্পষ্ট দেখাই যায় না। আলোটা এসে পড়েছে কোন-এক জানলা থেকে--ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়ির মিনার থেকে।

গ্যালারিতে যখন ফিরে গেলুম, তখন অভ্যাগতদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু অর্কেস্ট্রাকে আবার ভাজের বাজনা শুরু করে দিতেই বলতে পেরেছি। কাপ্তেন হারালান অর্কেস্ট্রাকে ইঙ্গিত করতেই আবার যুগলেরা সবাই নাচের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালে।

কী? মাইরা আমায় হেসে জিগেস করলে, আপনার নাচের সঙ্গিনী বেছে নেননি এখনও?

আমার সঙ্গিনী? সে-তো মাদমোয়াজেল আপনিই হবেন–তবে সে শুধু দ্বিতীয় ভালজটার জন্যে।

তাহলে, অঁ্রি, মার্ক বললে, আমরা তোমাকে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবো না।

মার্ক কিন্তু ভুল বলেছিলো। মাইরা আমার সঙ্গে যে-ভালজটা নাচবে বলে কথা দিয়েছিলো, তার জন্যে আমায় অনেকক্ষণ অপেকক্ষা করতে হয়েছে। সত্যি-বলতে, আমি এখনও সেই নাচটার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

অর্কেস্ট্রা তখন শুধু তার ভনিতা শেষ করেছে, আর অমনি, গায়ককে কেউ এবারও দেখতে পায়নি, হেঁড়েগলার গানটা বাজনা ছাপিয়ে বেসুর জাগিয়ে দিলে–এবারে বৈঠকখানাটির ঠিক মাঝখান থেকেই উঠলো আওয়াজ।

অতিথিরা শুধু আঁৎকেই ওঠেনি, সেইসঙ্গে তাদের পুরো ব্যাপারটাই জঘন্য লেগেছে। হেঁড়ে গলা ঘর ফাটিয়ে গেয়ে চলেছে ফ্রেডারিক মারগ্রাডে-র ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব, সেই আলেমান স্তোত্রগান, হিংসা ও হিংস্রতা ছড়ায় বলে সবখানেই যার জঘন্য কুখ্যাতি। মাগিয়ার স্বদেশপ্রেমের প্রতি ইচ্ছে করে, সরাসারি, কেউ কুৎসিত কটাক্ষ করছে-না, কটাক্ষমাত্র নয়, তাকে অপমানই করছে।

অথচ যার ঐ হেঁড়ে গলা গাঁক-গাঁক করে উঠেছে বৈঠকখানার ঠিক মাঝখানটায় কেউই তাকে দেখতে পাচ্ছে না... নিশ্চয়ই সে এখানে আছে, সকলের মাঝখানে, অথচ কেউ তার শ্রীমুখটিকে দেখতে পাচ্ছে না...

নাচিয়েরা সবাই বৈঠকখানার বিভিন্ন প্রান্তে ছিটকে ছড়িয়ে গেছে, গ্যালারিতেও গেছে অনেকে, আর কেমন-একটা গা-শিরশির-করা ভয় ছড়িয়ে পড়ছে সবখানে, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে।

কাপ্তেন হারালান ছুটে গেলো ড্রয়িংরুমটার এদিক থেকে ওদিক, তার চোখ দুটি থেকে আগুন ঝরছে, যে-লোকটাকে চর্মচক্ষু দেখতে পারছে না, পেলেই তাকে পাকড়ে ধরবে সজোরে, এমনিভাবে বাড়ানো তার হাত দুটি। আর সেই মুহূর্তেই শোনা গেলো ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব-এর শেষ স্বরগুলো, তারপরেই গলাটা আবার মিলিয়ে গেলো।

আর তারপরেই আমি দেখতে পেয়েছি, অন্তত আরো একশোজন আমার সঙ্গে দেখতে পেয়েছে আমি তখন যা দেখেছি–আর আমার মতোই তারাও কেউ নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে চায়নি।

টেবিলের ওপর গোলাপের যে-তোড়া ছিলো সারা ঘরটায় রঙ জ্বালিয়ে, হঠাৎ সেটা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেলো মেঝেয়, অদৃশ্য কার দাপাদাপি-করা পায়ের তলায় সেগুলো থেলে গেলো... ঐ-যে, মেঝের ওপর ছড়িয়ে আছে-কুটি-কুটি-করা–বিয়ের চুক্তিপত্রটা!

এবার আতঙ্কই নেমে এলো সকলের মধ্যে, যেন কোনো বিভীষিকা দেখে সকলেরই চোখ বিস্ফারিত। এ-রকম অপার্থিব ভুতুড়ে জিনিশ দেখে সবাই স্তম্ভিত, সন্ত্রস্ত, সকলেই যেন প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। আমি বুঝি তখন নিজেকে বারেবারে জিগেস করছি : আমার মাথা ঠিক আছে তো, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো, এই প্রহেলিকা কি তবে এই বিজ্ঞানের যুগেও বিশ্বাস করতে হবে!

কাপ্তেন হারালান এসে সদ্য তখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। রাগে তার মুখ যেন রক্তশূন্য! অস্ফুট স্বরে সে বলেছে : এ সেই হতভাগাই–ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!... হারালান পাগল হয়ে যায়নি তো?

তবে সে যদি পাগল না-হয়ে গিয়ে থাকে, আমার যে শিগগিরই মাথাখারাপ হয়ে যাবে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই! জেগে আছি আমি, কোনো আবেশ নেই তার, অথচ আমি তখন দেখতে পেয়েছি, হ্যাঁ, আমার নিজের চোখেই আমি দেখেছি, সেই মুহূর্তে, বিয়ের মুকুটটা মখমলের জাজিমের ওপর থেকে নিজে-থেকেই-যেন শূন্যে উঠে যাচ্ছে! কোন হাত যে সেটা উঠিয়েছে টেবিল থেকে, তা আমরা কেউই দেখিনি, কিন্তু আমাদের ফ্যালফ্যাল চোখের সামনেই সেটা ড্রয়িংরুম পেরিয়ে গিয়ে, গ্যালারির মধ্য দিয়ে, বাগানে চলে গেলো–আর তারপরেই সেটা, বেমালুম, অদৃশ্য হয়ে গেলো!

এ-যে ভীষণ ব্যাপার!... অস্ফুট স্বরে বলে উঠেছে কাপ্তেন হারালান।

ড্রয়িংরুম থেকে সে তখন তীরের মতো ছুটে বেরিয়েছে, গিয়ে নেমেছে বুলভার তেকেলিতে! আমিও তক্ষুনি তার পেছন-পেছন ছুটেছি।

একজনের পেছনে আরেকজন, আমরা হুড়মুড় করে ছুটে গিয়েছি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়িতে। উঁচুতে, মিনারের শুধু-একটা-মাত্র জানলা তখনও মিটমিট করে জ্বলছে অন্ধকারে। হারালান ফটকের হাতলটা ধরে তখন সজোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে । আমার ওপরও কী-যে ভর করেছে, জানি না, আমিও তার সঙ্গে সেই হাতল ধরে তারই সঙ্গে প্রাণপণে টান দিয়েছি। নিরেট, ভারি পাল্লা সেই ফটকের, দুজনে মিলেও তাকে একফোঁটাও নড়াতে পারিনি। কয়েক মুহূর্ত ধরে শুধু প্রাণপণেই টেনেই গেছি আমরা হাতল। রাগে আমরা বোধহয় তখন সব চেভেদ হারিয়ে ফেলেছিলুম...

হঠাৎ ফটকের পাল্লাটা তার কজার উপর সশব্দে নড়ে উঠেছে...

ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে অভিযুক্ত করে কাপ্তেন হারালান স্পষ্টই একটা মস্ত ভুল করে বসেছিলো... ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ককখনো বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি সন্ধেবেলায়, কারণ ফটকের পাল্লা দুটি খুলে আমাদের সামনে এসে এখন যে পঁড়িয়েছে সে খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই, সশরীরে, জলজ্যান্ত, তর্কাতীত।

.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন ভোরবেলাতেই এ-সব ঘটনার সত্য-মিথ্যা বিবরণ দাবানলের মতো গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রথমত, লোকে যে এ-সব ঘটনাটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে না, এটা তো জানা কথাই ছিলো। অথচ স্বাভাবিক যদি না-হয়, তবে কী? বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যা চলে না–অন্তত এখনও এর কোনো ব্যাখ্যা কারু জানা নেই। তবে কি অতিপ্রাকৃত-কিছু? অলৌকিক?

সন্ধের মজলিশ তো তার পরেই ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিলো। সব ভেস্তে যাওয়ায় মার্ক আর মাইরাও বিষম বিচলিত হয়ে পড়েছিলো। তাদের ফুলের তোড়া কেউ দাপাদাপি। করে ঘেঁৎলে দিয়েছে পায়ের তলায়, ছিঁড়ে কুটিকুটি করেছে বিয়ের চুক্তি, এমনকী সকলের ফ্যালফ্যাল চোখের সামনে দিয়ে চুরি হয়ে গেছে কনের মুকুট!... বিয়ের ঠিক আগেই, এ-কী অলক্ষুণে কাণ্ড!

দিনের বেলায় দলে-দলে লোক ভিড় করে এসেছে বাড়ির সামনে, উত্তেজিতভাবে কত-কী বলাবলি করেছে। কারু-কারু মুখে তো উড়ো-খইয়ের মতো তুলকালাম সব অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা ফুটেছে, কেউ-কেউ শুধু ভীত-সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে দেখেছে বাড়িটা। হানাবাড়ি নাকি?

রোজ যেমন সকালবেলায় বেড়াতে বেরোন, তেমনিভাবে মাদাম বা মাদমোয়াজেল রডারিখ আজ আর বেড়াতে বেরোননি। মাইরা সারাক্ষণ তার মায়ের সঙ্গে-সঙ্গে থেকেছে

ছায়ার মতো, পুরো ব্যাপারটায় বিষম ঘাবড়েই গিয়েছে সে, তার নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

আটটার সময় মার্ক আমার ঘরের দরজা খুলে ঢুকেছে, সঙ্গে তার ডাক্তার রডারিখ আর কাপ্তেন হারালান। সব ভালো করে আলোচনা করে নিতে হবে আমাদের, জরুরি কী-ব্যবস্থা করা যায় সে-বিষয়টা ঠিক করে নিতে হবে। ভালো হয়, যদি সেই আলোচনাসভা রডারিখভবনে না-বসে। সারা রাত মার্ক আর আমি একসঙ্গে থেকেছি, শুধু দিন ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়েছে মাদাম রডারিখ আর তার ভাবী বধুর খবর নিতে। তারপর, তারই পরামর্শে, ডাক্তার তার ছেলেকে নিয়ে এখানে চলে এসেছেন।

আঁরি, মার্ক শুরু করেছে, আমি বলে দিয়েছি, কাউকে যেন এ-ঘরে ঢুকতে না দেয়, এখানে কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাবে না, আমরা ছাড়া ঘরে আর-কেউ নেই–কেউই নেই! কিন্তু এ-কী দশা হয়েছে মার্কের! আগের দিন সন্ধেবেলায় যে মুখটা ছিলো হর্ষোজ্জ্বল, সুখী, এখন সেই মুখই কেমন যেন ঝুলে পড়েছে, রক্তহীন, ফ্যাকাশে, তবে এমন অবস্থায় সকলেই যেমন ঘাবড়ে গিয়েছে, তার চেয়ে বেশিকিছু তার হয়নি সম্ভবত।

ডাক্তার রডারিখ প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যাতে তার সংযমের বাঁধ ভেঙে না-পড়ে। তার ছেলের অবস্থা অবশ্য ঠিক তার উলটোই, ঠোঁট চাপা, চোখ দুটো রক্তবর্ণ, উত্তেজিত; সে-যে কী-রকম ঘোরের মধ্যে আছে, তার মুখচোখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে নিজেকে আমি সারাক্ষণ পইপই করে বুঝিয়েছি। তাছাড়া আমাকে তো প্রথমে মাদাম রডারিখ ও তার মেয়ের কুশল জেনে নিতে হবে।

কাল যা কাণ্ড হয়েছে, তাতে দুজনেই ভারি বিচলিত হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার আমার প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, তাদের সেরে উঠতে কয়েকদিন লেগে যাবে। তবে মাইরা-গোড়ায় সে ভারি ঘাবড়েই গিয়েছিলো–এখন সামলে ওঠবার চেষ্টা করছে, মাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করছে–তিনি তো তার চাইতেও বেশি মুষড়ে পড়েছেন। আশা করি কাল সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি শিগগিরই তার মন থেকে মুছে যাবে–যদি-না অবশ্য আবার ও-রকম জঘন্য কোনো কেলেঙ্কারি হয়...

আবার কোনো কেলেঙ্কারি? আমি জিগেস করেছি, তার কোনো ভয় নেই আমাদের, যে-অবস্থায় অমন বিদঘুঁটে কাটা হয়েছে–বিদঘুঁটে বা উৎকট ছাড়া আর কী-ই বা বলবো একে–সে-রকম কোনো পরিস্থিতি আর হবে না।

কে জানে? ডাক্তার রডারিখ বুঝি কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারেননি। কে জানে? বিয়েটা এখন ভালোয়-ভালোয় হয়ে গেলেই বাঁচি। এখন আর আমি ও-সব হুমকিকে অবিশ্বাস করতে পারছি না...

পুরো বাক্যটা তিনি শেষ করতে চাননি, কিন্তু আসলে তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছিলেন, কাপ্তেন হারালান এবং আমার তা মোটেই অগোচর থাকেনি। মার্ক যেহেতু ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর শেষ অপকীর্তির কোনো খবর রাখে না, সে তাই ঐ হুমকির কথাটা ঠিক ধরতে পারেনি।

কাপ্তেন হারালানের একটা নিজস্ব মত ছিলো, তবে সে টু শব্দটি না-করে চুপচাপ থেকেছে, সম্ভবত জানতে চাচ্ছে গত রাতের কাণ্ডটা সম্বন্ধে আমি সত্যি-সত্যি কী ভাবছি।

মঁসিয় ভিদাল, ডাক্তার জিগেস করেছেন, এ-সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে?

আমার মনে হয়েছে আমি যদি কোনো অবিশ্বাসীর ভূমিকায় অভিনয় করি, তাহলেই ভালো করবো : কাল রাতে যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, তাদের ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়তো ঠিক হবে না। আপাতত কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বলেই যে ওদের ভুতুড়ে বা অতিপ্রাকৃত বলে ভাবতে হবে, এমন মাথার দিব্বি কে দিয়েছে। তবু, এখানে চুপি-চুপি কবুল করি, ডাক্তার রডারিখের প্রশ্নটা আমায় ভারি অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলো।

ডাক্তার রডারিখ, আমি শুধু বলেছি, আমার মনে হয় ও-সব ব্যাপারকে খুব একটা পাত্তা না দিলেও চলবে। কারু কোনো রসিকতা, কোনো প্র্যাকটিক্যাল জোক, এছাড়া আর এদের নিয়ে কী ভাববো, বলুন। আপনার অতিথিদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ ছিলো যে নানারকম হাতসাফাইয়ের খেলা দেখায়, কোনো ম্যাজিশিয়ান, আর কোনো ওস্তাদ হরবোলা, সন্ধের মজলিশটা সে তার নিজের কারদানি দেখিয়ে জমাতে চেয়েছিলো... আপনি তো জানেনই এ-সব জাদুবিদ্যায় আজকাল কত লোক ওস্তাদ হয়ে উঠেছে... তবে তার রুচিটা অবশ্য একটু উৎকট গোছের ছিলো, এটা মানতেই হয়...

কাপ্তেন হারালান আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনিমেষ-লোচনে শুধু আমাকে নিরীক্ষণই করেছে তখন, যেন বুঝতে চেয়েছে, মুখে যা-ই কেন না-বলি, ভেতরে ভেতরে আমি সত্যি কী ভাবছি। তার দৃষ্টিটা যেন এই কথা বলতে চেয়েছে : আমরা কিন্তু এ-সব উটকো হেঁদো কথা শুনতে আসিনি।

তার মানে, মঁসিয় ভিদাল, ডাক্তার বলে উঠেছেন, কাল যা হয়েছে, তা আসলে ছিলো কারু ম্যাজিকের খেলা...

ডাক্তার রডারিখ, আমি তাকে থামিয়ে দিয়েই বলেছি, এই ব্যাখ্যাটা বিশ্বাস না করলে বলতে হয় কাল যা ঘটেছিলো তা কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা–কিন্তু সেটা আমি আদপেই মানতে রাজি নই...

অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক নয়, এতক্ষণে কথার মাঝখানে ঢুকেছে কাপ্তেন হারালান, স্বাভাবিক কোনো ব্যাপারই ছিলো–তবে কীভাবে কেউ এ-সব কাজ হাসিল করেছে, সেই পদ্ধতিগুলোই শুধু আমাদের জানা নেই।

আমি আবারও জোর দিয়ে বলেছি, কাল যার গলা আমরা শুনেছি, সেটা মানুষেরই গলা। আর তা যদি হয়, তবে তা যদি কোনো হরবোলার বদ রসিকতার নিদর্শন না হয়, তবে কী?

ডাক্তার রডারিখ তখন এমনভাবে মাথা নেড়েছেন যেন এমন ব্যাখ্যা তার কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না।

তখন, তর্কের খাতিরে, আমি আবারও বলেছি, এত অতিথির মধ্যে কোনো উটকো লোক যে ঢুকে পড়েনি, তা-ই বা কে বলবে? সে সম্ভবত ড্রয়িংরুমে গিয়ে তার হরবোলার খেল দেখিয়ে ঘৃণাবিদ্বেষের স্তবটা গেয়ে মাগিয়ারদের জাতীয়তাবোধকেই ঘা দিতে চেয়েছিলো। সম্ভবত লোকটা আলেমান–বা তা যদি নাও হয়, তাদেরই পোষা কোনো চর।

যদি আমরা ব্যাপারটাকে অমানুষিক-কিছু বলে না-ভাবি, তাহলে এই অনুমানটাকে অবিশ্বাস করার বা সত্য বলে না-মানার কোনো কারণ নেই। ডাক্তার রডারিখ এ সম্ভাবনাটাকে উড়িয়ে না-দিলেও খুব সহজ একটা সত্য কথা বলেছেন :

আপনার কথাটাকেই যদি মেনে নিই, মঁসিয় ভিদাল, যে কোনো হরবোলা–বা কোনো উদ্ধত আলেমান চরই-অনামন্ত্রিত ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ে আমাদর তার কারদানি দেখিয়ে ভড়কে দিতে চেয়েছিলো–আমার অবশ্য এ-কথায় আদৌ কোনো সায় নেই–তবে ঐ ফুলের তোড়া মাড়িয়ে থেৎলে দেয়া, বিয়ের চুক্তিপত্রটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলা বা অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে ঐ বিয়ের মুকুট নিয়ে কেটে পড়া–এদের আপনি কী করে ব্যাখ্যা করবেন?

ঠিকই, যত-বড়ো জাদুগরই হোক না কেন, কেউ কিছু টের পেলে না, আর সে দিব্বি সকলর চোখে ধুলো দিয়ে এ-সব অপকীর্তি করে গেলো, এটা অবশ্য মানতে মন চায় না। অথচ আছে তো নিশ্চয়ই দুর্দান্ত সব জাদুগর, অদ্ভুতকর্মা ম্যাজিশিয়ান!

কাপ্তেন হারালান তখন আমায় খুঁচিয়েছে, কী, কিছু বলছেন না কেন, মঁসিয় ভিদাল। ফুলের তোড়াটা যে ছিঁড়েছে, বিয়ের চুক্তিপত্রটা যে কুচিকুচি করেছে, বিয়ের মুকুটটা তুলে নিয়ে ড্রয়িংরুম থেকে চোরের মতো যে কেটে পড়েছে, সে কেমনতর হরবোলা–আর এ-সবই বা কেমনতর প্র্যাকটিক্যাল জোক?

আমি এ-কথার কোনো উত্তর দিইনি।

কাপ্তেন হারালান কেমন তেতে উঠেই বলেছে, আপনি কি আমাদের এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমরা সবাই কোনো বেঘোরবিভ্রমের শিকার হয়েছি–পুরোটাই ছিলো সমবেত অলীকদর্শন!

উঁহু, তা নিশ্চয়ই নয়, কোনো বেঘোরবিভ্রমই নয়–একশোরও বেশি লোক সবকিছু নিজেদের চোখে দেখেছে–এমন সমবেত বিভ্রম ঠিক স্বাভাবিক নয়।

আমাকে কোনো উচ্চবাচ্য করতে না-দেখে ডাক্তার রডারিখই তারপর নিজের মত দিয়েছেন : যা যেমনভাবে ঘটেছে, তাকে তেমনভাবেই আমাদের মেনে নেয়া উচিত। নিজেদের যেন আমরা ঠকাবার চেষ্টা, না-করি। এমন-সব জিনিশ ঘটেছে এখনও যার কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা আমাদের হাতে নেই–অথচ এগুলো যে ঘটেছে তাও আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছি না। তবে, আমরা যদি মূল প্রসঙ্গটা থেকে দূরে সরে যেতে না-চাই, তাহলে আমাদের মানতেই হবে যে এ কারু ঠাট্টাইয়ার্কি ছিলো না, বরং শত্রুর কাজ, নেহাৎই কোনো দুশমনের অপকীর্তি, যে সারা সন্ধ্যার উৎসবটাকে ভেস্তে দিয়ে আমাদের ওপর শোধ নিতে চাচ্ছিলো।

দুশমন! এতক্ষণে মার্কের বিস্ময় আরো বহুগুণ চড়ে গিয়েছে। আপনার দুশমন? আমার? আপনি তাকে চেনেন?

হ্যাঁ, এবার কাপ্তেন হারালান ঝুলি থেকে বেড়ালটাকে বার করে দিয়েছে, হ্যাঁ, মার্ক। এ সেই পাজিটা যে তোমার আগে আমার বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস?

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস।

মার্ক যা জানতো না, এবার তাকে তা-ই খুলে বলা হয়েছে। কয়েকদিন আগে আবার সে-যে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলো, তার কথা বিশদভাবে খুলে বলেছেন ডাক্তার রডারিখ। তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, সে যে-সব হুমকি দিয়েছিলো, তার কথাও বলতে হয়েছে ডাক্তার রডারিখকে। কেননা, কাল সন্ধেবেলায় যে-সব বেয়াড়া ব্যাপার ঘটেছে, তার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তবে তার ওপরেই যে সব সন্দেহ এসে বর্তায়, এটা এর পর আর এড়িয়ে-যাওয়া যায়নি।

আর আপনারা আমাকে এর একটি কথাও ঘুণাক্ষরেও জানাননি। মার্ক বেশ তেতেই উঠেছে। শুধু আজ আমাকে কথাটা বলছেন, যখন কি না মাইরার জীবন বিপন্ন, তাকে শাসিয়ে গেছে পাজি লোকটা!... বেশ, এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, আমি তাকে দেখে নেবো–তাকে ছুঁড়ে বার করবো আমি, তারপর–

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাপ্তেন হারালান বলেছে, তার ভার তুমি আমাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারো, মার্ক। সে গিয়ে তো আমাদের বাড়িই কলুষিত করে এসেছে, আমাদেরই উচিত তার দূষিত–

মার্ক নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। কিন্তু সে অপমান করেছে আমারই বাগদত্তাকে?

রাগ বোধহয় দুজনকেই অন্ধ করে ফেলেছিলো। ঐ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আসলে রডারিখ পরিবারের ওপরই শোধ নিতে চেয়েছে, চেয়েছে তাদের ওপর নির্মম কোনো প্রতিশোধ

নেবে। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে এতটুকু না-হয় মানা গেলো। কিন্তু কালকের ঐ ঘটনায় যে তারই হাত আছে, সে-যে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপারটার সঙ্গে জড়ানো, সেটা প্রমাণ করা একেবারেই অসম্ভব। আমরা তো শুধু আর নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনো নালিশ করতে পারি না, বলতে পারি না : ওহে স্টোরিৎস, কাল সন্ধেবেলা তুমিও অতিথিদের ভিড়ের মধ্যে ছিলে। তুমিই ঘৃণাবিদ্বেষের স্তবটা গেয়ে আমাদের । সবাইকে অপমান করেছে। তুমিই ছিঁড়ে ফেলেছে ফুলের তোড়া আর বিয়ের কাগজ। তুমিই চুরি করে নিয়ে গেছে ঐ বিয়ের মুকুট! কেউই তাকে চোখে দ্যাখেনি, কেউ না!

তাছাড়া, আমরা কি গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসিনি যে সে তার বাড়িতেই ছিলো সে-রাতে? এটা ঠিক যে আমরা যখন ফটকের দরজাটা নিয়ে ঠেলাঠেলি করছি, সে তখন বড্ড বেশি সময় নিয়েছিলো, রডারিখ-ভবন থেকে চলে আসবার পক্ষে সে সময় যথেষ্টই ছিলো, কিন্তু কাপ্তেন হারালান বা আমি কেউই তাকে দেখতে পেলুম না।–অথচ সে দিব্বি আমাদের সামনে দিয়ে ফিরে এলো!

এর সব কথাই আমি তখন খুঁটিয়ে বলেছি তাদের, চেঁচিয়েও উঠেছি একবার, বলেছি, মার্ক আর হারালানের উচিত আমার কথা মন দিয়ে শোনা–ডাক্তার রডারিখ অবশ্য আমার যুক্তির সারবত্তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। আমার চোটপাট সত্ত্বেও মার্ক বা হারালান–কেউই তখন আমার কথা শুনতে চায়নি, তারা তক্ষুনি বুলভার তেকেলিতে সরাসরি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়ি চলে যেতে চেয়েছে।

তবে শেষটায়, অনেক তর্কাতর্কির পর, আমরা মোটামুটিভাবে–সম্ভবত একমাত্র–তথ্যযুক্তিওলা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছি। আমি তাদের বাৎলেছি :আমাদের বরং

টাউনহলে চলে-যাওয়া উচিত এখন। পুলিশের বড়োকর্তাকে সব খুঁটিনাটি জানিয়ে বুঝিয়ে বলা উচিত, এ-যাবৎ কী-কী ঘটেছে। রডারিখ পরিবারের সঙ্গে এই আলেমানটির কী সম্বন্ধ, সেটাও খোলশা করে জানানো উচিত, বলা উচিত মার্ক আর তার বাগদত্তাকে সে কীভাবে শাসিয়েছে। সে এমন-সব পদ্ধতি ব্যবহার করবে বলে হুমকি দিয়েছে যা নাকি সমস্ত মানুষী শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে-নিছকই গালভরা বুলি নিশ্চয়ই সে সব–তবু সে-যে এসব কথা বলে শাসিয়েছে, এটা পুলিশের জানা উচিত। এরপর পুলিশের বোকর্তাই ঠিক করবেন, তিনি এই আলেমানটি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেবেন কি না।

এই পরিস্থিতিতে, আমাদের পক্ষে এটাই কি সবচেয়ে ভালো কাজ হবে না? সাধারণ কোনো নাগরিকের চাইতে পুলিশ অনেক বেশি ক্ষমতা ধরে। কাপ্তেন হারালান আর মার্ক ভিদাল গিয়ে যদি তার বাড়ির ফটকে ঘা মারে, তবে সে-দরজা খোলা না-খোলা সম্পূর্ণ তার খামখেয়ালের ওপর নির্ভর করবে। সে-যদি দরজা না-খোলে, তবে কি জোর করে ঢুকে পড়বে ভেতরে? কোন অধিকারে? সেটা কি তাদের পক্ষে অনধিকার প্রবেশ হবে না? অথচ পুলিশ কিন্তু ইচ্ছে করলেই, পরোয়ানা নিয়ে গিয়ে, জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়বে। তাহলে কি আমাদের পক্ষে এখন মুশকিল আসানের জন্যে পুলিশের সাহায্য নেয়াই ঠিক হবে না?

শেষটায়, সবাই এ-কথা মেনে নেবার পর ঠিক হয়েছে, মার্কের এক্ষুনি রডারিখভবনে ফিরে-যাওয়া উচিত, আর ডাক্তার রডারিখ, কাপ্তেন হারালান আর আমি–আমরা তিনজনে যাবো টাউনহলে।

তখন সাড়ে-দশটা বেজে গিয়েছে। সারা রাগৎস ততক্ষণে আগের রাতের হট্টগোলের কথা জেনে গিয়েছে। ফলে লোকে যখন দেখেছে ডাক্তার তার ছেলেকে নিয়ে হন্তদন্তভাবে টাউনহলের দিকে চলেছেন, তখন তারা অনায়াসেই বুঝে গিয়েছে তার কী মৎলব।

আমরা যেতেই, ডাক্তার খোদ পুলিশের বড়কর্তার কাছে নিজের নাম পাঠিয়েছেন, আর অমনি, অবিলম্বে, তার ঘরে আমাদের ডাক পড়েছে।

মঁসিয় হেনরিখ স্টেপার্ক মানুষটি এমনিতে বেশ ছোটোখাটো হলে কী হবে, সারাক্ষণই তিনি যেন টগবগ করে ফুটছেন প্রাণচাঞ্চল্যে। মানুষটি বিশেষ কাণ্ডজ্ঞান ধরেন, সত্যিকার গোয়েন্দার সব গুণগুলোই তার আছে, এর আগে বেশ কয়েকটি জটিল রহস্য ভেদ করে তিনি তারই প্রমাণ দিয়েছেন। যদি এই প্রহেলিকার ওপর কেউ কোনো আলো ফেলতে পারে, তবে সন্দেহ নেই সেই মানুষটি হবেন মঁসিয় হেনরিখ স্টেপার্ক। তবে এই বিশেষ পরিস্থিতিটায় তিনি কি সত্যিকিছু করতে পারবেন? যা-কিছু কাল রাতে ঘটেছে, তা সত্যি-বলতে-মোটেই কোনো মানুষী কাজ বলে তো মনে হয় না। অন্যদের মতো তিনিও ঘটনাগুলো সম্বন্ধে ভাসা-ভাসাভাবে কিছু কথা শুনেছেন, তবে শুধু এখনই। তিনি আমাদের কাছে জানতে পেলেন সত্যি-সত্যি কী হয়েছে।

আমি ধরেই নিয়েছিলুম, ডাক্তার রডারিখ, যে আপনি এসে দেখা করবেন, আমাদের স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেছেন, সত্যি-বলতে, আমি তার ওপর ভরসা করে ছিলুম। আপনি যদি না-আসতেন তো আমাকেই শেষে আপনার কাছে যেতে হতো। আপনার বাড়িতে কী-সব তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে, তার কথা কাল রাতেই আমার কানে পৌঁছে

ছিলো, আপনার অতিথিরা যে শুধু ভড়কেই যাবেন না, বিষম ভয় পেয়েও যাবেন, সেটাও আশ্চর্য কিছু ছিলো না। কিন্তু যেটা আরো-ভয়ানক–সেই আতঙ্ক এখন গোটা রাগৎসেই ছড়িয়ে পড়েছে, খুব সহজে যে লোকের ভয় কেটে যাবে, তা আমার মনে। হয় না। গোড়াতেই শুধু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, ডাক্তার রডারিখ। কেউ কি সম্প্রতি আপনার ওপর বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে? এতটাই ক্ষুব্ধ যে মাদমোয়াজেল মাইরা রডারিখের সঙ্গে মঁসিয় মার্ক ভিদালের বিয়েটা ভেস্তে দিতে চাচ্ছে? ভাবছে যে এভাবে সব পণ্ড করে দিয়ে আপনার ওপর শোধ নেবে?

আমার তো তা-ই মনে হয়, ডাক্তার তাকে বলেছেন।

আর, সে-লোকটা কে?

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নামে একটা লোক।

কাপ্তেন হারালানই প্রচণ্ড ঘৃণাভরে নামটা বলেছিলো, শুনে যে পুলিশের বড়োকর্তা খুব-একটা যে অবাক হয়েছেন, এমনটা মোটেই মনে হয়নি আমার।

ডাক্তার রডারিখ তারপর সব খুঁটিনাটি জানিয়েছেন, ধারাবাহিকভাবে, তার বৃত্তান্ত থেকে এই কথাটা বাদ দেননি, ঠিক কোন কথা বলে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাকে শাসিয়েছিলো, বলেছিলো, বিয়েটা এমনভাবে ভণ্ডুল করে দেবে, মানুষ যার কথা। কোনোদিনও কল্পনাও করেনি।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, মঁসিয় স্টেপার্ক সায় দিয়েছেন, আর সে তার ঐ অমানুষিক শক্তির পরিচয় দেয় গোলাপের তোড়া ছিঁড়ে ফেলে, অথচ কেউ তাকে সে-কাজ করতে দ্যাখেনি –তা-ই তো!

আমরা সকলেই কথাটায় সায় দিয়েছি।

তবে আমাদের এই মতৈক্য মোটেই কিন্তু প্রহেলিকাটির ওপর কোনো আলোই ফেলতে পারেনি, যদি-না আমরা বলি যে সে এক পিশাচসিদ্ধ, শয়তানের চেলা। কিন্তু পুলিশ তো আর ভূতপ্রেতপিশাচ নিয়ে কাজ করে না, তাকে কাজ করতে হয় বাস্তবের সীমার মধ্যেই। পুলিশ তার প্রকাণ্ড হাতটা শুধু কারু রক্তমাংসের ঘাড়েই ফেলতে পারে। ভূতপ্রেতপিশাচকে গ্রেফতার করায় এখনও তারা সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। যে লোকটা বিয়ের কাগজ কুচি-কুচি করে ছিঁড়েছে, গোলাপের তোড়াটাকে পায়ের তলায় মাড়িয়েছে, যে বেমালুম বাটপাড়ি করেছে ঐ মুকুটটা, সে যদি মানুষ হয় তবেই তারা তাকে পাকড়াতে পারবে।

আমাদের সন্দেহ যে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে-বিষয়ে মঁসিয় স্টেপার্কের কোনো দ্বিমত ছিলো না।

এই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, তিনি বলেছেন, এ-লোকটার ওপর যে কবে থেকেই আমার নজর ছিলো, যদিও সরকারিভাবে কেউ কোনোদিনই তার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করেনি। ভারি ঢাক-ঢাক গুড়গুড় তার সব বিষয়ে, ভীষণ একাচোরা–কীভাবে থাকে, কী করে, কী তার জীবিকা–কেউই তা জানে না। কেন-যে সে স্প্রেমবার্গ ছেড়ে এসে এখানে জুটলো! সেটা তো তার জন্মভূমি। দক্ষিণ প্রশিয়ার লোক হয়েও কেন সে এসে

মাগিয়ারদের এই দেশে আস্তানা গেড়েছে? কেন কেবল একজন বুড়ো চাকরকে নিয়ে সে বুলভার তেকেলির ঐ হানাবাড়িটায় থাকে–যেখানে, কোনো মানুষ তো দূরের কথা, সম্ভবত কোনো কাকপক্ষীও ঢোকে না। তার সমস্তই ভারি সন্দেহজনক–খুবই সন্দেহজনক।

কাপ্তেন হারালান তখন আসল কথাটা পেড়েছে, আপনি এখন কী করবেন বলে ভাবছেন, মঁসিয় স্টেপার্ক?

স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে, খোদ পুলিশের বড়োকর্তার মুখ থেকে জবাব এসেছে, এক্ষুনি গিয়ে তার বাড়ি চড়াও হতে হবে, হয়তো খুঁজে দেখলে অনেক সাবুদ মিলবে

সেখানে, অনেক নথিপত্র–হয়তো কোনো ইঙ্গিত মিলবে

কিন্তু সেভাবে গিয়ে চড়াও হতে হলে, জিগেস করেছেন ডাক্তার রডারিখ, রাজ্যপালের মঞ্জুরি লাগবে না? কোনো পরোয়ানা?

ব্যাপারটা একজন বিদেশীকে নিয়ে, আর সেই বিদেশী আপনাকে ও আপনার পরিবারকে যা-নয়-তা-ই বলে শাসিয়ে এসেছে। রাজ্যপাল যে পরোয়ানাটা মঞ্জুর করবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

আমি তখন শুধু জানিয়েছি, কাল স্বয়ং রাজ্যপাল অকুস্থলে ছিলেন।

জানি, মঁসিয় ভিদাল, এবং তিনি নিজের চোখে কী দেখে এসেছেন, সে নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনা করেছেন।

তিনি কি তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন? জিগেস করেছেন ডাক্তার রডারিখ।

না, তিনি বলেছেন সাধারণ-বুদ্ধিতে তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু, আমি বলেছি, তিনি যখন শুনবেন যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এই ব্যাপারটায় জড়িয়ে আছে–

তা বরং ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে তাকে আরো উগ্রীব করে তুলবে। বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক, আপনারা বরং অনুগ্রহ করে এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি সোজা রাজভবন চলে যাবো–আধঘণ্টার মধ্যেই বুলভার তেকেলির হানাবাড়িটা খানাতল্লাশ করবার পরোয়ানা নিয়ে এসে হাজির হবো। বাড়িটা আমরা একেবারে তছনছ করে খুঁজে দেখবো, ডাক্তার রডারিখ।

আমরাও তাহলে আপনার সঙ্গে যাবো, প্রস্তাব করেছে কাপ্তেন হারালান।

যদি তাতে আপনার তৃপ্তি হয়, কাপ্তেন হারালান। আপনিও না-হয় চলুন আমাদের সঙ্গে, মঁসিয় ভিদাল, পুলিশের বড়কর্তা আমাকেও আহ্বান করেছেন।

মঁসিয় স্টেপার্কের দলবলের সঙ্গে তোমরাই না-হয় যেয়ো, কাপ্তেন হারালানকে বলেছেন ডাক্তার রডারিখ, আমি বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি। খানাতল্লাশ শেষ হয়ে যাবামাত্র তোমরাও বাড়ি ফিরে এসো।

কেউ গ্রেফতার হলে পর, তবেই, মনে হলো এই অরুচিকর ব্যাপারটার ইতি টেনে দেবার জন্যে মঁসিয় স্টেপার্ক রীতিমতো প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন।

তক্ষুনি তিনি রাজভবনের দিকে বেরিয়ে গেলেন, ডাক্তার রডারিখও তারই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন, বাড়ি ফিরবেন বলে।

কাপ্তেন হারালান আর আমি পুলিশের দফতরেই বসে-বসে মঁসিয় হেনরিখ স্টেপার্কের ফিরে-আসার প্রতীক্ষা করেছি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আর বিশেষ কোনো কথা হয়নি। তাহলে অবশেষে ঐ হানাবাড়িটায় ঢুকবো আমরা?... বাড়ির মালিককে কি তখন বাড়িতেই পাওয়া যাবে? তাকে দেখে কাপ্তেন হারালান নিজেকে সামলে রাখতে পারবে তো?

আধ ঘণ্টা পরেই মঁসিয় স্টেপার্ক পরোয়ানাটা নিয়ে এসে পৌঁছেছেন–তাতে অবস্থা বুঝে যে-কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করবারই মঞ্জুরি দেয়া হয়েছে তাকে। পরোয়ানাটা দেখিয়ে তিনি বলেছেন, আপনারা বরং আগেই চলে যান। আমি একদিক দিয়ে যাবো, আমার সেপাইশান্ত্রী অন্যদিক দিয়ে যাবে। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই আমরা ঐ বাড়িটায় পৌঁছে যাবো। ঠিক!

ঠিক, উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলেছে কাপ্তেন হারালান। আমিও তার সঙ্গে-সঙ্গে তক্ষুনি টাউনহল থেকে বেরিয়ে বুলভার তেকেলির দিকে পা বাড়িয়েছি।

.

নবম পরিচ্ছেদ

মঁসিয় স্টেপার্ক যে-রাস্তাটা ধরে গিয়েছিলেন, সেটা তাঁকে শহরের উত্তরভাগ দিয়ে নিয়ে যাবে, আর তার পুলিশবাহিনী, জোড়ায়-জোড়ায়, যাচ্ছিলো শহরের মাঝখানটা দিয়ে। আমি কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে দানিউবের তীর ঘেঁসেই চলেছি।

আকাশ সেই থেকে মেঘে ভরে আছে। মস্ত-সব ধূসর মেঘের পাঁজা পরস্পরকে তাড়া করে আসছে পুর থেকে, আর জোরালো টাটকা হাওয়ায় দানিউবের হলদে জলের মধ্যে ঢেউ কেটে-কেটে চলেছে নৌকোগুলো। জোড়ায়-জোড়ায় সারস আর গাংচিল সোজা চলে যাচ্ছে হাওয়ার দিকেই, আর তীক্ষ্ণ চেরা সুরে থেকে-থেকে ডুকরে উঠছে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে না বটে, কিন্তু ওপরের মেঘের রাশি অনবরত ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো যে-কোনো সময় তুলকালাম বাদল শুরু হয়ে যাবে।

শহরের হাট-বাজারগুলো ছাড়া–সেগুলোতে অবিশ্যি চাষীদের সঙ্গে-সঙ্গে শহরবাসীও ভিড় জমিয়েছে-রাস্তায় এমনিতে পথচারী খুব-একটা নেই। তবে স্বয়ং পুলিশের বড়োকর্তা তার বাহিনী নিয়ে যদি আমাদের সঙ্গে আসতেন, তবে দেখতে-না দেখতে চারপাশে ভিড় জমে যেতো, সেদিক থেকে টাউনহল থেকে বেরিয়ে আমরা যে আলাদা-আলাদা পথে চলেছি, সেটা ভালোই হয়েছে।

কাপ্তেন হারালান আবারও মুখে কুলুপ এঁটে আছে। এখনও তার মেজাজটা যে রকম তিরিক্ষি আর তেরিয়া হয়ে আছে, তাতে ভিলহেল্ম স্টোরিসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে-

না একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে বসে। শুধু সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছিলো, মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের তার সঙ্গে আসতে দিয়ে বোধহয় ভালো করেননি।

ডাক্তার রডারিখের বাড়ি রাস্তার যে-মোড়টায়, সেখানে পৌঁছুতে আমাদের মিনিট পনেরোর বেশি লাগেনি। একতলার কোনো জানলাই ভোলা নেই, মাদাম রডারিখ আর তার কন্যা যে-ঘর দুটোয় থাকেন তাদেরও জানলার খড়খড়ি নামানো। আগের রাতের উৎসবের মেজাজের সঙ্গে কী তফাৎ আজকের দিনটার! কাপ্তেন হারালান বুঝি নিজের অজান্তেই একবার থমকে গিয়ে ঐ বন্ধ খড়খড়িগুলোর দিকে তাকিয়েছে। তার বুক চিরেই বুঝি বেরিয়ে এসেছে একটি দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু একটাও কথা বলেনি। মোড়টা ঘুরে, আমরা বুলভার তেকেলির পথ ধরেছি তারপর, সোজা গিয়ে নেমেছি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর বাড়িটার সামনে।

খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ফটকের সামনে একটা লোক পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, হাত দুটো পকেটে গোঁজা। কাছে গিয়ে দেখি, মঁসিয় স্টেপার্ক। আগেকার কথা অনুযায়ী আমি আর কাপ্তেন হারালান গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছি। প্রায় তক্ষুনি, উর্দি না-পরা একদল পুলিশম্যান এসে হাজির হয়েছে। মঁসিয় স্টেপার্কের ইঙ্গিতে তারা রেলিঙের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর। তাদের সঙ্গে এক কামারও এসে হাজির হয়েছে–যদি দরকার হয় তবে তালা ভেঙেই ভেতরে ঢুকতে হবে। যথারীতি জানলাগুলো বন্ধ, মিনারের জানলায় খড়খড়িগুলো নামানো।

ভেতরে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আমি মঁসিয় স্টেপার্ককে বলেছি।

সেটাই আমরা এক্ষুনি জেনে নিতে চলেছি, তিনি উত্তর দিয়েছেন। তবে বাড়িটা একেবারে ফাঁকা দেখলে আমি একটু অবাকই হবো। ঐ-তো, দেখুন-না, বাঁদিকের ঐ চিমনিটাকে, চোঙ থেকে তো ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

আর সত্যিই, ছাতের ওপর হালকা, সূক্ষ্ম ধোঁয়ার কুণ্ডলি।

প্রভু যদি বাড়ি নাও থাকে, মঁসিয় স্টেপার্ক জুড়ে দিয়েছেন, ভৃত্যটি নিশ্চয়ই বাড়ি আছে। আমাদের ভেতরে ঢুকতে দেবার জন্যে তাতে অবশ্য কিছুই এসে-যায় না, প্রভু ভৃত্যের যে-কোনো-একজন বাড়ি থাকলেই হলো।

আমি অবশ্য কাপ্তেন হারালানের ভাবগতিক দেখে ভেবেছি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস বাড়ি না-থাকলেই ভালো, আরো-ভালো হয় সে যদি রাগৎস ছেড়ে অন্য-কোথাও চলে গিয়ে থাকে।

মঁসিয় স্টেপার্ক এদিকে প্রায় বজ্রনিনাদে কড়া নেড়ে চলেছেন। তারপর একটু থেমে দাঁড়িয়ে আমরা অপেক্ষা করেছি ভেতর থেকে কেউ এসে যদি ফটকটা খুলে দেয়। মিনিটখানেক কেটে গেলো। কারু কোনো পাত্তা নেই। আবার ফটকের কড়ার বজ্রনিনাদ।

বাড়ির লোকগুলো নিশ্চয়ই কালা, মঁসিয় স্টেপার্ক ফোড়ন কেটেছেন, কানে শোনে না। তারপর, কামারের দিকে ফিরে বলেছেন, দ্যাখো, তুমি কী করতে পারো।

পুলিশের হয়ে কাজ না-করলে এ-কামার নিশ্চয়ই ওস্তাদ চোর হতে পারতো। সে তার ঝোলা থেকে ছুঁচলো একটা ফলা বার করেছে, সেটা তালার ফোকরে ঢুকিয়ে দু-বার ঘোরাবামাত্র অত-বড়ো লোহার দরজাটা খুলে গিয়েছে।

আমাকে আর কাপ্তেন হারালানকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের বড়োকর্তা তারপর উঠোনে পা রেখেছেন। সঙ্গে আরো-চারজন পুলিশও চলেছে, শুধু দুজন রয়েছে বাইরে, পাহারায়।

তিন পৈঠার এক সিঁড়ি আমাদের নিয়ে গেছে বাড়ির দরজায়–বাইরের ফটকটার মতো সেটাও বন্ধ।

মঁসিয় স্টেপার্ক তার হাতের ছড়িটা দিয়ে তিনবার ঠকঠক করেছেন দরজায়।

কোনো সাড়া নেই। ভেতরেও কারু-কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওস্তাদ কামার ফের তার ঝোলা থেকে এক সবখোল চাবি বার করে তালায় ঢুকিয়েছে। কে জানে এই তালা হয়তো দু-তিন পাক দিয়ে আটকানো, ভেতর থেকে হুড়কোও আটকানো থাকতে পারে। হয়তো বাইরে পুলিশবাহিনী মোতায়েন আছে দেখে তারা যাতে ভেতরে না-ঢোকে, সেইজন্যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ভেতর থেকে খিল তুলে দিয়েছে। কিন্তু না, সে-রকম কিছুই নয়। চাবি ঘুরেছে তালায়, দরজাও তক্ষুনি খুলে গিয়েছে।

চলুন, ভেতরে যাই, বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক।

দরজার ওপরেই স্কাইলাইট, তার মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে পড়েছে করিডরে, ঢাকাবারান্দায়, আর করিডরের ঠিক শেষ প্রান্তে দ্বিতীয়-একটা দরজা খুলে গেছে পেছনের বাগানে, তার ওপরে কাঁচের পাল্লা দেয়া একটা জানলা-সেদিক থেকেও আলো এসে পড়েছে এই ঢাকাবারান্দায়।

পুলিশের বড়োকর্তা কয়েক পা এগিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েছেন:কেউ কি ভেতরে আছো?

কোনো সাড়াই নেই, যদিও মঁসিয় স্টেপার্ক গলাটা আরো চড়িয়ে প্রশ্নটা করেছেন বাড়ির মধ্য থেকে কোনো আওয়াজই আসছে না। তবে, উৎকর্ণ হয়ে, প্রায় সর্বাঙ্গনে শ্রবণেন্দ্রিয়ে রূপান্তরিত করে, অবশেষে আমাদের মনে হয়েছে পাশের কোনো-একটা ঘরে কি-রকম একটা কিছু যেন ঘসটে নিয়ে-যাওয়ার আওয়াজ হচ্ছে... কিন্তু সেটা ও ঘোর বিভ্রম বৈ আর-কিছু নয়, সে-সন্দেহটা উঁকি মেরেছে মনের মধ্যে।

মঁসিয় স্টেপার্ক সোজা এগিয়ে গেছেন করিডর ধরে, আমি গেছি তার পেছন পেছন, আর কাপ্তেন হারালান আমায় অনুসরণ করেছে। সেপাইদের একজন দাঁড়িয়ে থেকেছে সিঁড়ির কাছে, পাহারায়।

দরজাটা খুলে দিতেই, পুরো বাগানটাকেই দেখতে পেয়েছি আমরা। দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাঝখানটায় একটা লন, আগে হয়তো কেয়ারি-করা ছিলো, কিন্তু অনেকদিন নিশ্চয়ই কোনো কাস্তে বা কাঁচির ব্যবহার হয়নি এখানে, ঘাসগুলো লম্বা, তবে কেমন। যেন শুকিয়ে-যাওয়া, মরা। তার পাশ দিয়েই ঘুরে-ঘুরে গেছে পথ, দু-ধারে ঘন ঝোঁপঝাড়ের আঁচল। তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে ঢ্যাঙা সব গাছ, তাদের পোঁতা হয়েছিলো দেয়ালের ধার

ঘেঁসেই, তাদের ঝাকড়া ডালপালা ঠিক পাশের দুর্গপ্রাচীরের ছাঁচ অব্দি উঠে গিয়ে শাসন করছে যেন এখন।

সবকিছু থেকেই চূড়ান্ত অবহেলার লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে।

তন্নতন্ন করে, তারপর, খোঁজা হয়েছে বাগানটা। সেপাইরা কাউকেই দেখতে পায়নি সেখানে, যদিও পথের ওপর দেখা গেছে সাম্প্রতিক যাতায়াতের পদচিহ্ন।

এদিকটায় জানলাগুলো বাইরে থেকে খড়খড়ি তুলে বন্ধ করে দেয়া–শুধু একতলার শেষ জানলাটা বাদে–সেখান থেকে গিয়েই আলো পড়ে সিঁড়ির পইঠা আলো করে দিয়েছে।

লোকজন যে একটু আগেও এ-পথ দিয়ে এসেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহই নেই, মন্তব্য করেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক, কারণ দরজাটায় শুধু তালাই লাগানো–হুঁড়কোটা অব্দি তুলে দেয়া হয়নি।... লোকগুলো যদি আগে থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে পালিয়ে না যেতো

আপনার কি মনে হয় যে তারা আগে থেকেই জানতে পেরেছে? আমি বলেছি, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার বরং মনে হচ্ছে তারা হয়তো এক্ষুনি যে-কোনো সময় এসে হাজির হবে।

মঁসিয় স্টেপার্ক অবিশ্যি তাতে সন্দেহভরে মাথা নেড়েছেন।

তবে, আমি আরো জুড়ে দিয়েছি, ঐ-যে একটা চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে ভেতরে কোথাও আগুন জ্বলছে।

কোথায় আছে আগুন, দ্যাখো! অমনি পুলিশের বড়োকর্তার সতর্জন গর্জন কানে এসেছে!

বাগানে যে কেউ কোথাও নেই, এটা পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়েই মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের ভেতরে চলে যেতে বলেছেন, তারপর বাগানের দরজাটা ফের বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

করিডরটা গেছে চার-চারটে ঘরের পাশ দিয়ে। তাদেরই একটায়, বাগানের পাশেই, কেউ যেন কিছু-একটা রান্না করছিলো। আরেকটা ঘর থেকে গিয়ে পড়া যায় দোতলার সিঁড়িতে, সিঁড়িটা তারপর সোজা চিলেকোঠার দিকে চলে গিয়েছে।

থানাতল্লাশি পুরোদমে শুরু হয়েছে ঐ রসুইঘর থেকেই। সেপাইদের একজন জানলার পাল্লা খুলে খড়খড়ি তুলে দিয়েছে, তাতে অবশ্য অল্পই আলো এসে পড়েছে। রান্নাঘরে।

রান্নাঘর, তবে সে নামেই। থাকার মধ্যে আছে লোহার এক চুল্লি, তার চিমনিটা উধাও হয়েছে দেয়াল-থেকে-বেরিয়ে আসা এক ছাঁচের তলায়; তার দুপাশে দুটো দেরাজ; ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল; দুটো বেতের চেয়ার আর দুটো জলচৌকি; দেয়াল থেকে ঝুলছে গোটা কতক হাতাখুন্তি; এককোণায় একটা পিতামহ ঘড়ি যেটা সারাক্ষণ টিকটিক করে বেজেই চলেছে, আর সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তাতে কাল সন্ধেবেলাতেই চাবি ঘুরিয়ে দম দেয়া হয়েছে।

চুল্লিটার মধ্যে তখনও জ্বলছে কতগুলো কয়লা; তারই ধোঁয়া আমরা দেখেছি বাইরে থেকে।

রান্নাঘর তো দেখলুম, আমি বলেছি, কিন্তু রাঁধুনি যে না-পাত্তা!

এবং তার প্রভু-সে-ই বা কোথায়? জিগেস করেছে কাপ্তেন হারালান।

আমি অত সহজে ছাড়ছি না, সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবো,জানিয়েছেন মঁসিয়। স্টেপার্ক।

একতলার অন্য-দুটো ঘরও পর-পর দেখা হয়েছে। একটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা, পুরোনো ভারি আশবাবপত্রে ভরা, শৈলীগুলো টিউটানিক। শিকবসানো ফায়ার-প্লেসের ওপর, ম্যান্টলপীসের ওপর, নানারকম কারুকাজ-করা একটা ঘড়ি-রুচির তাতে কোনো চিহ্নই নেই; তার নিশ্চল কাটাগুলো আর ওপরকার জমে-থাকা পুরুধুলোর আস্তর দেখে। বোঝা গেছে অনেকদিন হলো সে-ঘড়ি আর চলছে না। জানলার মুখোমুখি দেয়ালটায় ডিম্বাকার একটা ফ্রেমে-পোরা একটা পোর্ট্রেট : তলায় গথিক হরফে নাম লেখা : অটো স্টোরিৎস।

ছবিটার দিকে আমরা অসীম কৌতূহলভরে তাকিয়েছি, তুলির টানে একটা বেপরোয়া স্পর্ধার ভাব, কিন্তু রঙের ব্যবহার বড্ড স্কুল যেন, কোনো অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা–তার নাম দস্তখৎ করা আছে তলায়, অর্থাৎ যথার্থ একটা শিল্পকর্ম। কাপ্তেন হারালান তো ক্যানভাসটার ওপর থেকে যেন চোখ সরাতে পারছিলো না। আর আমি? অটো স্টোরিৎস-এর মুখটা আমায় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো। সে কি আমার মনের এমন অস্থির দশার জন্যে?... না কি, আমি, নিজের অজান্তেই, হানাবাড়িটার পরিবেশের শিকার হয়ে পড়েছি? এ-দুয়ের যা-ই হোক না কেন, এই ফাঁকা ঘরে, এখানটায় অটো স্টোরিৎসকে কোনো কিংবদন্তির জীবের মতোই দেখাচ্ছিলো। সেই বিশাল মাথা, সেই

উশকোখুশকো আলুথালু কঁকড়া চুল, ঐ উন্নত ললাট, ঐ জ্বলন্ত দুই চক্ষু, ঐ মুখটা–তার ঠোঁট দুটো যেন জ্যান্ত–যেন কেঁপে উঠছে আধো আলোছায়ায়–আমার মনে হয়েছে এই প্রতিকৃতিটা যেন সজীব, যেন সেটা এক্ষুনি লাফিয়ে নেমে আসবে তার। ডিম্বাকার কাঠামো থেকে, যেন কোনো অপার্থিব ভুতুড়ে গলায় এক্ষুনি চীৎকার করে উঠবে : কে তোমরা? এখানে তোমাদের কে ঢুকতে দিয়েছে? কেন তোমরা দুম করে এসে আমার শান্তি ভঙ্গ করছো?

জানলার ভিনিসীয় খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প আলো এসে পড়েছিলো ঘরে, তাই জানলার পাল্লা খোলবার কোনো দরকার হয়নি, আর সেই জন্যেই ঐ ছায়ার জাফরির মধ্যে প্রতিকৃতিটাকে সম্ভবত আরো-কিম্ভুত আরো-দুর্দান্ত দেখাচ্ছিলো।

অটো আর ভিলহেল্ম স্টোরিসের চেহারার সাদৃশ্য দেখে মঁসিয় স্টেপার্ক বুঝি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বয়েসের তফাৎ যদি না-থাকতো, তিনি আমায় বলেছেন, তবে আমি ভাবতুম এ বুঝি পিতৃদেবতার নয়, পুত্রদেবতারই ছবি। দুজনেরই চোখগুলো একরকম, কপালটাও তা-ই, মস্ত ধড়ের ওপর তেমনি মস্ত মাথা বসানো... আর ঐ পিশাচের মতো চাউনি, ঐ অভিব্যক্তি! ওঝা ডেকে দুজনকেই ঝাড়িয়ে নিতে পারলেই বোধকরি ভালো হতো।

হ্যাঁ, আমিও সায় দিয়েছি, সাদৃশ্যটা, সত্যি, চমকপ্রদই!

কাপ্তেন হারালানকে কেউ যেন পেরেক ঠুকে ঐ ক্যানভাসের সামনেই আটকে দিয়েছে! যেন কোনো প্রতিকৃতি নয়, আসল মানুষটিই আছে তার সামনে।

কী কাপ্তেন, যাবেন না? আমি তার ঘোরটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি।

করিডর দিয়ে তারপর আমরা গেছি পাশের ঘরটায়। এটা হচ্ছে কাজের জায়গা, ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ, কর্মশালা–কিন্তু সবকিছুই যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। শাদা কাঠের তাক, পর-পর, তাতে সারি-সারি বইপুথি–বেশির ভাগই বাঁধানো নয়, আর বেশির ভাগ বইই গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে। কোণায় কতগুলো যন্ত্রপাতি, নানা আকারের নানা ধরনের, একটা ভোলা-উনুন–এদিক-ওদিক সরানো যায়, কতগুলো বকযন্ত্র, পাতনযন্ত্র আর নানা ধরনের ধাতুর নমুনা–যার কয়েকটাকে নিজে এনজিনিয়ার। হওয়া সত্ত্বেও আমি চিনতেই পারিনি। ঘরের মাঝখানে, একটা টেবিল-কাগজ ঠাশা, আরো-সব লেখালিখির জিনিশ, অটো স্টোরিৎস-এর রচনাসমগ্র-রতিনটে বা চারটে খণ্ড। তাদের পাশে একটা পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে দেখি, সেই বিখ্যাত নামটাই দস্তখৎ-করা : আলোকবিদ্যা বিষয়ক একটি প্রস্তাব। কাগজপত্র, পুথির পর পুথি, পাণ্ডুলিপি–সব পর-পর মোহর-করা, বেঁধে-রাখা।

এ-ঘরেও খোঁজাখুঁজি করে কোনো লাভ হয়নি। আমরা যখন ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ ম্যান্টলপীসের ওপর কিম্ভুতকিমাকার দেখতে নীলচে একটা শিশির ওপর মঁসিয় পোর্কের নজর পড়েছে।

সে কি তার কৌতূহল চরিতার্থ করতেই, না কি তার রহস্যভেদী গোয়েন্দাবুদ্ধির তাগিদে, তিনি শিশিটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবেন বলে সেটা ধরতে হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু হয়তো অসাবধান হয়ে থাকবেন, ঠিক মতো খেয়াল করেননি–শিশিটা ছিলো

ম্যান্টলপীসের একেবারে ধার ঘেঁসে, যেই তিনি ধরতে যাবেন, অমনি ঠেলা লেগে হাত ফসকে শিশিটা মেঝেয় পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে গেলো।

তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো হলদে রঙের সরু সুতোর মতো তরল কী-যেন, দারুণ দাহ্য-কিছু নিশ্চয়ই, অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়িয়ে তক্ষুনি সেটা বাষ্প হয়ে একেবারেই। উবে গেলো। ভারি ক্ষীণ হালকা ছিলো গন্ধটা, কিন্তু আমার জানা কোনো রাসায়নিকের গন্ধের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

হুম! বলে উঠেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক, একেবারে সময় বুঝে নিচে গিয়ে পড়েছে। শিশিটা–

তাতে আর সন্দেহ কী? আমি বলেছি, নিশ্চয়ই অটো স্টোরিৎস-এর উদ্ভাবিত কিছু ছিলো শিশিটায়।

ছেলের কাছে নিশ্চয়ই ফর্মুলাটা থাকবে, মঁসিয় স্টেপার্ক বলেছেন, ঐ সূত্র ধরেই সে জিনিশটা যত-ইচ্ছে বানিয়ে নিতে পারবে। তারপর, দরজার দিকে ফিরে, বলেছেন, এবার তাহলে দোতলায় যাওয়া যাক। সেপাইদের একজনকে তিনি নিচে করিডরে পাহারায় থাকতেই নির্দেশ দিয়েছেন।

এখানে, রান্নাঘরের মুখোমুখি যে-দরজাটা, সেটা খুলে গেছে দোতলার সিঁড়িতে, দু-পাশে কাঠের রেলিঙ, আমাদের পায়ের তলায় পইঠাগুলো মচমচ করে উঠে যেন আপত্তিই জানিয়েছে।

ল্যাণ্ডিঙে, পাশাপাশি দুটো ঘর। তাদের দরজাগুলো ভেজানো ছিলো, কিন্তু তালা লাগানো ছিলো না, হাতল ঘোরাতেই খুলে গেছে।

প্রথম ঘরটা নিশ্চয়ই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর শোবার ঘর। থাকার মধ্যে আছে একটা লোহারখাট, শিয়রের কাছে একটা টেবিল, ওক কাঠে তৈরি বিছানার চাদর ইত্যাদি রাখার একটা দেরাজ, তামার পায়ার ওপর দাঁড়-করানো প্রসাধন টেবিল, একটা সোফা, পুরু মখমলের গদি আঁটা একটা আরামকেদারা, আর দুটো চেয়ার; বিছানার ওপর না আছে কোনো চাদোয়া, না-বা মশারি; জানলাতে কোনো পর্দা নেই; আশবাব যা আছে তা নেহাৎই কেজো, যা না-হলে চলে না। কোনো নথিপত্র নেই, না ম্যান্টলপীসের ওপর, না কোণার গোল টেবিলটার ওপর। বিছানাটা এলোমেলো হয়ে আছে, সম্ভবত রাতে এই বিছানায় কেউ শুয়েছিলো। প্রসাধন টেবিলটার কাছে গিয়ে মঁসিয় স্টেপার্ক আবিষ্কার করেছেন সেখানে একটা গামলায় জল আছে, তার ওপর সাবানের ফেনা ভাসছে।

যদি, আমাদের তিনি বুঝিয়ে বলেছেন, ঐ জল ব্যবহার করা হবার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে যেতো, তবে এতক্ষণে সাবানের ঐ বুড়বুড়িগুলো মিলিয়ে যেতো। তা যখন হয়নি, তখন তা থেকে অনুমান করতে পারি আমাদের শ্রীমান সকালবেলায় এখানেই মুখ ধুয়েছেন–বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেই–

তাতে কি মনে হয় না যে সে আবার এখানেই ফিরে আসবে? আমি বলেছি, যদি-অবশ্য আপনার সেপাইদের সে এখানে মোতায়েন না-দ্যাখে।

সে যদি আমার সেপাইদের দেখে ফ্যালে, তবে আমার সেপাইরাও তাকে দেখে ফেলবে। তাদের ওপর হুকুম দেয়াই আছে, তাকে দেখতে পেলেই যেন ধরে নিয়ে আসে। তবে আমার মনে হয় না, সে আমাদের কাছে ধরা দেবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা একটা ক্যাচকেঁচে আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, যেন কেউ এইমাত্র কোনো নড়বড়ে কাঠের মেঝেয় পা রেখেছে। আওয়াজটা যেন এসেছে পাশের ঘর থেকে, ঐ ওয়ার্কশপের ঠিক ওপরেই যে-ঘরটা।

এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার একটা দরজা আছে। অর্থাৎ, ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ল্যাণ্ডিং দিয়ে ঘুরে যেতে হবে না।

মঁসিয় স্টেপার্কের আগেই কাপ্তেন হারালান একলাফে ঐ দরজার কাছে গিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ততক্ষণে দরজার কবাটটা খুলে ফেলেছে।

কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি সবাই। ঘরটায় কেউ নেই।

এটাও সম্ভব যে আওয়াজটা হয়তো ওপরের চিলেকোঠা থেকেই এসেছে–যেখান। থেকে সরাসরি মিনারটায় যাওয়া যায়।

এই দ্বিতীয় ঘরটা আগের ঘরটার চাইতেও যেন শাদাসিধে, বাহুল্যবর্জিত। একটা কাঠামোর ওপর একটা শক্ত ক্যানভাস চাপানো, একটা জাজিম-বহু ব্যবহারে চেপটে গিয়েছে, কিছু পুরু কম্বল, একটা পশমিনা চাদর, একটা জলের কুঁজো, একটা ফায়ারপ্লেস–যাতে কোনো ছাই বা ভস্মাবশেষ নেই–তার ওপরকার ম্যান্টলপীসের ওপর

একটা বেলেপাথরের গামলা, আর ওক কাঠের একটা দেরাজ- যার ভেতর রাশি-রাশি বিছানার। চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি। এ-ঘরটা নিশ্চয়ই সেই পুরাতন ভৃত্য হেরমানেরই। আগের ঘরটার জানলা যদি-বা ঘরে যাতে হাওয়া আসে, সেজন্যে একটু খোলা ছিলো, এ-ঘরের জানলা কিন্তু ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। নিকট-অতীতে কোনোদিনই যে সে জানলা খোলা হয়েছে, তা মনে হলো না। ছিটাকিনিটা জংধরা, আড় হয়ে আছে। লোহার-ফ্রেমে-আঁটা খড়খড়িটা শুদু নাড়ানো গেলো না।

কিন্তু মোদ্দা কথা এটাই যে, ঘরটা ফাঁকা। যদি চিলেকোঠা, মিনার, রান্নাঘরের নিচে মাটির তলার ভাড়ার–সব এ-রকমই শূন্য পড়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে প্রভু-ভৃত্য দুজনেই বাড়িটা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে–আর-কখনও ফিরে আসবে কিনা, তা-ই বা কে জানে!

আপনার কি মনে হয়, আমি সিয় স্টোপার্ককে জিগেস করেছি, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস কোনোভাবে আগেভাগেই এই তদন্তের কথা জেনে গিয়েছিলো?

না, মঁসিয় ভিদাল, যদি-না সে টাউনহলে আমার ঘরে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে থাকে, অথবা রাজভবনে আমি যখন রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলছি, তখন সেখানে যদি লুকিয়ে না-থাকে, তাহলে এ-কথা তার ঘুণাক্ষরেও জানবার কথা নয়।

আমরা বুলভার দিয়ে যখন আসছি, তখন নিশ্চয়ই তার চোখে পড়ে থাকবো।

হয়তো-কিন্তু আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা পালাবে কোন চুলোয়?

খিড়কির দুয়োর দিয়ে যদি খোলা মাঠটায় চলে যায়–

বাগানের ঐ দেয়াল টপকাবার সময় তারা পেতো কোথায়? দেয়ালটা তো খুবই উঁচু। তাছাড়া অন্যপাশটা দিয়ে তো কেল্লার প্রাচীর গিয়েছে সেটা তারা পেরুবে কী করে?

মঁসিয় স্টোপার্কের ধারণা : ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আর হেরমান নিশ্চয়ই আমরা বাড়ির ধারে-কাছে আসার অনেক আগেই চম্পট দিয়েছে।

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ল্যাণ্ডিঙের সিঁড়ি দিয়ে যেই ওপরে উঠতে যাবো, অমনি কানে এসেছে একতলার সিঁড়িতে কার দুপদাপ পায়ের শব্দ, যেন কেউ হুড়মুড় করে ছুটে যাচ্ছে। আর ঠিক তারই সঙ্গে কানে এসেছে কার পড়ে যাবার শব্দ, আর আর্তনাদ।

রেলিঙ থেকে ঝুঁকে দেখি, আমরা যে-সেপাইকে নিচে পাহারায় রেখে এসেছিলুম সে উঠে পড়ে তার পেছনটা ডলছে।

অমনি মঁসিয় স্টেপার্ক শুধিয়েছেন, কী হয়েছে, লুডভিগ?

লুডভিগ ইনিয়েবিনিয়ে যা বলেছে তার সারমর্ম এই : সে সিঁড়ির দ্বিতীয় পইঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলো, এমন সময় তার কানে এসেছে কে যেন দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে ছুটেছে। তাড়াতাড়িতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে যেই দেখতে যাবে কী ব্যাপার, সে নিশ্চয়ই আচমকাই বড্ড জোরে ঘুরেছিলো, কারণ তা দু-পাই সিঁড়ি দিয়ে হড়কে যায়, আর সে চিৎপাত হয়ে বেকায়দায় পড়ে যায়। কেমন করে যে পড়েছে সেটাই এক রহস্য। তার নিশ্চিত ধারণা, কেউ যেন তার পা ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়েছিলো–কিংবা এমন

জোরে ধাক্কা দিয়েছিলো যে সে টাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেছে। অথচ সেটাও কোনোমতেই সম্ভব নয়। কারণ সদর দরজার কাছে যে-সেপাইরা পাহারা দিচ্ছে, তারা ছাড়া এখানে কোনো জনমানব ছিলো না।

হুম! চিন্তার এই ছোট্ট আওয়াজটুকু ছাড়া মঁসিয় স্টেপার্কের মুখ থেকে আর কোনো আওয়াজ বেরোয়নি।

তার মিনিট খানেক বাদেই আমরা গিয়ে তেতলায় পৌঁছেছি।

সারা তেতলা জুড়ে, এ-মাথা থেকে ও-মাথা অব্দি, একটাই চিলেকোঠা, দুটো স্কাইলাইট থেকে আলো ঢুকছে সে-ঘরে, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই আমরা বুঝেছি, এখানেও কেউ এসে আশ্রয় নেয়নি। মাঝখানে একটা কাঠের সিঁড়ি, সেটা গেছে মিনারে, ছাতের ওপর। সিঁড়িটা যেখানে ছাত ছুঁয়েছে, সেখানে একটা ওপর-দরজা, পাল্লাটা ঠেললে ওপরদিকে উঠে যায়।

দরজাটা খোলা দেখছি, আমি মঁসিয় স্টেপার্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তিনি অবশ্য ততক্ষণে মইটার পইঠায় পা রেখেছেন।

হ্যাঁ, মঁসিয় ভিদাল, আর ওখান দিয়ে বেশ টাটকা হাওয়াও আসছে ঘরটায়। আমরা নিশ্চয়ই তারই আওয়াজ শুনে থাকবো। আজ বেশ জোর হাওয়া দিচ্ছে–ছাতের ওপর হাওয়ামোরগটা বেশ আওয়াজ করেই পাক খাচ্ছে।

কিন্তু, আমি একটু আপত্তিই জানিয়েছি, আওয়াজটা মনে হচ্ছিলো কারু যেন পায়ের শব্দ।

কিন্তু কে আর হাঁটবে, বলুন? বাড়িটায় তো কারু চুলের ডগাটিও দেখা গেলো ।

যদি সে ঐ ওপরে থাকে, মঁসিয় স্টেপার্ক?

ঐ পাখির বাসায়? আকাশে?

কাপ্তেন হারালান এতক্ষণ চুপচাপ আমাদের আলাপ শুনেছে। এবার সে মিনারটা দেখিয়ে চলেছে, চলুন, ওপরে যাই।

মঁসিয় স্টেপার্কই প্রথমে মইটা বেয়ে উঠেছেন, পাশে একটা মোটা দড়ি ঝুলছিলো, সেটা ধরে-ধরে। তারপর কাপ্তেন হারালান, সব শেষে আমি। আট ফিট x আট ফিট হবে আয়তন, সম্ভবত দশ ফিট উঁচু, আর বেশ অন্ধকার, যদিও ওপরে একটা কাঁচের পাল্লা আছে। আসলে ঘরটা যে আঁধার হয়ে আছে, তার কারণ ভারি-ভারি পশমের পর্দা ঝুলছে চারপাশে। সেগুলো টেনে সরাতেই পুরো জায়গাটা ফটফটে দিনের আলোয় ভেসে গেলো।

প্রথমেই বলা উচিত, এই মিনারটাও ফাঁকাই ছিলো–কেউ কোথাও ছিলো না। পরোয়ানা নিয়ে এসে মঁসিয় স্টেপার্কের এই ছোঁ-মেরে-পড়া একেবারেই নিষ্ফল হয়েছে–আমরা এখনও জানি না কাল রাতে ঐ রহস্যময় ব্যাপারগুলো কী ছিলো।

আমি ভেবেছিলুম, এই কাঁচের মিনার হয়তো তৈরি হয়েছে আকাশটাকে পড়বার জন্যে–হয়তো জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি থাকবে সেখানে। আমি ভুল ভেবেছিলুম। থাকার মধ্যে সেখানে ছিলো একটা টেবিল আর কাঠের চেয়ার।

টেবিলের ওপর পড়ে ছিলো কতগুলো কাগজ। তার মধ্যে বুড়াপেটে যে খবরকাগজ পড়েছিলুম, তারই একটা সংখ্যা–সেই-যাতে আসন্ন স্টোরিৎস-বার্ষিকীর কথা বেরিয়েছিলো। অন্য-সব কাগজপত্তরের সঙ্গে-সঙ্গে এ-সব কাগজও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করলে।

বোঝাই যাচ্ছে, তার ল্যাবরেটরি বা ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এখানেই এসে বিশ্রাম করে। খবরটা যে সে মন দিয়ে পড়েছে, তার প্রমাণস্বরূপ খবরটার পাশে লাল কালি দিয়ে একটা ট্যাড়া আঁকা।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রুদ্ধ বিস্ময়ের একটা চীৎকার সেই মিনারের পাখির বাসায় ফেটে পড়েছে।

কাপ্তেন হারালান দেয়ালের গায়ে একটা তাকে একটা ছোট্ট হালকা কাঠের বাক্স দেখে, সেটার ডালা শুধু খুলেছিলো...

আর বাক্সটা থেকে কী ওটা বার করে নিয়ে এসেছে সে?

সেই বিয়ের মুকুটটা! সেটা কাল রাত্তিরে ডাক্তার রডারিখের বাড়ি থেকে কেউ সকলের তাজ্জব চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে এসেছিলো।

দশম পরিচ্ছেদ

তাহলে এ-বিষয়ে আর-কোনো সন্দেহই নেই যে কাল সন্ধের ব্যাপারগুলোয় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর হাত আছে : এখন আর এটা নিছকই সন্দেহ বা অনুমানের স্তরে নেই। যাকে বলে বাস্তব সাবুদ, তা-ই এখন হাতে আছে আমাদের। চুরিটা যেই হাতে-নাতে করে থাক, এই কিম্ভুত মুকুটহরণের ব্যাপারটি যে তারই সুবিধের জন্যে ঘটানো হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা যদিও-অবশ্য এখনও জানি না সে-কোন আজব উপায়ে দৃশ্যমান না-হয়েও চুরিটা কে করেছে।

কাপ্তেন হারালানের গলা তখন রাগে কেঁপে উঠেছে। এখনও কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে, মঁসিয় ভিদাল?

মঁসিয় স্টেপার্ক কেমন যেন থম মেরে গিয়েছেন। এই আশ্চর্য প্রহেলিকাটির প্রায় বেশির ভাগ অংশই এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর অপরাধ যদিও এখন তর্কাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে, সে-যে কোন আজব পদ্ধতি মারফৎ কাজটা হাসিল করেছে, সেটা কারু জানা নেই, কেউ কোনোদিন জানতে পারবে কি না তাও জানা নেই।

কাপ্তেন হারালান যদিও তার ক্ষুব্ধ কুপিত প্রশ্নটা আমাকেই জিগেস করেছে, আমি তবু তাকে কোনো উত্তর দিইনি। কীই-বা বলতে পারতুম আমি?

সে কিন্তু তখনও রেগে-তিনটে হয়ে বলেই চলেছে :এই হতচ্ছাড়াই কি আমাদের মুখের ওপর ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব ছুঁড়ে দিয়ে আমাদের নিদারুণভাবে অপমান করে যায়নি–যে-গানটা মাগিয়ার স্বদেশপ্রেমের গালে প্রচণ্ড-একটা থাপ্পড় কষিয়েছে! যা, এটা ঠিক যে আপনারা তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাননি, তবে তার গলা যে নিজের কানেই শুনেছেন, সেটা তো আর অস্বীকার করতে পারবেন না। তাকে আমরা চোখে না-দেখলেও এই পাজির পাঝাড়াটা অকুস্থলেই ছিলো! আর যে-মুকুটটাকে তার স্পর্শ অমনভাবে কলুষিত করেছে, আমি চাই না তার কোনো অংশ অটুট থাকুক।

মুকুটটা সে প্রায় ভেঙে ফেলতেই যাচ্ছিলো, শুধু শেষ মুহূর্তে মঁসিয় স্টেপার্ক তাকে সামলেছেন। এটা ভুলে যাবেন না, কাপ্তেন হারালান, সাবুদ হিশেবে এটাকে দেখাতে হবে। আর তা জরুরিও হবে, কারণ আমার ধারণা ব্যাপারটা বিস্তর জল ঘোলা করে দেবে।

শুনে অবিশ্যি কাপ্তেন হারালান মুকুটটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে, তারপর আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছি। নিষ্ফলভাবে বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর আরো-একবার খুঁজে তল্লাশ করে আমরা তারপর বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসেছি।

সদর দরজা আর ফটক বন্ধ করে সীল করে দেয়া হলো, আর দুজন সেপাই রইলো পাহারায়।

মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় পইপই করে বলে দিয়েছেন আমরা যাতে এই তদন্তের কথাটা গোপন রাখি, ঘুণাক্ষরেও কাউকেই যেন এ-কথা

জানতে দিই না যে ঐ হানাবাড়িটায়গিয়ে আমরা সব তন্নতন্ন করে খুঁজে এসেছি, বিয়ের মুকুটটাকে পেয়েছি মিনারের পাখির বাসাটায়।

বুলভার দিয়ে আমি যখন কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে রডারিখ-ভবনের দিকে হেঁটে আসছি, সে কিন্তু তখনও নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি–তার প্রতিটি আচার-আচরণে ভাবেভঙ্গিতে পদক্ষেপে প্রচণ্ড রাগ ফুটে বেরুচ্ছিলো। মিথ্যেই আমি চেষ্টা করেছি তাকে শান্ত করতে। এটাও মনে-মনে আশা করেছি যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস হয়তো এখন শহর ছেড়ে কেটে পড়েছে–কিংবা নাও যদি গিয়ে থাকে, এখন যখন তার বাড়ি খানাতল্লাশ করে হাতে-নাতেই জানা গেছে যে সে এই ব্যাপারটার সঙ্গে লিপ্ত আর সাবুদটা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে নিজের হেফাজতে রেখেছে, তখন সে চম্পট দেবারই চেষ্টা করবে। আমি তাকে বলেছি,শোনো, হারালান, আমি তোমার এই রাগের কারণটা ভালোই বুঝতে পারি, এও বুঝতে পারি তুমি চাও এ-সব পেজোমির জন্যে সে উপযুক্ত সাজা পাক। কিন্তু এটাও ভুলে যেয়ো না যে মঁসিয় স্টেপার্ক পইপই করে বলে গিয়েছেন পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে।

আর বাবা? আর তোমার ভাই মার্ক? তারা কি এই তদন্তের ফল কী হলো, তা জানতে চাইবে না?

চাইবে, তবে আমরা তাদের শুধু এই কথাটাই বলবো যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এর সঙ্গে আমরা কিছুতেই দেখা করতে পারিনি-সম্ভবত সে রাস ছেড়েই কেটে পড়েছে। এটা ঠিক মিথ্যেও বলা হবে না।

মুকুটটা কোনখানে পাওয়া গেছে, সে-কথা আপনি তাদের জানাবেন না?

জানাবো, তাদের সেটা জানাও উচিত। তবে তোমার মাকে বা বোনকে এ-সম্বন্ধে কিছু বলার কোনো মানে হয় না। খামকা তাদের শঙ্কা বা উদ্বেগ বাড়িয়ে লাভ কী? আমি হলে শুধু বলতুম যে মুকুটটা তোমাদের বাগানেরই এককোণায় পাওয়া গেছে। বলে তোমার বোনকে মুকুটটা দিয়ে দিতুম।

এ-রকম মিথ্যের আশ্রয় নিতে কাপ্তেন হারালানের মন ওঠেনি বটে, তবে শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়েছে আমিই বোধহয় ঠিক বলেছি। সিয় স্টেপার্ক অবশ্য মুকুটটা হাতছাড়া করতে চাইবেন না, তবে ঠিক হলো, আমি গিয়ে তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে আসবার চেষ্টা করবো।

এ-সব কথা মুখে বলেছি বটে, তবে মার্ককে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা খুলে বলতে চাচ্ছিলুম আমি। আরো-বেশি-করে চাচ্ছিলুম, বিয়েটা এবার ভালোয়-ভালোয় উৎরে গেলেই হয়।

রডারিখভবনে পৌঁছুবামাত্র ভৃত্য এসে আমাদের পড়ার ঘরে নিয়ে গেছে–সেখানেই মার্ক ডাক্তার রডারিখের সঙ্গে বসে-বসে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলো। এতই তারা অধীর হয়ে উঠেছিলো যে আমরা চৌকাঠ পেরুবার আগেই তারা আমাদের প্রশ্নে-প্রশ্নে জর্জরিত করে ফেলেছে।

যখন আমরা সব খুলে বলেছি, বুলভার তেকেলির ঐ হানাবাড়িতে কী-কী দেখেছি বা হয়েছে, তখন দুজনেই ঘৃণায়-ক্রোধে-বিস্ময়ে একেবারে রি-রি করে উঠেছে! মার্ক তো

রীতিমতো মাথাগরম করে ফেলেছিলো। কাপ্তেন হারালানের মতো তারও মত, ও-সব ন্যায়বিচার-চিটার মাথায় থাক, এক্ষুনি গিয়ে বাছাধনকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে আসা যাক।

মিথ্যেই আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে তার এই পহেলা দুশমনটি নিশ্চয়ই রাগৎস ছেড়ে চলে গিয়েছে।

শুনেই, মার্ক বলে উঠেছে :রাগৎস-এ যদি না-থাকে, তবে নিশ্চয়ই মেবার্গে আছে। যাবে কোথায়!?

আমি তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না দেখে শেষে ডাক্তার রডারিখ আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। মার্ক, তোমার দাদা যা-বলছেন, সে-কথা তোমার শোনা। উচিত। যা হবার তা হয়েছে-এবার এই বিশ্রী ব্যাপারটা মন থেকে তাড়িয়ে দাও-ভুলে যাবার চেষ্টা করো। এ নিয়ে আর আলোচনা কোরো না, তবেই দেখবে ব্যাপারটা মন থেকে সরে গিয়েছে।

দু-হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে মার্ক যখন ক্রুদ্ধ ও হতাশ বসে থেকেছে, তখন তার দিকে আর তাকানো যাচ্ছিলো না। তার মনের মধ্যে কী-যে তোলাপড়া চলেছে, তার সবটা না-হোক, অনেকটাই আমি আন্দাজ করতে পারছিলুম।

ডাক্তার রডারিখ আরো জানিয়েছেন : তিনি নিজে রাজভবনে গিয়ে রাগৎস-এর বড়োলাটের সঙ্গে দেখা করবেন। হাজার হোক, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এখানে বিদেশী, রাজ্যপাল নিশ্চয়ই তাকে এখান থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে কোনো দ্বিধা করবেন

না। যে-বিষয়টায় আমাদের সতর্ক হয়ে লক্ষ রাখা উচিত, তা হলো, কাল যা-সব আজব অপকীর্তি ঘটে গিয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাক বা না-যাক, সে-রকম কোনো কেচ্ছাকেলেঙ্কারি যাতে আর না-ঘটে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে জাঁক দেখিয়ে হুমকি দিয়ে গেছে, তার তাঁবেদারিতে ভূতপ্রেতপিশাচ আছে, অতিপ্রাকৃত সব শক্তি, তাকে আর পাত্তা না-দেয়াই ঠিক হবে।

আবারও আমি জোর দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি কেন মাদাম রডারিখ ও মাইরাকে এ-বিষয়ে সব বিশদ করে বলে দেবার দরকার নেই। মুকুটটা সম্বন্ধে আমার পরামর্শটাকেই মেনে নেয়া হলো। মার্ক গিয়ে তাকে বলবে যে সেটাকে তারা শেষ অব্দি বাগানেই খুঁজে পেয়েছে। তাতে অন্তত মনে হবে যে এ কারু বদ রসিকতা বৈ আর কিছু নয়, তাকে খুঁজে বার করে উচিত সাজাই দেয়া হবে পরে।

সেদিনই আবারও একবার টাউনহলে যেতে হয়েছে আমায়। মঁসিয় স্টেপার্ককে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে মুকুটটা নিয়ে আমি রডারিখ-ভবনে ফিরে গেছি।

সেদিন সন্ধেবেলায় আমরা যখন মাদাম রডারিখ আর মাইরার সঙ্গে আসর জমিয়ে বসে চুটিয়ে গল্পগুজব করছি, মার্ক একটু খোলা হাওয়ায় হেঁটে আসবে বলে বাইরে গিয়েই, ফের হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসেছে। মাইরা! মাইরা! এই দ্যাখো, তোমার জন্যে আমি কী নিয়ে এসেছি।

দেখেই, আসন থেকে উঠে মাইরা ছুটে গেছে তার দিকে। এ-যে আমার মুকুট!

হ্যাঁ, কী কাণ্ড দ্যাখো, বাগানের একটা ফুলের ঝাড়ের পাশে পড়ে ছিলো।

কিন্তু কেমন করে? কেমন করে গেলো ওখানে! মাদাম রডারিখ বিস্ময়ে থ।

কেমন করে আবার? ডাক্তার রডারিখ বলে উঠেছেন, উটকো কোনো লোক নিশ্চয়ই রবাহূত ঢুকে পড়েছিলো অতিথিদের মধ্যে। তারপর বিশ্রী, কুরুচিকর একটা রসিকতা করেছে লোকটা। যাক, এই আজগুবি ব্যাপারটা নিয়ে আর আমাদের খামকা মাথা ঘামাতে হবে না।

মাইরার চোখ ফেটে ততক্ষণে টলটলে মুক্তোর মতো জল বেরিয়ে এসেছে। সে শুধু বারেবারে বলেছে, ওহ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে, মার্ক, ধন্যবাদ!

পরের দিনগুলোয় আর-নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি, মাগিয়ার শহরটাও ফিরে পেয়েছে তার অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনের ভঙ্গিমা। বুলভার তেকেলির হানাবাড়িটায় পুলিশ যে তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশ চালিয়ে এসেছে, সে-কথা কেউ জানতেও পায়নি, কেউই এ-প্রসঙ্গে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর নামও আর উল্লেখ করেনি। এখন আমাদের শুধু ধীরস্থিরভাবে–কিংবা হয়তো অস্থিরভাবেই–অপেক্ষা করতে হবে শুভদিনটার জন্যে, যেদিন মার্ক আর মাইরার বিয়েটা ঘটা করেই সম্পন্ন হবে।

মার্ক বেশির ভাগ সময়টাই আমায় একা কাটাতে দিয়েছে। আমি সময়টা কাটিয়েছি রাগৎস-এর আশপাশে ঘুরে বেড়িয়ে, আর মাঝে-মাঝেই কাপ্তেন হারালানও যথারীতি আমার সঙ্গী হয়েছে। বুলভার তেকেলি দিয়ে না গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে শহরের বাইরে যাওয়াটা একটু অস্বাভাবিকই হতো আমাদের পক্ষে। সেই হানাবাড়িটা যেন হারালানকে চুম্বকের মতো টানছিলো। কিন্তু তাতে এটা কেবল আমরা বুঝতে পেরেছি বাড়িটা অন্তত

এখনও ফাঁকাই পড়ে আছে, তাছাড়া এখনও দুজন সেপাই সারাক্ষণ মোতায়েন আছে। পাহারায়। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি ফিরে আসতো তবে কিছুতেই সেপাইদের চোখে ধুলো দিতে পারতো না–এবং তক্ষুনি তাকে গ্রেফতার করা হতো। তাছাড়া, সে-যে এখানে নেই এখন, এবং রাগৎস-এর রাস্তায় যে আচমকা তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটার একটা প্রমাণও আমাদের হাতে এসে গিয়েছিলো।

২৯শে মে খোদ মঁসিয় পোর্কের মুখ থেকে আমি জানতে পেরেছিলুম যে অটো স্টোরিৎস-এর মৃত্যুর সেই পূর্বঘোষিত বার্ষিকী উৎসব ২৫শে মে প্রেমবার্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে অনেক লোক হয়েছিলো, আশপাশের শহর থেকেই শুধু নয়, বার্লিন থেকেও নাকি লোক এসেছিলো। হাজার-হাজার লোক হয়েছিলো সেখানে, এত লোক যে কবরখানায় আঁটেনি, লোক তার আশপাশেও উপচে পড়েছিলো। অনেক হৈ-হট্টগোল হ্যাঙ্গামাও হয়েছে, দুর্ঘটনা অপঘাতমৃত্যুও বাদ যায়নি। ভিড়ের মধ্যে দম আটকে, বা ভিড়ের চাপে পিষে গিয়েও, অনেক লোক নাকি মারা গিয়েছে সেই করবখানায়।

এটা তো কেউ ভুলে যায়নি যে অটো স্টোরিৎস-এর জীবনমৃত্যুকে ঘিরে কত কী কিংবদন্তি গজিয়ে উঠেছিলো, এবং এত-সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসী মানুষ তার অলৌকিক ক্ষমতার একটা মরণোত্তর নিদর্শন দেখতে চাচ্ছিলো। আশ্চর্য-কিছু যদি এই উৎসবে না-ঘটে, তবে আর অটো স্টোরিৎস-এর মাহাত্ম রইলো কী? আর-কিছু না হোক পুঁশিয়ার এই সিদ্ধপুরুষটিকে তো সর্বসমক্ষে কবর থেকে উঠে আসতে হয়। আর সেই মুহূর্তে পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে যদি বিষম-কোনো ঝামেলা পাকিয়ে বসে, তাহলেও লোকে হয়তো অবাক হবে না। পৃথিবী হয়তো দিনরাত্রির আবর্তনটা হঠাৎ উলটো দিকে

ঘুরেই শুরু করে দিলে নতুন করে, পশ্চিম থেকে পুবে ঘুরলেই বা পৃথিবীকে ঠেকাচ্ছে কে। তাতে সৌরজগৎ গোল্লায় যাক, তো, যাক-না!

লোকের মধ্যে এমনি-সব কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিলো তখন। আসলে কিন্তু পুরো অনুষ্ঠানটাই হয়েছিলো নীরস, সাধারণত এমন-সব স্মরণোৎসব যেমন হয়ে থাকে তেমনি। কবরের পাথর ভেতর থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে কাঁচা ঘুম ভেঙে কেউ জেগে ওঠেনি। প্রেতসিদ্ধই হোক বা বিজ্ঞানসাধকই হোক, মৃত ব্যক্তি তার পারলৌকিক আশ্রয় ছেড়ে আদপেই বেরোয়নি আর পৃথিবীও তার আপন অক্ষচক্রকে কেন্দ্র করে যেমন ঘুরতো তেমনি ঘুরে চলেছে তার আহ্নিকগতিতে।

কিন্তু যে-তথ্যটা এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটা এই : অটো স্টোরিৎস-এর পুত্রবর সেই অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত ছিলো। সে-যে রাস ছেড়ে চলে গিয়েছে, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমি শুধু আশা করেছি যে সে যেন তার ভৃত্যকে নিয়ে আর এখানে ফিরে না-আসে।

তক্ষুনি আমি খবরটা পৌঁছে দিয়েছি মার্ক আর কাপ্তেন হারালানকে–যেহেতু তারা তখনও মাথাগরম করে অহেতুক (?) ক্ষুব্ধ হয়ে বসে ছিলো।

যদিও এই তাজ্জব ঘটনাগুলো যে-শোরগোল তুলেছিলো, তার প্রায় অনেকটাই তখন মিলিয়ে এসেছে, রাগৎস-এর রাজ্যপাল কিন্তু তখনও বেশ-একটু অস্বস্তি বোধ করেছেন। পুরোটাই কি কারু হাতসাফাই ছিলো, ভেলকির খেলা ছিলো, না কি সত্যি এর মধ্যে ছিলো ব্যাখ্যাতীত কোনোকিছুর উপস্থিতি–সেই রহস্যটার এখনও-অব্দি কোনো কিনারা

হয়নি, আর এটাও ঠিক যে কানাঘুষোয় এ-ব্যাপারটা শহরের শান্তি যথেষ্ট বিঘ্নিত করেছিলো; এ-রকম যাতে আর-কখনও না-হয় তার ব্যবস্থা করা জরুরি বলেই রাজ্যপালের মনে হচ্ছিলো। সেইজন্যেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে মঁসিয় স্টেপার্ক তাকে যখন ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর হুমকি ও অপকীর্তির কথা খুলে বলেছিলেন, তখন তিনি কতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই এই তদন্তের ফলাফল জেনে, বিশেষত ও-বাড়িতে চোরাইমাল পাওয়া গেছে জেনে রাজ্যপাল ঠিক করেছিলেন বিদেশীকে এজন্যে বিশেষ কঠোর দণ্ড দেবেন। আর-কিছু না-হোক, একটা জিনিশ চুরি হয়েছে; ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নিজে ঐ চুরি করে থাকুক বা না-থাকুক, তার উশকানিতেই ব্যাপারটা ঘটেছে অথবা এতে তার সরাসরি হাত আছে–কোনোভাবে। সে যদি রাগৎস ছেড়ে চলে না-যেতো, তবে তাকে গ্রেফতার করা হতো, আর একবার তাকে হাজতে পুরে ফেলতে পারলে আবার দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে ডাক্তার রডারিখের বাড়িতে গিয়ে তার পক্ষে নতুন-কোনো অপকর্ম করা সম্ভব হবে না। সেইজন্যেই ৩০শে মে রাজ্যপালের সঙ্গে মঁসিয় স্টেপার্কের যে-কথোপকথন হয়েছিলো সেটা এইরকম :

আপনি এ-সম্বন্ধে আর নতুন-কোনো খবর পাননি?

না, ইওর এক্সেলেন্সি।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে ফের রাগৎস ফিরে আসবার মৎলব এঁটেছে, এমন মনে করবার কোনো কারণ ঘটেনি আশাকরি?

কিছুমাত্র না–কোনো কারণই নেই।

তার বাড়ির ওপর সেপাইরা এখনও নজর রেখেছে?

দিবারাত্রি-চব্বিশ ঘণ্টাই।

আমি ভেবেছি এ-বিষয়ে বুড়াপেটে সবিশেষ লিখে-জানানো আমার কর্তব্য, জানিয়েছেন রাজ্যপাল, এ-ব্যাপারটা এখানে কতখানি শোরগোল তুলেছে সেটা বুড়াপেটের জানা উচিত। ব্যাপারটার যাতে এখানেই ইতি ঘটে, সেইজন্যে যা-যা করা দরকার সবকিছুর আগাম অনুমোদন জানিয়ে সেখান থেকে বার্তা এসেছে।

যতক্ষণ-না ভিলহেল্ম স্টোরিৎস রাৎসে ফিরে আসছে,মঁসিয় স্টেপার্ক বলেছেন, ততক্ষণ তার কাছ থেকে ভয় করবার কিছু নেই আমাদের। সে-যে অন্তত পঁচিশ তারিখে স্পেমবার্গ ছিলো, সে-খবর আমরা নিশ্চিতভাবে জানি।

তা ঠিক, তবে সে হয়তো এখানে ফিরে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। যাতে সে এখানে ফিরে না-আসতে পারে, তারই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

তার চাইতে সহজ আর-কিছু নেই, ইওর এক্সেলেন্সি। যেহেতু ব্যাপারটা একজন বিদেশীকে নিয়ে, তাই বহিষ্কারের ফতোয়া জারি করে দিলেই চলবে।

এমন-এক ফতোয়া, যা তাকে যে শুধু রাগৎস থেকেই বার করে দেবে তা নয় –গোটা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজ্য থেকেই বার করে দেবে।

হুকুমনামাটা হাতে পাবামাত্র, মঁসিয় স্টেপার্ক কথা দিয়েছেন, আমি সীমান্তের সব পাহারাদারদেরই নির্দেশ পাঠিয়ে দেবো।

ফতোয়াটায় তক্ষুনি দস্তখৎ করে সীলমোহর করে দেয়া হয়েছে–আর গোটা দেশেই ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অবাঞ্ছিত বিদেশী বলে ঘোষিত হয়ে গেছে।

ব্যবস্থাটা নেয়া হয়েছিলো আমাদের সবাইকেই আশ্বস্ত করার জন্যে। কিন্তু তখন আমরা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতুম যে কী হতে চলেছে, তাহলে হয়তো অমন মিথ্যা আশ্বাসে স্বস্তি পেতুম না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। শিগগিরই পয়লা জুনের সূর্য–শেষ অব্দি পয়লা জুনই বিয়ের দিন হিশেবে ঠিক হয়েছে–উঠবে রাগৎস-এর দিগন্তে।

এটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে মাইরা-কচি বয়েসে লোকে এমনিতে অনেককিছু নিয়ে অকারণেই মাথা ঘামায়, কিন্তু মাইরা ঐ দুর্বোধ প্রহেলিকাটিকে তেমন করে আর মনে রাখেনি। এটাও ঠিক যে তার বা তার মায়ের সামনে একবারও অবশ্য ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের নামটাই পাড়া হয়নি।

তার বিশেষ-কোনো সখী ছিলো কি না জানি না, তবে আমিই তার মনের কথা খুলে বলবার অন্তরঙ্গ শ্রোতা হয়ে উঠেছিলুম। পরে কী করবে না-করবে সে-সম্বন্ধে সে কী ভাবছে, তা সে আমায় খুলে বলেছিলো, অবশ্য সেগুলো তার স্বপ্নই, কখনও সফল হবে কি না কে জানে। মার্কের সঙ্গে ফ্রাসে গিয়ে সেখানেই থাকবে বলে কি মনস্থ করেছে? হ্যাঁ, যাবে ফ্রাসে, থাকবেও, তবে এখন নয়, পরে। এক্ষুনি বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যেতে হলে ভারি কষ্ট পাবে সে।

তবে, এটাও সে জুড়ে দিয়েছিলো, আপাতত পারী গিয়ে কয়েক হপ্তা কাটিয়ে আসবো-আপনিও আসবেন তো আমাদের সঙ্গে, আসবেন না?

নিশ্চয়ই। তবে সত্যি-সত্যি তোমরা তৃতীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে চাইবে কি না কে জানে।

তা ঠিক। নবদম্পতি কোনোকালেই বেড়াতে যাবার যোগ্য সঙ্গী হয় না।

আমি না-হয় অসুবিধেগুলো মেনেই নেবো, অগত্যা যেন মেনেই নিয়েছিলুম আমি।

ডাক্তার রডারিখের কাছে মনে হয়েছিলো ফ্রাসে চলে যাবার এই পরিকল্পনাটা খুবই ভালো। সবদিক বিবেচনা করেই মনে হয়েছে, দু-এক মাসের জন্যে রাগৎস ছেড়ে চলে গেলে ভালোই হবে। মাদাম রডারিখ হয়তো কন্যা কাছে না-থাকায় একটু কষ্ট পাবেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে কী আর করা?

আর মার্ক? মাইরার সঙ্গে যখন থাকে, তখন সময় কেমন করে কেটে যায় টেরই পায় না। অন্যসময় সে অরুচিকর প্রসঙ্গটা ভুলেই থাকতে চাইতোকে আর হৃদয় খুঁড়ে অমনতর বিশ্রী জিনিশ নিয়ে মনখারাপ করে থাকে। তবে শুধু আমার কাছেই সে খুলে বলতো তার দুর্ভাবনাগুলো–আমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইলেও সবসময় এই আশঙ্কা সে কাটিয়ে উঠতে পারতো না। থেকে-থেকেই আমায় জিগেস করতো, নতুন কিছু হয়েছে নাকি, অঁরি?

না, কিছুই হয়নি, আমি বলতুম, আর মিথ্যেও বলতুম না।

একদিন তার মনে হয়েছে আমাকে বোধহয় আগে থেকে বলে রাখা উচিত।

শহরে কানাঘুষো কিছু কানে এলে, বা মঁসিয় স্টেপার্কের কাছ থেকে কিছু জানতে পেলে–

আমি তোকে হুঁশিয়ার করে দেবো, মার্ক।

সে তুই যা-ই শুনিস না কেন, আমি চাইবো না তুই আমার কাছ থেকে কিছু লুকোস।

আমি-যে কিছুই তোর কাছ থেকে লুকোবো না, সে-বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস। তবে তোকে এই আশ্বাসটুকু দিতে পারি যে এ নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। শহর ফের আগের মতোই দিব্বি নির্ভাবনার পালে ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে চলেছে। কেউ তার ব্যাবসা দেখছে, কেউ-বা খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রমোদ, আর বাজারদর তো কেবলই বেড়ে চলেছে...

তুই ঠাট্টা করছিস, অঁরি।

সেটা তোকে এটাই বোঝাতে যে আমার মনের মধ্যে কোনো শঙ্কা নেই।

অথচ তবু, মার্কের মুখচোখে কালাছায়া পড়েছে, যদি সেই লোকটা–

বাঃ! সে অমন গাড়ল নয়। সে বেশ ভালোই জানে যে হাঙ্গেরির কোথাও পা দেবামাত্র তাকে গ্রেফতার করে হাজতে পোরা হবে। জার্মানিতে অনেক মেলা হয়– সেখানে সে তার ভেলকি দেখিয়ে সবাইতে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে।

তাহলে সে-যে ভুতুড়ে পিশাচশক্তি লেলিয়ে দেবার হুমকি দিয়েছিলো–

ছেলেভোলানো গল্প হিশেবে সেগুলো চমৎকার ছিলো, চটকদারও!

তাহলে তুই সে-সবে বিশ্বাস করিস না?

তুই যতটুকু করিস, তার চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই নয়। শোন, মার্ক, তুই বরং এখন থেকে প্রহর গোন, হিশেব করে দ্যাখ আর ক-মিনিট বাকি আছে শুভলগ্নের। আর কিছু করার না-থাকলে ফের আবার এক থেকে গুনতে শুরু করতে পারিস।

ধুর! তুই বড় বাজে বকিস।

তুই ভারি ছেলেমানুষি করছিস, মার্ক। মাইরা তোর চাইতে অনেক-বেশি কাণ্ডজ্ঞান ধরে।

সে তো কেবল এইজন্যে যে আমি যা জানি ও তা জানে না।

কী জানিস তুই, বল-তো! এটা জানিস যে লোকটা এখন আর রাগৎস-এ নেই, সে আর এখানে ফিরে আসতে পারবে না–কারণ তার নামে একটা হুলিয়া বেরিয়েছে; এও জানি যে তার সঙ্গে আর-কখনোই আমাদের কোনো মোলাকাৎ হবে না। এত সব জেনেও তুই যদি অবুঝের মতো ভয় পাস...

সে তুই কী জানবি, অঁরি। আমার মনের মধ্যে কেবলই কু ডাকছে...

এর চেয়ে হাস্যকর আর-কিছু হয় না, মার্ক! শোন, বরং তুই মাইরার কাছ গিয়েই আড্ডা দে। তখন হয়তো এ-সব আবোলতাবোল ভাবনা ভুলে থাকতে পারবি!

হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস, অঁরি। ওকে আমার ছেড়ে-থাকা ঠিক না–এক মিনিটের জন্যেও ওর কাছছাড়া হওয়া উচিত হবে না।

বেচারা! ওর দিকে তাকাতেও আমার কষ্ট হচ্ছিলো, শুনতেও। যতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে ততই তার আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। আমিও একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিলুম বৈ কি!- মার্কের কথা ভেবেই। তবে মার্ককে যদি-বা মাইরা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, কপ্তেন হারালানকে নিয়ে আমি করবো কী? যে-মুহূর্তে সে শুনেছে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে মেবার্গে দেখা গেছে, সে অমনি সেখানে যাবার জন্যে প্রায় পা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে, তবে আমি তাকে ঠেকিয়েছি। স্পেমবার্গ মাত্র তো দুশো লিগ দূরে, দিন-চারেকের মধ্যেই এ-পথটুকু পেরিয়ে যাওয়া যায়, অনেক তুইয়ে বুইয়ে তাকে ঠেকিয়েছি বটে, ডাক্তার রডারিখও ছেলেকে অনেক বুঝিয়েছেন, তবু সে মন থেকে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে পারেনি–প্রেমবার্গে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে আসবার জন্যে তার হাত-পা যেন নিশপিশ করছিলো। আমার ভাবনা হচ্ছিলো সে হয়তো। আমাদের না-বলেই একদিন চলে যাবে। সেদিন সকালে সে যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তখন তার ভাবভঙ্গি দেখেই আমার মনে হয়েছে যে সে ওখানে যাবে বলেই মনস্থির করে ফেলেছে।

এটা কিন্তু তোমার করা ঠিক হবে না, হারালান, আমি তাকে আবারও বলেছি, এ-কাজ তুমি কোরো না। ঐ প্রশিয়ানের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া অসম্ভব। আমি তোমাকে অনুনয় করে বলছি, হারালান, রাগৎস ছেড়ে তুমি কোথাও যেয়ো না।

শুনুন, ভিদাল, কাপ্তেনের গলার স্বরে কঠিন দৃঢ়তা, ঐ পাজির পাঝাড়াটাকে একটা কঠিন সাজা দিতেই হবে!

অপকর্মের সাজা সে পাবেই–দু-দিন আগে আর পরে? আমি বলে উঠেছি, এ নিয়ে তুমি মনে কোনো সন্দেহই পুষে রেখো না। তবে তাকে পাকড়াবার দায়িত্ব সেপাইদের–তোমার নয়।

কথাটা তার মনে ধরেছে বটে, কিন্তু তবু সে তার জেদ ছাড়বে না, বলেছে, ভিদাল, আপনি যেভাবে ব্যাপারটাকে দেখছেন, আমি সেভাবে দেখছি না। আমাদের দেখার প্লনটাই ভিন্ন। আমার পরিবারকে–আপনার ভাইও তার অংশ হতে চলেছে–কলুষিত করেছে সে, আর আমি তার কোনো শোধ নেবো না? কোনো হিশেবনিকেশ হবে না। তার?

প্রতিশোধ কোনো কথাই নয়, হারালান। মূল কথা : ন্যায়বিচার। আর তার দায়িত্ব অন্যদের।

কিন্তু লোকটা যদি না-ই ফেরে, তবে তার বিচার হবে কেমন করে? এই-যে আজ রাজ্যপাল বহিষ্কারের ফতোয়ায় সই করেছেন, তাতে স্টোরিৎস তো আর-কখনও এখানে ফিরতেই পারবে না। পর্বত আর মহম্মদ-কে কার কাছে যাবে, ভিদাল? সে যদি না-আসে, তবে আমি গিয়ে তাকে তার ডেরা থেকে টেনে বার করে নিয়ে আসবে। যদি সে মেবার্গে থেকে থাকে–

মানি, আর-কিছুতেই ব্যাপারটার কোনো ফয়সালা না-হলে হয়তো তা-ই করতে হবে আমাদের, তবে অন্তত বোনের বিয়ে-হয়ে-যাওয়াটা অব্দি অপেক্ষা করো। আর তো শুধু

কয়েকটা দিন, তারপর আমি নিজেই তোমাকে বলবো, এবার গিয়ে একটা এপার-ওস্পার করে এসো। আমি নিজেই তোমার সঙ্গে প্রেমবার্গ যাবো তখন।

এই কথাটা আমি এতই জোর দিয়ে বলেছি যে আমাদের কথাবার্তা শেষটায় সাঙ্গ হয়েছে প্রায় একটা কথা দিয়েই যে বিয়ে হয়ে-যাওয়ার পর আমি আর-কোনো আপত্তিই করবো না, এবং আমি তখন তার সঙ্গ নেবো।

পয়লা জুন যেন আর আসতেই চাচ্ছে না। অথচ আমার বারেবারে মনে হয়েছে। এই সময়টার মধ্যে কেউ যেন আর ঘাবড়ে না-যায়, তাদের আমি অনবরত চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার নিজের মন থেকে অস্বস্তিটা কিছুতেই কাটেনি। কাজেই, সে-যে কোন অলুক্ষুণে আশঙ্কা আমায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে জানি না, তবে বারেবারে আমি বুলভার তেকেলির হানাবাড়িটার সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছি।

সেপাইরা ছোঁ মেরে পড়বার পর যেমন সীল করে গিয়েছিলো দরজা, হানাবাড়িটা তেমনি পড়ে আছে। দরজা-জানলা বন্ধ, উঠোন বা বাগান পরিত্যক্ত। বুলভার থেকে চারপাশে ছড়িয়ে আছে সেপাইদের সদাজাগ্রত পাহারা। প্রভু বা ভৃত্য–কেউই আর ফিরে। এসে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করেনি। অথচ, মার্ক বা হারালানকে পইপই করে যা। বলেছি, নিজেকেও আমি বারেবারে যে-সব কথা বলে বুঝিয়েছি; সব সত্ত্বেও, যেন। একটা ঘোরের মতো, আবেশের মতো, আমার মনে হয়েছে যে যদি চিমনি থেকে কোনো ধোঁয়া উঠতে দেখি, বা কোনো মুখ দেখি জানলায় বা মিনারের পাখির বাসায়, তবে আমি যেন আদৌ অবাক হবো না।

রাগৎস-এর লোকজন যদিও অ্যাদ্দিনে তাদের ভয়টা কাটিয়ে উঠেছে, ঐ-সব আজব কাণ্ড নিয়ে আর-কোনো উচ্চবাচ্যই করছে না কেউ, আমরা নিজেরা-ডাক্তার রডারিখ, মার্ক ভিদাল, কাপ্তেন হারালান এবং আমি, স্বয়ং অঁারি ভিদাল–আমরা কেউই যেন ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে মন থেকে তাড়াতে পারছি না, সে যেন নিছক হানাই দিচ্ছে না আমাদের মনে, সেখানে সে যেন একটা মৌরসীপাট্টাই গেড়ে বসেছে।

সেদিন–তিরিশে মেমনের বোঝাটা হালকা করবার জন্যে বিকেলবেলায় আমি দানিউবের তীরে বেড়াতে গিয়েছিলুম; জাহাজঘাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা হালকা মালখালাশ-নৌকো তরতর করে উজান বেয়ে আসছে। তক্ষুনি আমার মনে পড়ে গেছে, পর-পর পটের গায়ে ছবির মতো, আমার নিজের যাত্রার কথা : কী করে জার্মানটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তার সেই অপমানকর ব্যবহার, প্রথম দেখেই তার বিরুদ্ধে মনটা আমার কেমন রি-রি করে উঠেছে; তারপরেই, যখন আমি ধরে নিয়েছি যে সে তীরে নেমে গিয়েছে, তখনই কথাগুলো কানের পাশে উচ্চারণ করেছে সে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে-ইএ-সব কথা বলে শাসিয়েছিলো, ডাক্তার রডারিখের বৈঠকখানায় তার গলা শুনেই আমি সেটা চিনতে পেরেছি। সেই উচ্চারণের ভঙ্গি, সেই রুক্ষ কর্কশ চোয়াড়ে গলা, সেই আলেমান ঔদ্ধত্য! এ-সব স্মৃতি যখন মনের মধ্যে হানা দিচ্ছে, আমি নিজের অজান্তেই তাকিয়ে ছিলুম যাত্রীদের দিকে–কারা-কারা নামছে রাগৎস-এ। সেই রংজ্বলা মুখ, সেই অদ্ভুত চাউনি, সেই পৈশাচিক অভিব্যক্তিটা খুঁজে বেড়িয়েছে আমার চোখ। কিন্তু, যেমন বইয়ে বলে, অত তাকিয়ে দেখেও কোনো লাভই হয়নি।

ছটার সময় আমি যথারীতি গিয়ে হাজির পারিবারিক ভোজের আসরে। মাদাম রডারিখকে দেখে মনে হয়েছে আগের চাইতে অনেক ভালো আছেন, নিজেকে তিনি চমৎকার সামলে

নিয়েছেন। আর আমার ভ্রাতাটি তো মাইরা পাশে থাকলে বিশ্বসংসারই ভুলে যায়। এমনকী কাপ্তেন হারালানকেও বেশ শান্ত দেখাচ্ছিলো, যদিও মুখের মধ্যে একটা কালো ছায়া লেগেই ছিলো।

আমি ঠিক করে রেখেছিলুম যে এদের মন থেকে বিচ্ছিরি স্মৃতিগুলো তাড়িয়ে দিয়ে আনন্দ ফুটিয়ে তোলবার জন্যে দরকার হলে তিনবার ডিগবাজিও খাবো টেবিলটায়। অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলবো। আমার পরিকল্পনাকে চমৎকার সহায়তা করেছিলো মাইরা : সে-ই ছিলো সেই সন্ধের হাসিখুশি হুল্লোড়ের উৎস-আর সন্ধে গড়িয়ে গিয়েছিলো গভীর রাতে। কেউ কিছু না-বলতেই সে গিয়ে বসেছে ক্লাভিকর্ডের কী বোর্ডে, আমরা সবাই গলা মিলিয়ে গান ধরেছি–পুরোনো সব মাগিয়ার গান, যেন সেই জঘন্য ঘৃণাবিদ্বেষের স্তবের রেশটুকুকে মুছে দিতে চাচ্ছি সবাই।

ঠিক যখন আমরা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, মাইরা হালকা চটুল গলায় মৃদু হেসে বলেছে : ভুলে যাবেন না, মঁসিয় অঁরি, যে কালকেই

ভুলবো, মাদামোয়াজেল? আমারও গলা বুঝি সমান চটুলই শুনিয়েছে।

না, ভুলবেন না যে কালকেই আমরা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তার অনুমোদন নেবো–

আরে, তা-ই ত, কালকেই তো!

আর আপনি আপনার ভাইয়ের তরফে সাক্ষী হবেন।

আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে খুব ভালো করেছেন, মাদমোয়াজেল মাইরা। আমার ভাইয়ের তরফে সাক্ষী! আমি যে বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলুম।

আমি অবশ্য তাতে মোটেই অবাক হইনি। দেখছি, ক-দিন ধরেই আপনি যেন কীসের–বা কার-ধ্যান করে চলেছেন।

কবুল করছি, ঘাট হয়েছে। তবে কথা দিচ্ছি আর ও-রকম ভুল হবে না। আর মার্ক যতক্ষণ না-ভুলছে...

তার হয়ে আমিই কথা দিচ্ছি। তাহলে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় চারটেয়।

চারটেয়, মাদমোয়াজেল মাইরা? কী কাণ্ড, এদিকে আমি ভেবেছিলুম বুঝি সাড়ে পাঁচটায়... ঠিক আছে, ভেবো না। আমি চারটে বাজতে দশ মিনিটেই ওখানে হাজির হয়ে যাব।

তাহলে, শুভরাত্রি।

শুভরাত্রি, মাদমোয়াজেল মাইরা!

পরদিন সকালে মার্কের কতগুলো জায়গায় যাবার কথা ছিলো। আমি ভেবেছি, সে বুঝি তার ভয়-টয় কাটিয়ে উঠেছে, তাই তাকে যেতে দিয়েছি।

তবে, সাবধানের মার নেই ভেবে, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে শেষ মুহূর্তে এখানে

এসে হাজির হয়নি, এটা জানতে আমি সরাসরি টাউনহলে গিয়ে হাজির হয়েছি।

আমাকে দেখেই মঁসিয় স্টেপার্ক আমার প্রশ্নটা বুঝে নিয়েছেন। বলেছেন, না, মঁসিয় ভিদাল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন–আমাদের শ্রীমানকে রাগৎস-এর কোত্থাওই দেখা যায়নি।

এখনও মেবার্গেই আছে নাকি সে?

এটুকু শুধু বলতে পারি যে চারদিন আগেও সে ওখানেই ছিলো।

আপনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবরটা পেয়েছেন?

হ্যাঁ, আলেমান পুলিশের এক চর মারফৎ।

যাক, আশ্বস্ত হওয়া গেলো।

আমি কিন্তু বড্ড বিরক্তি বোধ করছি। এই পিশাচটা-পিশাচ ছাড়া একে আর কী নামে ডাকবো, বলুন–পিশাচটা কিছুতেই সীমান্ত পেরিয়ে এখানে আসতে চাচ্ছে না! অপেক্ষা করে-করে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি।

না-এলেই কিন্তু ভালো, মঁসিয় স্টেপার্ক।

আপনাদের পক্ষে হয়তো ভালো। তবে পুলিশ তার ঘাড়েটাড়ে হাত রাখতে পারলে খুশি হতুম আমি। পিশাচটাকে জেলে পুরতে পারলে স্বস্তি পেতুম! যাক–সে না-হয় পরে কোনোদিন করা যাবে।

এ-কথার পর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ফিরে এসেছি।

বিকেল চারটের সময় আবার আমরা সকলে রডারিখ-ভবনে জমায়েৎ হয়েছি। বুলভার তেকেলিতে দুটো কোচবাক্স অপেক্ষা করছিলো : একটায় যাবে তার বাবা-মা। এবং পারিবারিক বন্ধু বিচারপতি নয়মানের সঙ্গে মাইরা; অন্যটায় মার্ক, কাপ্তেন হারালান, তার জিগরি দোস্ত লিউটেনান্ট আমগাড়, আর আমি। মঁসিয় নয়মান আর কাপ্তেন হারালান কনের দিককার সাক্ষী; লিউটেনান্ট আর্মগড় আর আমি বরের পক্ষের সাক্ষী।

কাপ্তেন হারালান আগেই আমাকে এখানকার দস্তুরটা বুঝিয়ে বলেছিলো। এটা আসলে বিয়ে নয় ঠিক, বরং তার প্রস্তুতি। রাজ্যপালের অনুমোদন পাবার পরই শুধু, কাল, ক্যাথিড্রালে বিয়ের আসল অনুষ্ঠানটা হবে। ততক্ষণ অব্দি, বাগদত্তরা আইনের চোখে বিবাহিত দম্পতি নয়, তবে তার প্রায় পনেরো-আনা কাছাকাছি–কেননা তারপর যদি কোনো অভাবিত বিপত্তির ফলে বিয়েটা না-হয় তাহলে তাদের সারাজীবন অবিবাহিত থেকে যেতে হবে।

ফ্রানসের ফিউড্যাল ব্যবস্থায় এরই কাছাকাছি একটা নিয়ম ছিলো, যা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতার বাড়াবাড়িটা বোঝা যায় : সমাজপতি নিজেকে সমাজের পিতা বলেই গণ্য করতেন–আর সেই প্রথাটা আজও রাগৎস-এ বজায় আছে।

কনের পরনে চমৎকার একটা ঝলমলে ঘাগরা; মাদাম রডারিখও সূক্ষ্মভাবে সেজেছেন, তবে ভঙ্গিটা শাদাসিধে হলে কী হবে, ভীষণ দামি তার সাজপোশাক, ডাক্তার এবং বিচারপতি পরেছেন রাজভবনে যাবার উপযোগী পোশাক, যেমন পরেছি আমি আর মার্ক, আর সামরিক বাহিনীর অফিসার দুজন পরেছে পুরোদস্তুর সামরিক উর্দি।

বুলভারে অনেকেই জমায়েৎ হয়েছিলো, বর-কনের গাড়ি কখন এখান দিয়ে যায়; বেশির ভাগই কিশোরী এবং বয়স্কা মহিলা, তাদের কাছে যে-কোনো বিয়েই বোধহয় দারুণ উত্তেজনার খোরাক। তবে পরদিন যে ক্যাথিড্রালে মস্ত ভিড় জমে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই–রডারিখ পরিবারের যা নামডাক, তাতে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

কোচগাড়ি দুটো রডারিখ-ভবন থেকে বেরিয়ে সরাসরি রাজভবনের দিকেই ছুটেছে। শহরের রাস্তায় আর রাজভবনের সামনে দস্তুরমতো ভিড়ই জমে গিয়েছে। সম্ভবত বিয়েটাকে ঘিরে আগে যা-সব আজব ব্যাপার ঘটে গিয়েছে তাতেই তারা এত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, হয়তো ভেবেছে যে আবার-কোন্ নতুন ফ্যাসাদ বেধে যায় এখন!

কোচগাড়ি দুটো তারপর সোজা রাজভবনের চকমেলানো সিঁড়ির সামনে গিয়ে। থেমেছে। পরক্ষণেই বাবার বাহু ধরে নেমে এসেছে মাইরা, মঁসিয় নয়মানের বাহু ধরে নেমেছেন মাদাম রডারিখ, তারপর মার্ক, কাপ্তেন হারালান, লিউটেনান্ট আর্মাড় আর আমি দরবারঘরে আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেছি। ঘরের মাঝখানে বড়ো একটা টেবিল, তাতে দুটো ঝুড়ি ভর্তি ফুল ঝলমল করে উঠেছে।

কনের বাবা-মা হিশেবে রডারিখ দম্পতি বসেছেন বাগদত্ত দুজনের দু-পাশে দুটি বিশাল আরামকেদারায়। তাদের পেছনে বসেছি আমরা–সাক্ষী চারজন। ঘোষক

জানিয়েছে রাজ্যপালের আগমনবার্তা : তিনি ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে।

তার সিংহাসনে বসবার পর রাজ্যপাল সরকারিভাবে কনের পিতামাতাকে জিগেস করেছেন মার্ক ভিদালের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে দিতে তাদের সম্মতি আছে কি না। তারপরে তিনি হবু দম্পতিকে আলাদা-আলাদা করে প্রথাগত প্রশ্ন জিগেস করেছেন।

মার্ক ভিদাল, তুমি মাইরা রডারিখকে তোমার বৈধ পত্নী হিশেবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো কি?

আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম, মাগিয়ার আদবকায়দা মার্ক বেশ তালিম দিয়েছিলো।

মাইরা রডারিখ, তুমি মার্ক ভিদালকে বৈধ পতি হিশেবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো কি?

আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম,কথার কোনো খেলাপই হবে না, এমনি একটা ভঙ্গি করে বলেছে মাদমোয়াজেল মাইরা!

আমরা, রাগৎস-এর রাজ্যপাল, রাজ্যপাল ঘোষণা করেছেন, আমাদের উপর সম্রাজ্ঞীর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাগৎস-এর যুগসঞ্চিত প্রথা অনুযায়ী, মাইরা রডারিখের সহিত মার্ক

ভিদালের শুভ পরিণয়ে অনুমোদন প্রদান করিলাম। ইহাই আমাদের অভিপ্রায় ও নির্দেশ যে উক্ত বিবাহ-অনুষ্ঠান যেন নগরীর ক্যাথিড্রালে যথাবিহিত প্রথা অনুযায়ী সমাধা হয়।

সবকিছুই দস্তুর অনুযায়ী সোজাসুজি শেষ হয়ে গেলো। যারা এতে অংশ নিয়েছে। তাদের অস্বস্তির কোনো কারণ ঘটেনি। যে-কাগজটায় আমরা সবাই সই করেছি, কোনো অদৃশ্য হাত ভেলকি দেখিয়ে সেটা শূন্যে তুলে নিয়ে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফ্যালেনি–কিংবা সই করবার আগে কোনো ভূতপ্রেত এসে আমাদের হাত থেকে কলমটা কেড়ে নেয়নি।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাহলে সত্যিই নিশ্চয়ই প্রেমবার্গেই থেকে গিয়েছে। জার্মানদের মনে হর্ষ জাগিয়ে তাদের মধ্যেই সে না-হয় কাটিয়ে দিক তার চিরটা কাল। আর যদি সে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে রাগস এসে থাকে, তাহলে তার সব জাদুবলই হয়তো উধাও হয়ে গেছে। কিন্তু এই পিশাচসিদ্ধ ভেলকিবাজ এখন চাক বা না-চাক, মাইরা রডারিখ এখন শুধু মার্ক ভিদালের পত্নীই হবে, তা না-হলে-আর-কারুই নয়।

.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এসে পৌঁছেছি পয়লা জুনে। অবশেষে একসময়। অথচ সময় এমনই ধীর লয়ে কাটছিলো যে মনে হচ্ছিলো বহুপ্রতীক্ষিত এই পয়লা জুন বুঝি আর আসবেই না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের পাতায় যথানিয়মেই সে এসে হাজির এখন। আর মাত্রই কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরেই রাগৎস-এর ক্যাথিড্রালে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে যাবে।

পনেরো দিন আগে যে-দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মুখোমুখি হয়ে আমরা একেবারেই ভড়কে গিয়েছিলুম, আর তার জের হিশেবে যে-শঙ্কার বোধ মনের মধ্যে হানা দিচ্ছিলো, রাজ্যপাল সকাশে গিয়ে তা এখন একেবারেই মুছে গিয়েছে।

আমি উঠেছি ভোরবেলাতেই। ভেবেছি, বড্ড আগেই বুঝি ঘুমটা ভেঙে গেলো, কিন্তু উঠে দেখি মার্ক আমারও আগে উঠে পড়েছে। আমি যখন সাজপোশাক পরছি, সে পুরোদস্তুর সাজগোজ করে আমার ঘরে এসে হাজির। বরের সাজই পরে ফেলেছে। সে। মুখটা আনন্দে ঝলমল করছে, কোথাও কোনো ছায়া নেই সেই আনন্দের মধ্যে। সে আমাকে উদ্ভাসিত সুরে সুপ্রভাত জানিয়েছে, আর আমি তার হাতে হাত রেখেছি।

মাইরা তোমায় বলতে বলেছে যে– সে বেশ গুছিয়েই শুরু করেছিলো, কিন্তু আমি হো-হো করে হেসে ফেলেছি, বলেছি, যে, মহাকাণ্ডটা আজকেই হবে। তা, তুই ওকে বলে দিস যে রাজভবনে যখন দেরি করে যাইনি, তখন ক্যাথিড্রালেও দেরি হবে না। কাল আমি একেবারে চার্চের বড়োঘড়িটার সঙ্গে আমার ঘড়ি মিলিয়েছি। তবে তোর, মার্ক, তোর

উচিত হবে না ওদের অপেক্ষা করিয়ে রাখা! তোর উপস্থিতি কতটা জরুরি, সেটা নিশ্চয়ই জানিস তুই : ওরা তোকে ছাড়া কিছু শুরু করতেই পারবে না!

মার্ক অমনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছে আর আমিও তাড়াহুড়ো করে আমার কাজ শেষ করেছি–অথচ তখন কিন্তু সকাল নটাও বাজেনি।

ডাক্তার রডারিখের বাড়ি গিয়ে দেখা করার কথা আমাদের। সেখান থেকেই কোচগাড়িগুলো পর-পর বেরুবে। সময়ানুবর্তিতার বদলে বেশ-একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি আমি, যখন গিয়ে পৌঁছুনো উচিত তার ঢের আগেই চলে এসেছি এবং তা দেখে কনে ফিক করে হেসেছে একটু। আমি গিয়ে তারপর বসেছি ড্রয়িংরুমে।

একের পর এক অতিথিরা আসতে শুরু করেছে, বিশেষ করে যারা রাজভবনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলো। সব্বাই, তখনও যেমন, আজকেও তেমন–যেন পাল্লা দিয়ে মাঞ্জা দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর অফিসার দুজন ফিটফাট সেজে আছে পুরোপুরি সামরিক পোশাকে, পদক-ভূষণ সমেত।

মাইরা রডারিখ–তা মাইরা ভিদাল বললেই বা ক্ষতি কী এখন? যেহেতু বাগদত্তরা এখন রাজ্যপালের ফরমান-বলে চিরবন্ধনে আবদ্ধ–মাইরা, শুক্লবসনাসুন্দরী, হালকা ফিনফিনে রেশমি আঁচল বিছিয়ে আছে পেছনে, নারঙ্গি মুকুলও আছে যথারীতি, কোমরে ফুলের কটিহার, আর ঝলমলে সোনালি চুলে দারুণ মানিয়েছে বিয়ের মুকুটটিকে, তার তলা থেকেই মুখের ওপর বেছানো জালি-ওড়না। এই মুকুটটাই বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছে বলে মার্ক তাকে এনে দিয়েছিলো–এটা ছাড়া আর-কোনো মুকুট সে পরবেই না। মায়ের, সঙ্গে

মরালগতিতে ড্রয়িংরুমে ঢুকেই সোজা সে আমার দিকে এসে তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি সেটা স্নেহভরে আমার হাতে টেনে নিয়ে ঝাঁকিয়েছি। তারপর, চোখ দুটো থেকে আলো ঝরে পড়ছে যেন, সে বলে উঠেছে : দাদা! কী-যে খুশি হয়েছি, কী বলবো!

এর আগে, এই বিয়ে নিয়েই, এই বাড়ির ওপর দিয়ে যে-ঝড় বয়ে গিয়েছে, এখন আর তার কোনো চিহ্নই নেই। শুধু কাপ্তেন হারালানই সব কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি, কিন্তু সেও আমার হাতে হাত মিলিয়ে বলেছে, নাঃ, ও-সব বাজে ব্যাপারে আর মাথা ঘামানো ঠিক হবে না!

দিনের কাজের সূচি সকলেরই মনের মতো করে ঠিক করা হয়েছিলো। কাঁটায় কাটায় পৌনে দশটায় আমরা ক্যাথিড্রালের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়বো, যেখানে স্বয়ং রাজ্যপাল শহরের অন্যান্য মান্যগণ্যদের নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেন। বিয়ের জন্যে চার্চের খ্রিষ্টযাগ হবে, আর সন্ত মিখায়েলের সুরক্ষিত স্যাক্রিস্টিতে সঞ্চিত নথিসেরেস্তায় সই করা হবে-অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ইত্যাদি। তারপর ফিরে-আসা হবে মধ্যাহ্নভোজে-মোটমাট জনপঞ্চাশ নিকট-বন্ধু থাকবেন তাতে। সন্ধেবেলায় নৃত্যগীত, বল, আনন্দ-মজলিশ, তার জন্যে এরই মধ্যে দুশো নিমন্ত্রণপত্র বিলি হয়ে গেছে।

যাবার সময় কোচগুলিতে বসবার ব্যবস্থা ছিলো আগের দিনটারই মতন। ক্যাথিড্রাল থেকে ফেরবার সময় মার্ক আর মাইরা ভিদাল বসবে একই কোচবাক্সে–এবার তারা চিরকালের মতো যুগলবন্দী। অন্য কোচগাড়িগুলোয় আসবে বাকি সব লোক।

পৌনে দশটার সময় কোচগাড়িগুলো রডারিখ-ভবন থেকে বেরুলো। আবহাওয়া চমৎকার, সূর্য উঠে এসেছে অনেকটাই, ঝিরঝিরে হাওয়া পাঠিয়ে দিয়েছে দানিউব, প্রায় একটা শোভাযাত্রাই যেন চলেছে ক্যাথিড্রালের দিকে, রাস্তা থেকেও লোক এসে যোগ দিয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে সামনের কোচগাড়িটার দিকে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সবাই কনের দিকে, মার্কের প্রতিও কম তারিফের ভাব নেই। রাস্তার দু-পাশের খোলা জানলায় হাস্যোজ্জ্বল সব মুখ, চারপাশ থেকে আসছে অভিনন্দনের ধ্বনি–এত লোক যে ডাক্তার রডারিখদের গুণমুগ্ধ, এই শোভাযাত্রা না-দেখলে তা বিশ্বাস করা শক্ত হতো।

আমি আমার মনোভাব ধ্বনিতেই ব্যক্ত করেছিলুম : এই শহর থেকে আনন্দ স্মৃতি নিয়েই ফ্রাসে ফিরে যাবো দেখছি!

হাঙ্গেরীয়রা আপনাদের সম্মান দেখাবার চলে আসলে ফ্রান্সকেই সম্মান জানাচ্ছে, মঁসিয় ভিদাল, লিউটেনান্ট আর্মগাড় আমার কথা শুনে বলেছে, আর এই বিয়ে মারফৎ রডারিখ পরিবারে এখন যে একজন ফরাশি সদস্যও আছে, তাতেও তারা ভারি খুশি।

চকের সামনে পৌঁছুবামাত্র এত ভিড় জমে গেছে যে ঘোড়াগুলো শুধু আস্তে, দুলকি চালেই, এগুতে পেরেছে।

দূরে ক্যাথিড্রালের মিনার থেকে ঘণ্টার উল্লাস ফেটে পড়েছে, আর পুব-থেকে আসা হাওয়া সেই ধ্বনিই উড়িয়ে নিয়ে এসেছে এদিকে, আর ঠিক দশটার সময় প্রহরতোরণের সুমধুর প্রহরঘণ্টার সঙ্গে মিশেছে সন্ত মিখায়েলের ধ্বনিগম্ভীর গভীর নাদ।

আর তার পাঁচ মিনিট পরে আমাদের কোচগাড়ি দুটো এসে থেমেছে সিঁড়ির সামনে, ক্যাথিড্রালের প্রধান দুয়ারের কবাটগুলো খোলা, আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে।

সবচেয়ে আগে নেমেছেন ডাক্তার রডারিখ, তারপর নেমেছে তার মেয়ে, নেমেই তার বাহু আঁকড়ে ধরেছে। মঁসিয় নয়মান তার বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন মাদাম রডারিখের দিকে, তারপর গিয়েছি আমরা, মার্কের পেছন-পেছন, দর্শকদের সারির মধ্য দিয়ে, আর সেই মুহূর্তেই ক্যাথিড্রালের বিশাল অর্গানটা বেজে উঠেছে, আর সেই ধ্বনিমহিমার মধ্যেই শোভাযাত্রা ঢুকেছে সেই পবিত্র খ্রিষ্টমন্দিরে।

উঁচু বেদিটার সামনেই দুটো চেয়ার পাশাপাশি পাতা, মার্ক আর মাইরা এগিয়ে গেছে তাদেরই দিকে। তাদের পেছনে কনের বাবা-মা এবং সাক্ষীরা গিয়ে যে-যার নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়েছে।

অগুনতি অভ্যাগত এরই মধ্যে ভরিয়ে ফেলেছে সারি-সারি আসনগুলো : রাগৎস এর রাজ্যপাল ধর্মাধিকরণের বিচারপতিরা, দুর্গের সমস্ত উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, শাসনব্যবস্থায় যাঁদেরই একটু প্রতাপ আছে তাঁদের সবাই, স্বজনবন্ধু, এবং তাদের সকলের শেষে ব্যাবসাবাণিজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মহিলাদের জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা ছিলো বসবার, সেখানে একটাও আসন শূন্য ছিলো না-ঝলমলে সাজপোশাকে সেখানে যেন প্রজাপতির হাট বসে গিয়েছিলো।

আর শহরের অন্য লোকেরা? তারা যেন উপচে পড়েছিলো চার্চ ছাপিয়ে, যে যেখানে পেরেছে কোনোরকমে কোনো আসনে বসে পড়েছিলো–কিন্তু তাছাড়াও কত লোক যে ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তারা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, সিঁড়িতে।

এই জমায়েতের যদি কয়েকজন লোকেরও মনে থেকে থাকে কিছুদিন আগে সে কোন তাজ্জব ভেলকির খেলা শহরটাতে আলোড়ন তুলেছিলা, তারা কি তবু ভাবতে পেরেছিলো যে ক্যাথিড্রালেও তার কোনো পুনরাবৃত্তি হবে? নিশ্চয়ই না, কারণ লোকে তখন ভেবেছিলো সে-সব পিশাচসিদ্ধ কারু কাজ, শয়তানের কোনো চেলার; সাধ্য কী যে সে ফের এই দিব্যভূমি চার্চে এসে কোনো গোল পাকায়? শয়তানের সব জারিজুরি কি চার্চের চৌকাঠেই খতম হয়ে যায় না!

গায়কদের সারির ডান দিক থেকে এসেছেন প্রধান যাজক, এবং তারপর তার সহযোগীরা–পদমর্যাদা অনুযায়ী পর-পর, সব-শেষে শিশুগায়কদের দল।

যা-কিছু মহিমা আছে আনুষ্ঠানিক খ্রিষ্টযাগের কিছু বাদ যায়নি, আবারও নতুন করে উঁচু পর্দায় বেজেছে কিরিয়ে ইলাইসন আর গ্লোরিয়া।

তারপর যেই ঘণ্টা বেজেছে সুগম্ভীর, আস্ত জমায়েৎ উঠে দাঁড়িয়েছে, যাজক গেয়ে শুনিয়েছেন মথি লিখিত সুসমাচার; তারপর প্রধানযাজক, মার্ক আর মাইরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সরাসরি ভাবগম্ভীর ভঙ্গিতে, তাদের উদ্দেশ করে তার কথা বলেছেন। তার গলা তেমন জোরালো ছিলো না। পকেশ লোলচর্ম কোনো বৃদ্ধের গলা সেটা, কিন্তু যা বলেছেন তা এমন সহজসরল ও শাদাসিধে যে তা যেন সরাসরি গিয়ে মাইরার অন্তর স্পর্শ

করেছিলো। তিনি গুণকীর্তন করেছেন তার সম্ভ্রান্ত বংশের, বলেছেন বংশানুক্রমিকভাবে কীভাবে এই পরিবার আর্ত ও দুঃস্থের সেবা করে এসেছে। তিনি আশীর্বাদ করেছেন এই বিবাহবন্ধনকে–যা কোনো ফরাশির সঙ্গে কোনো হাঙ্গেরীয়কে বাঁধবে আত্মীয়তার সূত্রে, তারপর প্রার্থনা করেছেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

মার্ক আর মাইরা তাদের আসন ছেড়ে উঠে বেদির পইঠার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর, চুম্বন করেছে পরস্পরকে, চুম্বন করেছে খ্রিষ্টের নৈশভোজের রুটি রাখার রেকাবিকে, তারপর আর ফিরে এসে বসেছে যে যার আসনে। মাইরাকে এমন ঝলমলে সুন্দরী–না, এর আগে আর-কখনোই দেখায়নি, আর সেই রূপকে ঘিরে যেন জ্যোতির্বলয়ের মতো ছটা ছড়াচ্ছিলো কোনো সুখস্বপ্ন।

প্রধানযাজক তারপর তার দুজন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন মার্ক আর মাইরার দিকে।

সব স্তব্ধ তখন, আর তারই মধ্যে শোনা গেছে তার কম্পিত, দুর্বল কণ্ঠস্বর : মার্ক ভিদাল, তুমি কি মাইরা রডারিখকে তোমার বৈধ পত্নী রূপে গ্রহণ করতে রাজি আছো?

হ্যাঁ।

মাইরা রডারিখ, তুমি কি মার্ক ভিদালকে তোমার বৈধ পতি রূপে গ্রহণ করতে রাজি আছো?

হ্যাঁ। মাইরার গলাটা যেন স্নিগ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস।

আধ্যাত্মিক সংস্কারের প্রথাবিহিত কথাগুলো বলবার আগে প্রধানযাজক মার্কের কাছ থেকে বিয়ের আংটি দুটো নিয়ে তাদের আশিস করেছেন, তারপর একটু ঝুঁকে নববধুর অনামিকায় পরাতে গেছেন সেই আংটি...

আর অমনি... অমনি সারা চার্চ কাঁপিয়ে শোনা গেছে এক আর্তনাদ, দারুণ দুঃখে ফেটে-পড়া।

আর আমি যা তখন নিজের চোখে দেখেছি, আরো হাজার জনও তা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখেছে। যাজকের সহকারীদের কেউ যেন ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে, টালমাটাল হটিয়ে দিচ্ছে–যেন ভয়ংকর কোনো শক্তি হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে কোন অন্ধকার থেকে; প্রধানযাজক-তার ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছে-তার মুখে নিদারুণ যাতনার ছাপ, চোখে দুর্নিবার আতঙ্ক–যেন কোনো অদৃশ্য পিশাচের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে শেষটায় দুমড়ে পড়ে গেছেন হাঁটু মুড়ে...

তারপরেই, বিদ্যুৎবেগে, চকিতের মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটে গেলো, কেউ যে গিয়ে বাধা দেবে তারও যেন অবসর হয়নি, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে সবাই, যেন চোখের সামনে যা ঘটে যাচ্ছে তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বুঝতেও পারছে না। আদপেই : কেউ যেন শূন্য থেকে আছাড় মেরে ছুঁড়ে ফেলেছে মার্ক আর মাইরাকে, ঐ বেদির সামনেটায়.....

তারপর কুলুঙ্গির ওপর দিকে শূন্যে ছুটেছে আংটি দুটো, একটা আবার আমার নাকে প্রচণ্ড একটা ঘুষির মতো পড়েছে...

আর সেই মুহূর্তে আমি শুনেছি, এবং আমার সঙ্গে-সঙ্গে সমবেত হাজার জনেও শুনেছে, কার যেন চোয়াড়ে ভয়ংকর গলা থেকে বিকট চীৎকারে বেরিয়ে আসছে এই কথা ক-টি-সে-কার গলা, তা আমরা সবাই জানি, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর গলা :

অভিশপ্ত হোক নবদম্পতি-অভিশপ্ত!

যেন লণ্ডভণ্ড ঘরের মধ্যেই চীৎকার করে সে এই অভিশাপ দিচ্ছে; আর এই অভিশাপের সঙ্গে-সঙ্গে যেন কাছেই, জনতার মধ্য থেকে, প্রচণ্ড আতঙ্কের ধ্বনি উঠেছে। তারপরেই এক নিদারুণ আওয়াজ! এক বুকভাঙা আর্তনাদ! মাইরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিলো মেঝে থেকে, এক বুকফাটা চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়েছে আতঙ্কিত মার্কের দু-বাহুর মাঝে!

.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ক্যাথিড্রালে যে-অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা ঘটেছে, রডারিখ-ভবনে যে-আজব ঘটনা ঘটেছিলো, দুয়েরই উদ্দেশ্য ছিলো এক। তাদের উৎসও ছিলো এক। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, শুধু ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই এই তুলকালাম হুলুস্থুলের জন্যে দায়ী। হাতসাফাই? ম্যাজিক? জাদুবিদ্যা? ভেলকির খেলা?... এর উত্তর হবে একটাই : না। ক্যাথিড্রালে কেলেঙ্কারি বা মুকুট নিয়ে মোক্ষম মার–কোনোটাকেই নিছক কারু হাতের কৌশল বলা যাবে না। মামুলি ম্যাজিক কখনও এমনতর হয় না।

এই জার্মানটি নিশ্চয়ই তার বাবার কাছ থেকে কোনো গোপন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পেয়েছে, হয়তো আবিষ্কার করেছে এমন-কোনো সূত্র বা সংকেত, যার মারফৎ সে নিজেকে ইচ্ছেমতো অদৃশ্য করে ফেলতে পারে।... আর, তা, অসম্ভবই বা হবে কেন? ...এমন-কতগুলো রশ্মি তত থাকতেই পারে যা অনচ্ছ-কিছুর মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে, যেন সেগুলো স্বভাবস্বচ্ছ কোনো পদার্থ?... কিন্তু না, আমার ভাবনারা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।... অদৃশ্য মানুষ! বাজে কথা! আজগুবি! এমন-একটা আজগুবি, যে কাউকে সে-কথা বললেই সে ভাববে যে এ-সব আজব কাণ্ড দেখে আমার মাথাটাই, বুঝি বিগড়ে গেছে!

মাইরাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি; তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়েছে তার বিছানায়, কিন্তু সমস্ত সেবাযত্নই ব্যর্থ হয়েছে, সে পড়ে থেকেছে হতচেতন, অবশাঙ্গ, ডাক্তার রডারিখের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তার আর জ্ঞান

ফেরেনি। অথচ তার নিশ্বাস পড়ছে কিন্তু, সে এখনও বেঁচেই আছে। আমার বরং এই ভেবেই অবাক লাগছে যে পর-পর এতসব বিপর্যয়ের পরেও, বিশেষত ক্যাথিড্রালের এই কেলেঙ্কারির পরেও, সে-যে মরে যায়নি, এটাই বরং ভারি আশ্চর্য।

ডাক্তার রডারিখের বিস্তর বন্ধু ও সহব্যবসায়ীরা তাকে সাহায্য করবার জন্যে তক্ষুনি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাইরার বিছানাটা ঘিরে চারপাশে দাঁড়িয়ে থেকেছেন তারা : সে পড়ে আছে অনড়, নিশ্চল, নিমীলিতনয়ন, মুখটা যেন মোমের মতো রক্তহীন, হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত স্পন্দনের তালে-তালে ক্ষীণভাবে বুকটা উঠছে-নামছে, নিশ্বাস পড়ছে ক্ষীণ-অতি মৃদু-দীর্ঘশ্বাসের মতো–যা থেকে প্রতিমুহূর্তেই কেউ যেন নিংড়ে বার করে দিচ্ছে প্রাণশক্তি!

মার্ক তার পাশেই আছে, তার হাত ধরে। কাঁদছে সে, ধরাগলায় বারেবারে ডেকেছে তাকে : মাইরা, চোখ মেল, তাকিয়ে দ্যাখ, এই-যে, আমি তোর মা?

মাইরার মুদিতনয়ন মুদিতই থেকেছে। কারু ডাকই যেন সে শুনতে পায়নি।

চিকিৎসকেরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন, একবার মনেও হয়েছিলো–এই বুঝি জ্ঞান ফিরে এলো... অস্ফুট স্বরে কী যেন বলেছিলো সে বিড়বিড় করে, এমনই জড়ানো ছিলো কথাগুলো যে কিছুই বোঝা যায়নি, তার আঙুলগুলো থরথর করে একটু কেঁপেছে মার্কের মুঠোয়, তার চোখের পাতা বুঝি একটুখানি খুলেছে। কিন্তু কী-যে ফাঁকা দৃষ্টি ঐ আয়ো নিমীলিত নয়নে, কী-যে অদ্ভুত-কাঁপা নীরব অর্থহীন দৃষ্টি!

মার্ক বুঝি বুঝতে পেরেছে কী সেটা! হঠাৎ সে চমকে পেছিয়ে এসে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে :

পাগল! পাগল! একেবারে পাগলের দৃষ্টি।

মার্কের দিকে ছুটে গিয়েছি আমি, ভেবেছি এও কি আবার নিজের মাথাটা খেয়ে বসেছে নাকি? এ-ঘরে ডাক্তারেরা একটা বিষম সংকট নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন–এমন এক সংকট যে মাইরার জীবনটাই এখন বিষম সংশয়ে আছে। সেখানে মার্কের এই আর্ত ডুকরানি! তাকে তক্ষুনি পাশের একটা ঘরে নিয়ে যেতে হলো।

কীভাবে শেষ হবে এই পালার? শোচনীয়? বিয়োগান্ত? আমরা কি দুঃসাহসে ভর করে এই আশাটা করতে পারবো যে মাইরা আবার তার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পাবে; যে, সেবাযত্ন শেষটায় তার বুদ্ধিভ্রংশতা সারিয়ে তুলবে; যে, এ নেহাৎই একটা সাময়িক উন্মত্ততা?

একবার কাপ্তেন হারালান আমাদের সঙ্গে একটু একা হতেই বলেছে :যে-করেই। হোক এই পৈশাচিক ব্যাপারটায় একটা ইতি টানতে হবে!

ইতি টানতে হবে? কী বলতে চাচ্ছে সে? যে, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ফের রাগৎস ফিরে এসেছে; যে, সে-ই এই অনাচারের জন্যে দায়ী; যে, আমাদের মধ্যে এ নিয়ে এখন আর-কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে আমরা পাবো কোথায়? কেমন করে পাকড়াবো ধরাছোঁয়ার-বাইরেকার এই মানুষটাকে?

আর গোটা শহরটার ওপরই বা এই ভ্রষ্টাচারের প্রভাব কী হয়েছে? লোকে কি এ-সব ব্যাপারের কোনো সাধারণ-না, সাধারণ নয়, তবে স্বাভাবিক–ব্যাখ্যা মেনে নেবে? আমরা তো আর ফ্রাসে নেই এখানে, যেখানে হয়তো এ-সব ব্যাপার হাসিঠাট্টার বিষয় হয়ে উঠতো, হাসির গান গেয়ে যেখানে লোকে একে বিদ্রূপ করতো। এই দেশে–হাঙ্গেরিতে–সব বিষয়ই তো অন্যরকম।

মাগিয়ারদের মধ্যে যে অলৌকিকের প্রতি একটু বিশেষ প্রীতি আছে, সেটা তো আমি আগেই বলেছি। তাদের কুসংস্কার–বিশেষত অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে–প্রায় অনপনেয়। অত্যন্ত শিক্ষিত লোকদের হয়তো বোঝানো যেতে পারে যে এ-সব কোনো ভৌতবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নিক শাস্ত্রে বিশেষ-গবেষণালব্ধ জ্ঞান। কিন্তু যখন অনালোকিত মনের কথা ভাবা যায়, তখন পদার্থবিদ্যা নয়, অপবিদ্যাই প্রধান হয়ে ওঠে, সব হয়ে ওঠে শয়তানের চেলার কীর্তি, প্রেতসিদ্ধ পিশাচসিদ্ধ কারু কেরামতি, আর ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে তারা বীলজেবাবের চেলা নয়, খোদ শয়তানেরই প্রতিমূর্তি বলে ভাববে।

তাছাড়া রাগৎস-এর রাজ্যপাল যে-বিদেশীর বহিষ্কারের জন্যে ফরমান জারি করেছেন, সে-যে এই অসহ্য ও অপার্থিব ঘটনাগুলোর সঙ্গে সরাসরি জড়িত, এ-তথ্য আমরা এখন আর লুকোবো কী করে? এতদিন আমরা অনেক করে সযত্নে যে-সব ব্যাপার চাপা দিয়ে রেখেছি, সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালে এই বিষম কেলেঙ্কারির পর, সে-সব এখন আর অস্পষ্ট আবছায়ায় ঢেকে রাখা যাবে না।

পরদিন থেকে তুমুল এক হুলুস্থুলু উঠে গেলো শহরে। রডারিখ-ভবনে আগে যা যা হয়েছিলো, তার সঙ্গে এবার ক্যাথিড্রালের ঘটনাকে জড়িয়ে নিলে লোকে। লোকের মধ্যে

যে-শান্তসুস্থির ভাবটা নেমেছিলো, এবার তা নতুন শোরগোলে উবে গেলো। প্রত্যেক বাড়িতে, প্রতিটি পরিবারে, যখনই কেউ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর নাম করে, অমনি এ-সব বিদঘুঁটে উদ্ভট ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি জেগে ওঠে, অথবা যেন এই অদ্ভুত লোকটা-লোক? না পিশাচ?যে তার আস্ত জীবনটাই বুলভার তেকেলির ঐ হানাবাড়ির বদ্ধ জানালা আর স্তব্ধ দেয়ালের মধ্যে কাটিয়েছে, সবসময় সে যেন লোকের ঘাড়ে তার ফেস-ফোঁস নিশ্বাস ফ্যালে। কাজেই এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে সব ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর গোটা শহরের লোকজন গিয়ে ভিড় করেছে বুলভারে, তারা নিজেরাও বুঝিয়ে বলতে পারবে না সে-কোন্ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সেখানে।

এমনিভাবেই দলে-দলে লোক গিয়ে ভিড় করেছিলো প্রেমবার্গের কবরখানায়, সেখানে অবশ্য এই প্রেতসাধকের (?) বিজ্ঞানসাধকের (?) দেশবাসী আশা করেছিলো নিজের চোখে তাকিয়ে দেখবে কোনো অবিশ্বাস্য উদ্ভট ঘটনা-কোনো শত্রুতার ভাবই তাদের সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়নি। এখানে, ঠিক তার উলটো : তুলকালাম প্রকাশ পেয়েছে রি-রি ঘৃণা, প্রতিহিংসার বোধ–কোনো গণশত্রুর যা প্রাপ্য। আর এও ভুললে চলবে না ধর্মপ্রাণ লোকেরা ক্যাথিড্রালে এই কেলেঙ্কারি দেখে কী-সাংঘাতিক বিহ্বল হয়ে পড়েছে। এই অতি-উত্তেজনা শুধু যে বেড়েই চলবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই: বেশির ভাগ লোকই এই দুর্বোধ্য প্রহেলিকার কোনো স্বাভাবিক ব্যাখ্যা যে থাকতে পারে, তা বিশ্বাসই করবে না।

রাগৎস-এর রাজ্যপালকে আবার গোটা শহরের মনের ভাবটাকেও হিশেবে ধরতে হয়েছে; পরিস্থিতি যেমন-যেমন দাবি করবে, পুলিশ যেন তক্ষুনি তেমন-তেমন ব্যবস্থা নেয়–এই মর্মে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন মঁসিয় স্টেপার্ককে। লোকে ভয় পেয়ে যখন

দেয়ালে গিয়ে পিঠ ঠেকায়, তখন যে কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে তাকে শুধু সচেতন থাকলেই চলবে না, অবস্থাটা যাতে আয়ত্তের বাইরে চলে না-যায় তারও ব্যবস্থা করতে হবে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নামটা উচ্চারণ করতে যতক্ষণ সময় লাগে, তার মধ্যেই লোকে গিয়ে তছনছ করে আসতে পারে বুলভার তেকেলির ঐ বাড়ি–তারা লুঠতরাজ শুরু করতে পারে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাইতে পারে বাড়িটা–আর রাজ্যপাল হিশেবে তার দায়িত্ব কিছুতেই যাতে শহরের শান্তিশৃঙ্খলা ভেঙে না পড়ে সে বিষয়ে নজর রাখা। এদিকে আমি কিছুতেই মন থেকে আমার ধারণাগুলো তাড়াতে পারিনি, বরং সেগুলো যেন ক্রমেই দানা বাঁধছে। আগে যে-অনুমানটাকে উদ্ভট বলে ঝেড়ে ফেলেছিলুম, এখন সেই ধারণাটাকে নিয়েই গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি। আমি। যদি এই অনুমানটা নিছকই জল্পনা না-হয়, যদি কোনো লোক নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলবার কোনো সূত্র আয়ত্ত করে থাকে, তাহলে লোকের স্বস্তি যাবে, শান্তি যাবে, শহরটা একটা আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলার ডিপো হয়ে উঠবে। আমার মনে পড়ে গেছে প্লাতো-র প্রজাতন্ত্রর সেই কাহন, যেখানে গাইগেস নামে এক রাখাল এক দৈত্যের কবরখানায় এমন-একটা আংটি পেয়ে গিয়েছিলো, যেটা একটু বিশেষভাবে ঘোরালে সে অদৃশ্য হয়ে যেতো; সেটাকে কাজে খাঁটিয়েই সে রাজা কানদাউলের রাজসভায় গিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার সব ক্ষমতা দখল করে বসেছিলো। সেই গ্রীক উপকথাই যদি আজ সত্যি হয়ে যায়, তবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলে কারু আর-কিছু থাকবে না।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস রাগৎস-এ ফিরে এসেছে, অথচ কেউ তাকে চর্মচক্ষে দ্যাখেনি; সে-যে এখানে আছে-অথবা নেই–এটা কেউ কী করে বুঝবে, যদি তাকে চোখেই দেখা না-যায়! তাছাড়া, এই আবিষ্কারটা সম্ভবত তার বাবার, কিন্তু সে কি সূত্রটা গোপন রেখেছে নিজের কাছে? তার কাজের লোক হেরমানও কি ওভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?

অন্যরাও কি পারবে? নিজেদের সুবধের জন্যে–কিংবা ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকেই মদত দেবার জন্যে? ইচ্ছেমতো লোকের বাড়িতে তখন ঢুকে-পড়া যাবে–শুধু তা-ই নয়, অন্য লোকের জীবনকেও চালানো যাবে অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে। লোকের কি কোনো ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকবে তখন, কোনো আপন কথা? নিজের বাড়িতে শুয়ে বসেও কি কেউ নিশ্চিত হতে পারবে যে, ঘাড়ের ওপর থেকে কেউ তার ওপর সারাক্ষণ নজর রেখে যাচ্ছে না? শুনছে না সব মনের কথা? একেবারে ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে মিশে না-গেলে কে কী করছে না-করছে, তা সব ফাঁস হয়ে যাবে। আর রাস্তায়–সারাক্ষণ এই-যে ভয় কেউ-একজন অদৃশ্য পেছন-পেছন আসছে, যে তোমাকে কিছুতেই তোমাকে নজর থেকে সরে যেতে দেবে না, যে তোমাকে নিয়ে যা-খুশি তা-ই করতে পারবে, সে-ভয়টার বিরুদ্ধেই বা কেউ লড়বে কী করে? বেড়াল যখন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, তখন ইঁদুর তাকে দেখতে পায়–কিন্তু ভাবো এমন ইঁদুরের কথা, যে বেড়ালটাকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ বেড়ালটা সারাক্ষণই পাশে-পাশে আছে! কী করে লোকে আত্মরক্ষা করবে, অদৃশ্যের এই হামলার কাছ থেকে? তা কি কিছুদিনের মধ্যেই সমাজজীবনের সমূহ সর্বনাশ করে দেবে না?

তারপরেই আমার মনে পড়ে গেছে, কাপ্তেন হারালান আর আমি সেদিন গঞ্জের বাজারে কী দেখেছিলুম : একটা লোককে কে যেন (অদৃশ্য মানুষ?) ভীষণ জোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। এখন তো আর সন্দেহ নেই যে সে-যে অদৃশ্য হামলার কথা বলেছিলো, সেটা ঠিকই বলেছিলো। সত্যিই তাকে কেউ ধাক্কা দিয়েছিলো। কে সে? ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, নাকি হেরমান, না কি অন্য-কেউ!

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আরো-সব খুঁটিনাটি ভিড় করে এসেছে আমার স্মৃতিতে। ক্যাথিড্রালের গা থেকে উপড়ে ছিঁড়ে-ফেলা সেই বিজ্ঞপ্তি, আর বুলভার তেকেলিতে আমরা যখন খানাতল্লাশ চালাচ্ছি, সেই-যে বিভিন্ন ঘরে আমরা পায়ের আওয়াজ শুনেছি, সেই-যে শিশিটা ছোঁবার আগেইপড়ে গিয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। হা-হা, আর-কোনো সন্দেহই নেই : উনপাঁজুরে হতচ্ছাড়াটা সেখানেই ছিলো তখন, হয়তো তার হেরমানও ছিলো তার সঙ্গে। আমরা যে ভেবেছিলুম সে শহর ছেড়ে চম্পট দিয়েছে, সেটা ভুল ভেবেছিলুম। কেননা শুধু তাতেই ব্যাখ্যা করা যায় গামলার মধ্যে সাবানজল, রান্নাঘরের উনুনে জ্বলন্ত অঙ্গার। ... হা-হা, তারা দুজনেই অদৃশ্য থেকে মজা দেখাচ্ছিলো, যখন আমরা পাঁতিপাঁতি করে খুঁজছিলুম বাগান, লন, উঠোন, বাড়ির মধ্যেটা। যদি বিয়ের মুকুটটা সেদিন মিনারের পাখির বাসায় আমরা পেয়ে থাকি, তবে তা শুধু এইজন্যেই যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এই অতর্কিত হামলায় তখন আর সময়ই পায়নি সেটাকে নিয়ে চলে যাবার। আর, আমি তো এও জানি, যখন ডরোথি জাহাজে করে দানিউব দিয়ে আসছিলুম তখন যে-সব রহস্যময় ঘটনা ঘটেছিলো, আজও সে-সবের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। যে-যাত্রীকে ভেবেছিলুম তীরে নেমে গেছে, সে তবে পাশেই ছিলো আমাদের, অথচ কেউই তাকে দেখতে পায়নি।

কাজেই, নিজেকে আমি বারেবারে ভজিয়েছি, সে জানে কেমন করে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়। ইচ্ছেমতো সে আবির্ভূত হতে পারে, কিংবা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, যেন সে জাদুদণ্ড হাতে কোনো ওস্তাদ জাদুগর, তবে সে যদিও যে পোশাক পড়ে আছে তাকে অদৃশ্য করে দিতে পারে, হাতে-ধরা কোনোকিছু কিন্তু সে এখনও হাওয়া করে দিতে পারে না–দেখেছি তো কী করে কুচিকুচি করে ছিঁড়েছিলো বিয়ের হলফনামা,

ফুলের ঐ তোড়া, কী করে সকলের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বিয়ের মুকুট, কিংবা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মেরেছিলো বিয়ের আংটিগুলো, ক্যাথিড্রালে।

অথচ এ-কোনো ভেলকিবাজি নয়, নয় কোনো গুহ্য মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপার, নয় কোনো বাজিকরের চিচিংফাঁক, অথবা পিশাচসাধনা। বাস্তব তথ্যগুলো কী, সেগুলোই বরং খতিয়ে দেখা যাক। ভিলহেল্ম স্টোরিংস নিশ্চয়ই এমন-কোনো রাসায়নিকের সূত্র জেনেছে, যা পান করলেই অদৃশ্য হয়ে-যাওয়া যায়... কোন-সে রাসায়নিক পানীয়? নিশ্চয়ই ঐ শিশির মধ্যে যা ছিলো, যেটা ভেঙে-যাবামাত্র ভাপ হয়ে উঠে গিয়েছিলো। কোন সূত্র, কোন ফর্মুলা ব্যবহার করে এই রাসায়নিক পানীয় বানায়, তা আমরা এখনও জানি না–কিন্তু সেটা আমাদের এক্ষুনি জানা উচিত; যদিও-খুবই-সম্ভব যে সেটা আমরা কোনোদিনই জানতে পাবো না!...।

আর খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস? এখন যখন সে অদৃশ্য মানুষ, তাকে পাকড়ানো কি একেবারেই অসম্ভব? সে দৃষ্টির অগোচর হতে পারে, কিন্তু স্পর্শেরও কি অগোচর? ধরাছোঁয়ার বাইরে? যে-ত্রিরায়তনিক কাঠামো থাকে মানুষের, সেই তিনটি আয়তন তো আর সে হারায়নি-হারায়নি তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ। এখনও সে আছে তার ঐ শরীর নিয়ে, রক্তমাংসে-সশরীর। অদৃশ্য বটে, তবে স্পর্শাতীত নয়। সে হয়তো ভূতপ্রেতপিশাচের বেলায় খাটে, কিন্তু আমরা তো আর কোনো ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার করছি না! যদি কোনো সুযোগে একবার পাকড়ে ফেলা যায় তার ঠ্যাং, কিংবা হাতদুটোই, কিংবা যদি বাছাধনের মাথাটাই চেপে-ধরা যায়, অন্তত আমরা তার গায়ে প্রাণপণে লেপটে থাকতে পারবো তো! আর যতই চমকপ্রদ কারসাজি সে জানুক না কেন, কোনো জেলখানার দেয়াল ফুঁড়ে বেরুবে সে কী করে!

আমি তো কেবল ভেবেছিই কথাগুলো, মোটামুটি গ্রাহ্য করার মতোই অনুমান, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি যা-হলে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু পরিস্থিতি তাই বলে কম গুরুতর নয়, একটা বদখত অবস্থায় বেশামাল আছি আমরা, গোটা নিরাপত্তারই গেছে! এখন থেকে শুধু এক ভয়াবহ বিপদের মধ্যেই থাকতে হবে আমাদের। আর-ককখনো আমরা নিজেদের নিরাপদ বলে ভাবতে পারবো না-না-ঘরে, না-বাইরে, দিনে বা রাত্রে কখনোই নয়। কোথায় কোন ঘরে একটু মৃদু আওয়াজ উঠলো, মেঝের নড়বোড়ে কাঠ কাঁচকেঁচ করে উঠলো, হাওয়ায় নড়ে গেলো জানলার খড়খড়ি, কিংবা জোরে ঘুরপাক খেলো ছাতের ওপর হাওয়ামোরগ, কানে শুনতে পেলুম ঝিঁঝির ডাক, দরজার ফোকর দিয়ে বয়ে গেলো শোঁ-শোঁ হাওয়া–আর অমনি আমরা আঁৎকে উঠবো। সারা পৃথিবীটাই যেন সন্দেহে গিজগিজ করছে। প্রতিদিনকার জীবনযাপন, খাবার সময়ে টেবিল, সন্ধের সময় আড্ডা, রাত্তিরবেলায় ঘুম–যদি ধরেও নেয়া যায় মনের এই তীব্র অশান্তির মধ্যে ঘুম সম্ভবআমরা কিছুতেই নিঃসন্দেহ হয়ে জানতে পাবো না কোনো অনাহুত আগন্তুক আছে কি না বাড়ির মধ্যে, জানতে পারবো না ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অথবা তার কোনো অনুচর সারাক্ষণ নজর রেখে যাচ্ছে কি না–আমরা কী করছি, কী বলছি, কী মৎলব আঁটছি–সব জেনে ফেলছে কি না, এমনকী ঢুকে পড়েছে কি না দেরাজে, যেখানে লুকোনো আছে গোটা-কয়েক পারিবারিক কঙ্কাল, গোপন-সব কাশুন্দি।

এই জার্মান হয়তো রাগস ছেড়ে এতক্ষণে প্রেমবার্গেই চলে গিয়েছে। কিন্তু ডাক্তার রডারিখ ও কাপ্তেন হারালান, স্বয়ং রাজ্যপাল ও পুলিশের বড়োকর্তা–সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এটাই বুঝেছি, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যে আরো-কিছু জঘন্য মৎলব এঁটে বসে সেগুলো করবে বলে সারাক্ষণ তাকে-তাকে বসে নেই, এটা কী করে জানা যাবে?

রাজ্যপাল যখন বিয়ের অনুমোদন দিয়েছিলেন, তখন যে সে কোনো বিদঘুঁটে কাণ্ড করে বসেনি, সে-তো নিশ্চয়ই এই কারণেই যে সে তখনও প্রেমবার্গ থেকে ফিরে আসেনি। কিন্তু বিয়ের আসল অনুষ্ঠানটায় সে বিচ্ছিরি নাটুকেপনা করে বাগড়া দিয়েছে। মাইরা যদি সেরেও যায়, সে কি আবারও বিয়েটা ভণ্ডুল করে দিতে চাইবে না? ডাক্তার রডারিখের প্রতি যে-বিজাতীয় ঘৃণা সে প্রকাশ করেছে, সে-তো আর তার কোনো হার্দ্য পরিবর্তনে মৈত্রীতে বদলে যায়নি–সে বরং আরো-কোনো নারকীয় মৎলব হয়তো এঁটে বসে আছে, যাতে ডাক্তারের জীবনটাই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে? যে-বাজখাঁই গলায় সেদিন সে অভিসম্পাত দিয়েছে ক্যাথিড্রালে, তা-ই কি বোঝায় না যে সে একটা হেস্তনেস্ত না-করে ছাড়বে না? না-না, ব্যাপারটা আদপেই এখনও শেষ হয়ে যায়নি, আর যখন মনে পড়ে যায় প্রতিশোধ নেবার জন্যে যে কী-আশ্চর্য সুযোগ আছে তার দখলে, তখন যে-কোনোকিছু থেকেই নতুন-কোনো আপদ এসে হাজির হতে পারে! ডাক্তার রডারিখের বাড়িতে যদিও চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা আছে এখন–তবু তার পক্ষে ভেতরে ঢুকে যেতে অসুবিধে কোথায়? আর একবার ভেতরে যেতে পারলে সে-যে কী করবে, তা স্বয়ং বীলজেবাবও জানে কি না সন্দেহ।

এই থেকেই বোঝা যাবে আতঙ্কটা কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। কুসংস্কারে বিশ্বাস করলে তো কথাই নেই, কিন্তু তথ্যে আস্থা রেখেও কি কেউ আশঙ্কা থেকে রেহাই পাবে? তাছাড়া, সত্যি-তো, তাকে ঠেকাবার উপায়টাই বা কী? কীসে মুশকিল আসান? আমি তো কবুলই করছি যে আমার মাথায় কোনো ফন্দি আসছে না। মার্ক আর মাইরা যদি এখান থেকে চলেও যায় তাতেও অবস্থার একচুলও তারতম্য হবে না। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস কি আর তাদের সহজেই অনুসরণ করে যেতে পারবে না? তাছাড়া, মাইরার শরীরের এখন যে-হাল, তাতে রাগৎস ছেড়ে চলে যাবার কোনো কথাই ওঠে না!

আর কোনখানেই বা আছে সে এখন, আমাদের এই বেপরোয়া ও অধরা দুশমন? যদি-না পর-পর এ-সব বিদঘুঁটে ঘটনা ঘটে যেতো, আঘাতের পর আঘাত হেনে, তাহলে হয়তো কারু পক্ষেই এটা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব হতো না যে সে এখনও তাদের মধ্যেই আছে, অসহ স্পর্ধায় দম্ভে সে যাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, আতঙ্কে যাদের সে প্রায় জবুথবু ও অকর্মণ্য করে তুলতে পারে!

এ-সব ঘটনার প্রথমটা আমাদের হতচকিত দশাকে যেন নিরাশার শেষসীমায় নিয়ে গিয়েছিলো। সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালের ঐ বিপর্যয়ের পর দু-দুটো দিন কেটে গিয়েছে অথচ মাইরা বেচারির অবস্থার কোনোই উন্নতি হয়নি–এখনও তার সুস্থবুদ্ধি ফিরে আসেনি, এখনও সে শুয়ে আছে বিছানায়, এখনও জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দুলছে তার প্রাণ।

চৌঠা জুন, মধ্যাহ্নভোজনের পর, রডারিখ পরিবারের সবাই,-তার মধ্যে মার্কও আছে, আমিও আছি,-বসে আছি গ্যালারিতে, উত্তেজিতভাবে আলোচনা করছি কীভাবে এই বীলজেবাবের চেলাকে জব্দ করা যায়, এমন সময়ে সত্যিকার একটা পৈশাচিক হাসির রক্তজল-করা দমকা উঠলো ঘরের ভেতর।

আঁৎকে, ধড়মড় করে, যে যার আসন থেকে উঠে পড়েছি আমরা। মার্ক আর কাপ্তেন হারালান যেন ঘোরের মধ্যেই তেড়ে গিয়েছে গ্যালারির যেদিক থেকে এই অট্টহাসির তুবড়ি ফেটে পড়েছে, কিন্তু কয়েক পা গিয়েই তারা থমকে থেমে গিয়েছে।

সবকিছুই ঘটে গেছে মাত্রই দুটি মুহূর্তে। ঐ দুই মুহূর্তের মধ্যেই আমি দেখেছি। আলো ঝিকিয়ে উঠেছে রক্তলোলুপ একটা ছুরির দ্রুতধাবমান ফলায়; দেখেছি মার্ক টালমাটাল থুবড়ে পড়বার আগেই দুই বাহুর মধ্যে তাকে ধরে ফেলেছে কাপ্তেন হারালান...

আমি ছুটে গিয়েছি তাদের সাহায্যে, আর সেই মুহূর্তে একটা বাজখাই রুক্ষ কর্কশ স্বর– সেই গলাটা এতদিনে আমরা সবাই চিনে ফেলেছি-দুর্ধর্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বলে উঠেছে : মাইরা রডারিখ ককখনো মার্ক ভিদালের বউ হবে না! ককখনো না!

তারপরেই এক প্রচণ্ড দমকা হাওয়ার ঝাঁপটায় থরথর করে কেঁপে উঠেছে ঝাড়লণ্ঠনগুলো, বাগানে যাবার দরজাটা দুম করে খুলে গিয়েই বন্দুকের গুলির মতো আওয়াজ করে আবার বন্ধ হয়ে গেছে, আর আমরা আবারও হাত কামড়াতে-কামড়াতেই বুঝি উপলব্ধি করেছি যে আমাদের এই অপ্রশম্য দুশমন ফের আমাদের নাগাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে!

একটা ডিভানের ওপর এনে মার্ককে তারপর শুইয়েছি আমরা, ডাক্তার রডারিখ মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন জখমটা। ভাগ্যি ভালো, ছোরাটা বেশি গভীরে বেঁধেনি! বাম কাঁধের হাড়ের ওপর দিয়ে হড়কে গিয়েছিলা, শুধু লম্বা একটা কাটা দাগ, যদিও দেখাচ্ছে রাগি-লাল, তেমন গুরুতর নয় আসলে, কয়েকদিনেই সেরে যাবে। এবার হয়তো আততায়ী তাড়াহুড়োয় লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি, কিন্তু পরের বার কি সে আবারও ফসকাবে?

মার্ককে কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর হোটেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমি গিয়ে বসে রইলুম তার বিছানার পাশে, আর সেখানে যে তার ওপর শুধুই নজর রেখেছি তা নয়, মনে-মনে

সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করেছি সমস্যাটা নিয়ে। বুদ্ধির খেলায় এই শয়তানকে যদি হারানো না-যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত কত জনকে প্রাণ দিয়ে তার প্রতিহিংসার বলি হতে হবে?

এটা কবুল করা ভালো যে আমি যেদিক দিয়ে তদন্ত করলে ব্যাপারটার মীমাংসা করা যাবে বলে ভেবেছিলুম, সেদিকে কিছু করার আগেই অন্য-সব অপঘটনা এসে ব্যাপারটাকে আরো-জটিল করে তুলেছে। খুব-একটা পিলেচমকানো নাটুকে যদি-বা নাও হয়, এই অপঘটনাগুলো সত্যি ভারি কিম্ভুতকিমাকার আর অসংলগ্ন ও অপ্রত্যাশিত ছিলো। অবশ্য সবকিছুই তো ছিলো অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত। কিন্তু তাদের নিয়ে ভাবতে হবে অনেক, শুধু বিহ্বল হয়ে বসে থাকলেই চলবে না।

সেই দিনই–সেই চৌঠা জুনের-সন্ধেবেলায়, দারুণ জোরালো একটা আলো দেখা গিয়েছিলো অনেক দূর থেকে, ঘণ্টাঘরের সবচেয়ে উঁচু জানলাটা থেকে আলোর ছটা পড়েছিলো সন্ধ্যার আকাশে। যেন একটা জ্বলন্ত মশাল উঠছে আর নামছে, এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে, যেন কোনো গুণ্ডা এসে বিদ্বেষবশে কোনো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে চাচ্ছে।

পুলিশের বড়োকর্তা স্বয়ং তার সঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে হুড়মুড় করে উঠে পড়েছিলেন ঘণ্টাঘরে। আলোটা ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে, আর মঁসিয় স্টেপার্ক যেমন ভেবে বসেছিলেন, তাই-ই ঠিক হয়েছে : কাউকেই আর অকুস্থলে পাওয়া যায়নি। মেঝের ওপর পড়েছিলো একটা নিবে-যাওয়া মশাল, তা থেকে রজনের গন্ধ বেরুচ্ছে-যে-লোকটা আগুন ধরাতে এসেছিলো, তার কোনো পাত্তাই নেই কোথাও।

হয় সেই লোকটা-তর্কের খাতিরে না-হয় ধরেই নেয়া যাক যে খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই সে-পিঠটান দেবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, অথবা সেখানেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে, ঐ ঘণ্টাঘরেরই কোথাও, এবং তাকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

চকে যে-জনতা এসে জমায়েৎ হয়েছিলো, তাদের প্রতিহিংসার জিগির নিষ্ফল হ

লোবরং সে-সব দেখেশুনে বদমায়েশটার নিশ্চয়ই হাসিই পাচ্ছিলো।

পরদিন, সকালবেলায়, অধোন্মত্ত শহরের উদ্দেশে ছুঁড়ে মারা হলো আত্মম্ভরিতার আরো-সব জমকালো নিদর্শন।

সবেমাত্র তখন সাড়ে-দশটার প্রহর বেজেছে, এমন সময় ঢং-ঢং করে বেজে উঠেছে গা-শিউরে-তোলা ভয়ংকর ঘণ্টার শব্দ ঢং ঢং ঢং, যেন কারু অন্ত্যেষ্টির ঘোষণা, যেন আতঙ্কেরই কোনো বাদনধ্বনি।

কোনো-একজন লোকের পক্ষে এমনভাবে ক্যাথিড্রালের ঘণ্টাগুলো পর-পর ঢং ঢং করে বাজানো সম্ভব হতো না। ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের নিশ্চয়ই আরো-সব স্যাঙাৎ ছিলো সঙ্গে–আর অনেক কেউ যদি নাও হয়, তার কাজের লোক হেরমান তো ছিলোই।

শহরের লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো সন্ত মিখায়েলের চকে, ছুটে এসেছিলো শহরের দূর-দূর কোণা থেকে, এই পারলৌকিক বাদনধ্বনি যেন বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলো সারা শহরে। আবারও একবার দলবল নিয়ে অকুস্থলে ছুটে গিয়েছেন মঁসিয় স্টেপার্ক। উত্তরমিনারের ঘোরানো সিঁড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছেন তারা, ছুটে ছুটে

উঠেছেন সিঁড়ি বেয়ে, ঢুকেছেন সেই ঘরটার যেখানে পর-পর সব ঘণ্টাগুলো বসানো, স্কাইলাইটগুলো দিয়ে আলো এসে ঘরটাকে ফটফটে দিনের আলোয় যেন ধুয়ে যাচ্ছিলো...

কিন্তু মিথ্যেই তারা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন ঘরটা, খুঁজেছেন ওপরের গ্যালারিটা... কেউ নেই! কেউ-না!... পুলিশ যখন গিয়ে ঘরটায় পৌঁছেছে, তখন ঘণ্টাগুলো এমনকী দুলছিলোও না, স্তব্ধ পড়ে ছিলো পর-পর... অদৃশ্য ঘণ্টাবাজিয়েরা যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে সে-ঘর থেকে।

.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

তাহলে, আমি যা ভয় করেছিলুম, তা-ই হয়েছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মোটেই রাগৎস ছেড়ে চলে যায়নি, আর ডাক্তার রডারিখদের বাড়িতেও সে দিব্বি অনায়াসেই ঢুকে পড়েছিলো। এটা ঠিক যে, সে লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। কিন্তু সেটা তো আর ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কোনো গ্যারান্টি হতে পারে না। একবার সে যা করবার চেষ্টা করেছে, আবারও সে তা-ই করবে, আর পরের বার হয়তো সে মোটেই তাগ ফসকাবে না। কাজেই সেই দুরাচারের কাছ থেকে আবারও কোনো আঘাত আসার আগেই আমাদের প্রতিরোধব্যবস্থাটাকে অটুট করে তুলতে হবে।

কী-যে করা যায়, সেটা ঠিক করে নিতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। যাদের-যাদের সে হুমকি দিয়েছে, তাদের সব্বাইকে একজায়গায় জড়ো করে এমন একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল তাদের চারপাশে তুলে দিতে হবে, যাতে কারু পক্ষেই তাদের ধারে-কাছে ঘেঁসা সম্ভব না-হয়। কী করে সেটা করা যায়, সেটাই গোড়ায় ভেবে দেখতে হবে।

ছয়ই জুন সকালবেলায়, হামলা হবার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই, মার্ককে সরিয়ে ফেলা হলো রডারিখ-ভবনে, মাইরা যে-ঘরে আছে ঠিক তার পাশের ঘরটাতেই। ভাগ্যিশ মার্কের কাঁধের জখমটা তেমন গুরুতর হয়নি–এর মধ্যেই সেটা শুকোতে শুরু করেছিলো, রক্তপাতও এমন-কিছু হয়নি যে খুব দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রথমে মার্কের একটা ব্যবস্থা করবার পরই আমি আমার পরিকল্পনাটা ডাক্তার রডারিখকে খুলে বলেছি, আর সব শুনে তিনি সেটা পুরোপুরি অনুমোদনও করেছেন। আমার হাতে প্রায় সব দায়িত্বই

ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার রডারিখ, তার মতে আমিই নাকি আক্রান্ত দুর্গের প্রধান সেনাধিপতি।

এবং তৎক্ষণাৎ আমি সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। মার্ক আর মাইরার পাহারায় শুধু একজন কাজের লোককে রেখে–সেই ঝুঁকিটা আমাকে নিতেই হয়েছে!গোড়ায় আমি খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি বাড়ির চারপাশ। অবশ্য পুরো বাড়িটা সরেজমিন তদন্ত করে দেখতে সকলেই আমায় সাহায্য করেছেন, মায় কাপ্তেন হারালান ও মাদাম রডারিখ শুদু। আমার নির্দেশেই তিনি মাইরার শয্যার পাশ থেকে উঠে এসেছিলেন।

আমরা শুরু করেছিলুম ওপর থেকে। কনুইতে কনুই ঠেকিয়ে, আমরা চিলেকোঠার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। তারপর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখেছি সবগুলো ঘর; কোনো কোনাখামচি, কোনো কুলুঙ্গি, কোনো ফাঁকফোকর–কিছু বাদ দিইনি–মানুষ তো দূরের কথা কোনো নেংটি ইঁদুরও ও-সব ফাঁকফোকরে লুকিয়ে থাকতে পারতো না। পর্দা তুলে দেখেছি আমরা, চেয়ারগুলো জায়গাবদল করেছি অনবরত, খাটের তলায় ঢুকে গিয়ে দেখেছি, দেরাজের মধ্যেও হাড়েছি, আর একবারও, এক মুহূর্তের জন্যেও, পরস্পরের স্পর্শচ্যুত হইনি আমরা, কনুইতে কনুই ঠেকিয়ে পাশাপাশি থেকেছি। একেকটা করে ঘর দেখা সাঙ্গ হয়েছে, আমরা দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়েছি–এবং চাবিটা আমি আমারই পকেটে রেখেছি।

এতে দু-ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছে আমাদের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা সুষ্ঠুভাবেই সমাধা হয়েছে, আর এই করে-করে গিয়ে পৌঁছেছি বহির্দ্বারে, নিশ্চিত হয়েছি, সুনিশ্চিত, বস্তুপৃথিবীতে যতটা নিশ্চিত হওয়া যায় ততটাই, যে, কোনো বহিরাগত এসে বাড়ির মধ্যে

গা-ঢাকা দিয়ে নেই! তারপর বাইরের দরজার কবাট এঁটে কুলুপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, হুড়কোও, তারপর তালা বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা আমিই পকেটে রেখেছি। এখন আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউই হুট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে না। আর আমি নিজেকে পইপই করে বলেছি, সবসময় তোমাকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে, আঁরি, যাতে চেনা লোককে ভেতরে ঢুকতে দেবার সময় লুকিয়ে, অদৃশ্য হয়ে, কেউই ভেতরে অনধিকার প্রবেশ করতে না-পারে।

আর সেই মুহূর্ত থেকে, কেউ এসে দরজা ধাক্কালে বা কড়া নাড়লে, আমি, শুধু আমি একাই দরজা খুলে দিয়েছি। এই দ্বারপালের কাজ করার সময় হয় আমার সঙ্গে থেকেছে কাপ্তেন হারালান, অথবা কাজের লোকদের কেউ, যাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। । বাট শুধু একটুখানি ভোলা হতো, আর পাল্লা সরালে যতটা ফাঁক হতো তাতে। গিয়ে আমি নিজে দাঁড়াতুম, আমার সঙ্গী থাকতো আমার পেছনেই। অভ্যাগতকে কি ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে? যদি হয়, তবে তিনজনে গায়ে গা ঠেকিয়ে, পায়ে-পায়ে পেছিয়ে এসেছি আমরা, আর দরজাটা ফের বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সন্তর্পণে, সাবধানে। অর্থাৎ এখন নিশ্চয়ই রডারিখ-ভবন একটা সত্যিকার দুর্গই হয়ে উঠেছে, সুরক্ষিত ও নিরাপদ।

জানি-জানি, আমার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সে-কোন আপত্তি তোলা হবে! দুর্গ তো নয়, যেন এক বন্দীশালা! তবে সাময়িক বন্দিত্ব সওয়া যায়, অন্তত জীবননাশের চাইতে তো সেটা ভালো। আর আমরা তো আর যাবজ্জীবন বন্দী থাকবো না এভাবে, এই দশা বেশিদিন থাকবে না বলেই আমার আশা। কেননা ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর গুপ্ত রহস্যটার পুরোপুরি মীমাংসা করে না-ফেললেও আমি ব্যাপারটা সমাধান করার দিকে খানিকটা

অন্তত এগিয়েছি বৈ কি! সেটা, না-হয় নিরেস ঠেকলেও, তত্ত্বকথা বলে মনে হলেও, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক।

যখন কোনো ত্রিশিরা কাঁচের ফলার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো ঝলমল করে ওঠে, তখন সে সাত-সাতটা রঙে ভেঙে পড়ে যায়, যেগুলোর মিশোল থেকেই জ্বলে ওঠে শাদা আলো। এই রঙগুলো-বেগুনি, নীল, আশমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল বেনীআসহকলা]-তৈরি করে দেয় সৌরবর্ণালি।

কিন্তু দৃশ্যমান এই বর্ণচ্ছটা হয়তো গোটা বর্ণালির নিছকই একটা অংশমাত্র ছাড়া আর-কিছু নয়। অন্য কোনো-কোনো রঙও থাকতে পারে, যেগুলো নেত্রপটের অগোচর; এই-যে এখনও-অজানা সব রশ্মি, তাদের হয়তো এমন-সব বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো আমাদের জানা সৌররশ্মির চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পুরোপুরি আলাদা। আমাদের চেনা সৌর বর্ণালি অনেক নিরেট জিনিশের মধ্য দিয়েই চলে যেতে পারে–যেমন, কাঁচ–আর তা যদি হয়, তবে এই অজানা রশ্মিগুলো সমস্ত নিরেট জিনিশের মধ্য দিয়েই বা চলে যেতে পারবে না কেন? [অঁরি ভিদাল এই পাণ্ডুলিপি লেখার পর অবলোহিত বা রঙ্গপূর্ব ও বেগনিপারের আলো অন্তত অনেকটাই মঁসিয় ভিদালের এই অনুমানকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে।-জুল ভের্ন-এর টীকা] সত্যি-যদি তা হয়, তাহলে খালি চোখে দেখে সেগুলো কিছুই বোঝা যাবে না–আমাদের নেত্রপট মোটেই এ-সব রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হয় না-যদি অবশ্য আমরা ধরে নিই যে এমন-সব রশ্মি আছে।

আর এটা হতেই পারে যে, এমনতর বিশিষ্টিতাসংবলিত রশ্মিগুলোকে অটো স্টোরিৎস একদিন আবিষ্কার করে বসেছিলেন; তিনি কোনো রাসায়নিকেরও একটা সূত্র পেয়ে

গিয়েছিলেন, যেটা কোনো সজীব বস্তুর মধ্যে সংক্রমিত করা হলে, দুটো বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়-উপরিতল দিয়ে পুরো পরিণাহ বা পরিকাঠামোতেই তখন সে ছড়িয়ে যায়, আর সৌরবর্ণালির মধ্যে বিভিন্ন রশ্মির স্বভাব বা প্রকৃতিকেও আমূল বদলে ফ্যালে।

আর এই অনুমানটা মেনে নিলেই শুধু সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আলো, কোনো অনচ্ছ বস্তুর উপরিতলে পৌঁছুবার পর এই রাসায়নিক পদার্থে ভরপুর হয়ে যায়, আলাদা আলাদা হয়ে যায় বর্ণচ্ছটাগুলো, আর যে-সব রশ্মি তাদের রচনা করে তারা নির্বিচারে রূপান্তরিত হয়ে যায় এইসব অন্যান্য স্বতঃপ্রভ এখনও-অগোচর রশ্মিতে, যার অস্তিত্ব আছে বলেই আমি ধরে নিয়েছি। এইসব রশ্মি তখন বস্তুর নিরেট জমির মধ্য দিয়ে অনায়াসেই বয়ে যাবে। তারপর, তারা যখন উৎসারিত হবে, তারা আবার একটা বিপরীত রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে যাবে, ফিরে পেয়ে যাবে তাদের নিজস্ব মৌলরূপ আর এমনভাবে আমাদের নেত্রপটের ওপর প্রভাব ফেলবে যেন ঐ অনচ্ছ বস্তুর কোনো অস্তিত্বই নেই।

সন্দেহ নেই, কতগুলো বিষয় তবু অস্পষ্টই থেকে যাচ্ছে। কেমন করে এটা ব্যাখ্যা করবো যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে যেমন খালি চোখে দেখা যায় না তেমনি তার পোশাকআশাকও দেখা যায় না, অথচ যা-কিছু সে হাতে ধরে থাকে, তা তখনও দৃশ্যমান থেকে যায়? আর কী সেই রাসায়নিক যেটা এমন আশ্চর্য প্রভাব ফেলতে পারে, যার মধ্যে সে ঢুকে পড়ে, তারই ওপর? সেটা আমার জানা নেই, আর এতে আমার বেশ মনখারাপই হয়ে গেছে, কারণ তাহলে আমি নিজের ওপর সেটা ব্যবহার করে আমাদের এই শত্রুর সঙ্গে সমানে-সমানে যুঝতে পারতাম। তবে, শেষ অব্দি, হয়তো, এই বাড়তি সুবিধেটুকু ছাড়াই বুদ্ধির খেলায় দুশমনকে কুপোকাৎ করে দেয়া যাবে।

অবস্থাটা উভয়সংকটের মতো : এই অজানা রাসায়নিকটা যা-ই হোক না কেন, তার প্রভাব হয় তাৎক্ষণিক হবে, আর নয়তো, চিরস্থায়ী। প্রথমটাই যদি সত্যি হয়, ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে তাহলে হয়তো নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট মাত্রায় এই রাসায়নিক নিজের শরীরে ঢোকাতে হয়–পান করে, অথবা পুঁই কুঁড়ে। তার প্রভাবটা যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে প্রতিষেধক কোনো ওষুধ দিয়ে, ঠিক উলটো-কোনো রাসায়নিক দিয়ে তাকে আগের রাসায়নিকের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হয়, কেননা এমন-অনেক পরিস্থিতি আসবে যখন অদৃশ্য-হওয়াটা সুবিধে হওয়ার বদলে বরং অসুবিধেই হয়ে উঠবে। দুটোর মধ্যে যেটাই সত্য হোক না কেন, সে নিশ্চয়ই বাধ্য হবে আগে থেকেই বেশি পরিমাণে ঐ রাসায়নিক মজুত করে রাখতে, কেননা যে-পরিমাণ রাসায়নিক সে সবসময় পকেটে রাখতে পারবে তা তো আর তেমন-বেশি হবে না।

এদিকটার তো একটা না-হয় যেমন-তেমন ব্যাখ্যা হলো, কিন্তু চার্চে গিয়ে ঐ ঢং ঢঙা ঢং ঘণ্টা বাজানোই বা কেন, কিংবা মশাল জ্বেলে আলার ছটা ক্ষিপ্রবেগে নাড়ানোই বা কেন? কী মানে হতে পারে এর? কী-রকম খাপছাড়া, উদ্ভট, অসংলগ্ন বলে মনে হয় তাদের– তখনই আমার তা মনে হয়েছে। এ থেকে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে, এ-সব অর্থহীন কাণ্ড করে নিছকই বারফট্টাই করেছে, জাঁক দেখিয়েছে? না কি তার মাথাটাই বিগড়ে যেতে বসেছে!

এমন-সব সাত-পাঁচ ভাবনা নিয়েই আমি মঁসিয় স্টেপার্কের খোঁজে বেরিয়েছি। তাকে আমি আমার মনের কথা খুলে বলেছি, আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক হয়েছে যে বুলভার তেকেলির বাড়িটার ওপর আরো-কড়া নজরদারি দরকার-সেজন্যে দরকার হলে সেনাবাহিনীরও সাহায্য নেয়া হবে। এমনভাবে পাহারা বসাতে হবে, গায়ে গা ঠেকিয়ে

সারি সারি সেপাই বা পল্টন, যাতে বাড়ির মালিকের পক্ষে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ভেতরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। সে অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্ষমতা ধরে বটে, কিন্তু শরীরটা তো রক্তমাংসের! তাতে সে যেমন তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে পাবে না, তেমনি তার গোপন ভাড়ারও তার নাগালের বাইরে থেকে যাবে। আর বিপাকে পড়ে তখন তাকে আগেই তোক বা ক-দিন পরেই হোক, আবার ঐ মানুষী চেহারাই নিতে হবে, অথবা অদৃশ্য মানুষ হিশেবেই চিরটা কাল কাটিয়ে দিতে হবে–আর সেটাই তখন হয়ে উঠবে তার আকিলিসের গোড়ালি, তার দুর্বলতা। আর তার যে ক্রমেই মাথাখারাপ হয়ে যাচ্ছে, এই অনুমানটা যদি ভিত্তিহীন না-হয়, তবে এইসব বাধাবিপত্তিদুর্বিপাক তাকে বাধ্য করবে রাস্তায়-রাস্তায় ঘরছাড়া দিকহারা ঘুরে বেড়াতে, এবং মাথাটা তখন আরো যাবে।

মঁসিয় স্টেপার্ক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন বটে, আমাকে কিন্তু তার সঙ্গে যেতে বলেননি। তাহলে কি তিনিও কোনো ফন্দি এঁটেছেন, কোনো রণকৌশল ঠিক করেছেন, যা থেকে–তার ধারণা–আমি তাঁকে বিরত করবার চেষ্টা করবো? তিনি কি সেই অসম্ভবেরই প্রত্যাশা করে আছেন যে আচমকা একসময় তার সঙ্গে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এর মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে? প্রেমবার্গে যাকে খবর আনতে পাঠিয়েছিলেন, তার ফিরে-আসার অপেক্ষা করছেন কি? ভাবছেন কি যে সে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর পাকা খবর এনে দেবে, বলবে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে? আমি নিশ্চয়ই তাকে টেনে ধরে রাখতুম না। বরং তার সঙ্গেই যেতুম, এই সমাজবিরোধকে পাকড়াবার ব্যাপারে তাকে বরং সাহায্যই করতুম। কিন্তু সে-রকম কিছু হবার সম্ভাবনা আছে কি-মুখোমুখি দেখা হবার? নিশ্চয়ই না। রাগৎস-এ তো নয়ই, অন্যকোথাওও নয়।

এগারো জুন সন্ধেবেলায় মার্কের সঙ্গে আমার একটা দীর্ঘ শলাপরামর্শ হয়েছে। ভারি কাতর হয়ে পড়েছে মার্ক, বিহ্বল; আগের চাইতেও অনেক-বেশি; আমার তো ভয়ই হচ্ছিলো পাছে সে কঠিন-কোনো অসুখ বাধিয়ে বসে। তাকে যদি এই শহরটা থেকেই সরিয়ে দেয়া যেতো, ফ্রাসে যদি নিয়ে যাওয়া যেতো, তবে ভালো হতো; কিন্তু আমি এও জানতুম সে কিছুতেই এই মুহূর্তে মাইরার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে না। আচ্ছা, গোটা রডারিখ পরিবারকেই যদি কিছুদিনের জন্যে রাগৎস থেকে অন্য-কোথাও নিয়ে-যাওয়া যায়? এটাও কি বিবেচনা করে দেখার মতো একটা প্রস্তাব নয়? আচ্ছা, পরে একসময় স্বয়ং ডাক্তারের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপ করে দেখতে হবে।

সেদিন, মার্কের সঙ্গে নানা কথাবার্তার পর, আমি বলেছি :শোন, মার্ক, দেখতে পাচ্ছি তুই একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছিস। এটা কিন্তু তুই ভুল করছিস, মার্ক। মাইরার তো আর জীবনসংশয় নয়–সব ডাক্তারই বলেছেন, এ-যাত্রায় সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। আর যদি তার যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধিভ্রংশ বা মতিভ্রম হয়ে থাকে, তবে সেও নিতান্তই সাময়িক। বিশ্বাস কর আমায়–এটা কোনো মিথ্যে স্তোক নয়। আবার তার চৈতন্য ফিরে আসবে, কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসবে, আবার সে আগেকার মাইরা হয়ে উঠবে, নিজেই নিজের মতো।

তুমি চাচ্ছো আমি যাতে আশা ছেড়ে না-দিই, মার্কের গলাটা বুঝি ধরে এসেছে। কিন্তু বেচারি যদি আবার বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে পায়, তখনও কি সে ঐ রাক্ষসটার দয়ার ওপর নির্ভর করবে না? তোমার কি ধারণা ঐ দুবৃত্তটা এ-যাবৎ যা অপকীর্তি করেছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে? যদি সে তার প্রতিহিংসাটাকে আরো-বহুদূরে টেনে নিয়ে যেতে চায়? ... যদি,

চায়?... বুঝতে পারছো, অঁরি, আমি কী বলতে চাচ্ছি? সে-তো যা-খুশি তা-ই করতে পারে, আমরা তাকে ঠেকাবো কেমন করে?

না, না, মার্ক, তক্ষুনি আমি সজোরে আপত্তি জানিয়েছি, তার সঙ্গে যোঝা যাবে–মোটেই অসম্ভব নয় তা

কিন্তু কেমন করে? মার্ক বুঝি ডুবন্ত মানুষের মতো নিছক একটা খড়কুটোই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। কীভাবে?-না, অঁরি, তুমি সত্যি যা ভাবছো তা কিন্তু মোটেই খুলে বলছে না। না, এই পিশাচটার কাছে আমরা অসহায়, প্রতিরোধহীন! তাকে এড়াবার * উপায় তো একটাই : যাবজ্জীবন একটা দুর্গে বন্দী হয়ে থাকা। আর তারপরেও আমরা জানি না কখনও কোনো ফাঁক পেয়ে এই দুর্ভেদ্য দুর্গেও সে ঢুকে পড়বে কি না?

মার্কের উত্তেজনা আর হতাশা আমার যেন দম আটকে দিয়েছে। সে কেবল নিজের কথাই শুনছে, আর-কারু কথা কানেই নিচ্ছে না। আমার হাত দুটি চেপে ধরে সে আবার বলেছে :

কে বলবে এখানে আমরা দুজনেই শুধু আছি কি না! আমি এ-ঘর থেকে ও ঘর যাই, ড্রয়িংরুমে যাই, গ্যালারিতে যাই, আর সবসময় মনে-মনে বলি, ঐ নিশ্চয়ই সে আসছে আমার পেছন-পেছন! সবসময় কেউ যেন আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটছে! অথচ সে আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই, কেবলই নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে... যেই তাকে চেপে ধরতে যাই, অমনি সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, এড়িয়ে যায় আমাকে...

ধরা গলায় আর্তভাবে ভাঙা-ভাঙা কথা বলতে-বলতে সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে ছুটে বেরিয়েছে মার্ক, যেন কাউকে তাড়া করে যাবার চেষ্টা করেছে। কিছুতেই তাকে আর শান্ত করা যাচ্ছে না, কোনো সান্ত্বনাই কাজ দিচ্ছে না। সবচেয়ে ভালো হয়, ওকে যদি এখান থেকে দূরে-কোথাও নিয়ে যাই, দূরে, অনেক দূরে!

কে জানে, বলেই চলেছে সে ছেঁড়া-ছেঁড়া কথাগুলো, আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি সব সে আড়ি পেতে শুনেছে কি না! আমরা ভাবছি, বেশ আছি, সে অনেক দূরে আছে। কিন্তু সে-যে এখানে, এই মুহূর্তে এখানে, নেই তা কে বলতে পারবে?-ঐ তো! দরজার ওপাশে আমি তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি! ঐ যে, ওখানে!... কই? যাও, পাকড়াও গিয়ে ওকে, পেড়ে ফ্যালো!... কিন্তু পারবে কি তুমি কখনও?...এ কি আদৌ সম্ভব?... এই পিশাচ-তার মাথায় এখন মরণ ভর করেছে!...।

আমার ছোটোভাইটির অবস্থা এখন এমনই শোচনীয় দশায় গিয়ে পৌঁছেছে! আমি কি আগেই এই আশঙ্কা করিনি যে বিষম সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়লে মাইরার মতো তারও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবে! অটো স্টোরিৎস যদি দুর্দান্ত বৈজ্ঞানিকই হবেন, তবে তার কি এমন অভিশপ্ত কোনো রাসায়নিক আবিষ্কার না-করলেই চলছিলো না? কেন এমন একটা হাতিয়ার এমন লোকের হাতে তুলে দিয়েছেন যার ধাতটাই স্বভাবদুর্বৃত্তের, বিপথগামী! বৈজ্ঞানিকেরা তো দার্শনিকও হন–তাঁরা কী বুঝতে পারেন না কোন আবিষ্কারে কী হয়?

শহরের হালচালও মোটেই ভালো না। যদিও সেই ক্যাথিড্রালের ঘণ্টাবাদনের পর আর-কোনো ঘটনাই শহরের লোকজনকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়নি, তবু শহরটা যেন ধুকছে, ভয়েই আধমরা। সকলের বাড়িই যেন হানাবাড়ি হয়ে উঠেছে, যেন অদৃশ্য-কেউ এসে

ভর করেছে বাড়িটায়। অদৃশ্যের উপস্থিতি! কী দুর্দান্ত পরিহাস! ক্যাথিড্রালে ঐ ঘটনা ঘটার পর জিশুর শরণ নিয়েও যেন আর-কারু পার নেই। কর্তৃপক্ষ মিথ্যেই চেষ্টা করছেন শহরের সন্ত্রস্ত মানুষজনকে আশ্বস্ত করতে-মিথ্যেই, কেননা এই আতঙ্ককে ঠেকাবার সাধ্য যেন কিছুরই নেই! একটা নজির দিলেই বোঝা যাবে, শহরের মনোবল কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

বারোই জুন সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম পুলিশের বড়োেকর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো বলে। সন্ত মিখায়েলের চক থেকে যখন মাত্র দুশো গজ দূরে পৌঁছেছি, দেখি কাপ্তেন হারালান। তাকে দেখেই আমি বলেছি : আমি মঁসিয় স্টেপার্কের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সঙ্গে আসতে চাও, কাপ্তেন? কোনো উত্তর না দিয়ে একটা কলের পুতুলের মতো সে আমাকে অনুসরণ করেছে। আমরা যেই একটা চকের কাছে পৌঁছেছি, অমনি কানে এসেছে তুলকালাম আতঙ্কের ধ্বনি।

একটা ঘোড়ায়টানা ডাকের গাড়ি জোরকদমে ছুটে আসছিলো রাস্তা দিয়ে, দিগ্বিদিকহারা, রাশ না-টানা; পথচারী যে যেদিকে পারে ডানে-বাঁয়ে ছিটকে পড়েছে। দেখে মনে হয়েছে, কোনো কোচোয়ানই নেই গাড়িতে, ঘোড়াগুলো নিজেরাই ছুটেছে, চালকবিহীন! হয়তো চালক কোথাও টাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গিয়েছে রাস্তায়। কিন্তু তার ফলে যা হয়েছে, তাকে কি চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায়? ঐ পাগলা ঘোড়াদেরই মতোই জনাকয়েক পথচারীর মাথায় একটা পোকা যেন কুটুস করে কামড়েছে–তাদের মনে হয়েছে কোনো অদৃশ্য কোচোয়ানই বুঝি গাড়িটা চালাচ্ছে! খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎসই বসেছে চালকের আসনে! আর্ত চীৎকার ছিঁড়েছে আকাশ বাতাস : ঐ সে! খোদ লুসিফার! শয়তানটা নিজেই! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!

আমি ঘাড় ফিরিয়ে কাপ্তেন হারালানকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, দেখি সে তখন আর পেছনে নেই, সোজা সে ছুটেছে পাঁই-পাই কোচগাড়ির দিকে, সামনে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা সে থামাবে!

তখন বাজারহাটের সময়, রাস্তাঘাট ভর্তি লোকজনে, আর সবখান থেকেই ধ্বনি উঠছে : ভিলহেল্ম স্টোরিৎস! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস! পাগলা ঘোড়াগুলোকে তাগ করে ঢিল ছুঁড়েছে লোকে, মোড়ের মাথার পাহারাওলা তার গাদাবন্দুক ছুঁড়েছে একবার! হৈ হৈ রৈ রৈ বেশামাল অবস্থা!

একটা ঘোড়া থুবড়ে পড়েছে রাস্তায়, তার পায়ে গুলি লেগেছে! আর গাড়িটা, টালমাটাল, দু-বার পাক খেয়ে উলটে পড়েছে ঘোড়াটারই গায়ে। তক্ষুনি ক্রুদ্ধ জনতা ছুটে গেছে গাড়িটার দিকে, মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড ছত্রভঙ্গ, কেউ খুলেছে চাকা, কেউ মুগুর মেরেছে গাড়িতে, একজন খুলে নিয়েছে অক্ষদণ্ডটাই! একশো-জোড়া হাত নিশপিশ করে ছুটে গিয়েছে ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের টুটি টিপে ধরবে বলে!... বদলে, তারা শুধু আঁকড়ে ধরেছে শূন্যতাই!

তাহলে সেই অদৃশ্য চালক গাড়িটা ওলটাবার আগেই লাফিয়ে নেমে পালিয়ে গিয়েছে! কারণ, শহরের লোককে আবার একটা নতুন অপকর্ম করে সে-যে ঘাবড়ে দিতে চেয়েছিলো, এ নিয়ে লোকের মনে কোনো সন্দেহই ছিলো না। পরক্ষণেই অবশ্য জানা গেছে আসল ব্যাপারটা–অমন-কিছুই হয়নি! তক্ষুনি এসে হাজির এক চাষী, সে গাঁ থেকে তার ঘোড়ার গাড়িতে করে এসেছিলো গঞ্জে, এটা মোটেই ডাকের গাড়ি নয়, গাড়িটা

রাস্তায় রেখে সে একটা দোকানে গিয়ে ঢুকেছিলো, অমনি ঘোড়াগুলো উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়। একটা ঘোড়াকে চিৎপাত রক্তাপ্লুত হাড়গোড়ভাঙা পড়ে থাকতে দেখে সে তো রেগে কাই! লোকে তার কথা শুনলে তো! আমার মনে হচ্ছিলো এই কাণ্ডজ্ঞানহারানো জনতার ক্ষিপ্ত রোষের হাত থেকে এই চাষীরই বুঝি আর পরিত্রাণ নেই। অনেক কষ্ট করে সব্বাইকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তবে এই চাষীটিকে বাঁচিয়েছি আমরা!

কাপ্তেন হারালানকে আমি ডেকে নিয়ে গিয়েছি সঙ্গে, সেটু শব্দটি না-করেই আমার সঙ্গে গিয়েছে টাউনহলে। রাস্তায় কী হয়েছে, সেটা এর মধ্যেই জেনে গিয়েছিলেন সিয়। স্টেপার্ক। গোটা শহরটাই পাগল হয়ে গেছে,আমাকে তিনি আপশোশ করে বলেছেন, আর এ-পাগলামি যে শেষটায় কী করে বসবে, তা-ই কেউ জানে না।

আমি প্রথমেই পুরোনো প্রশ্নটা করে নিয়েছি। নতুন-কিছু খবর পেলেন?

হ্যাঁ, মঁসিয় স্টেপার্ক জানিয়েছেন, খবর পেয়েছি, ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে নাকি মেবার্গে দেখা গেছে।

স্প্রেমবার্গে! অস্ফুট স্বরে বলে উঠেছে কাপ্তেন হারালান। তারপর আমার দিকে ফিরে বলেছে : তাহলে চলুন! এক্ষুনি প্রেমবার্গ চলুন! আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন।

উত্তরে যে কী বলবো, তা আমি ভেবে পাইনি। কেননা আমি নিশ্চিত জানি খামকাই আমরা বুনোহাঁসের পেছনে তাড়া করে যাবো!

সবুর, কাপ্তেন, সবুর! মঁসিয় স্টেপার্কই তাকে থামিয়েছেন। খবরটা ঠিক কি না জানতে আমি মেবার্গে লোক পাঠিয়েছি। যে-কোনো মুহূর্তে সে এসে পড়বে।

আধঘণ্টাও কাটেনি, আর্দালি এসে একটা চিরকুট এনে দিয়েছে, দ্রুত ডাকের গাড়িতে স্পেমবার্গ থেকেই এসেছে সেটা। আগে যে-খবরটা এসেছিলো, তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি নেই। ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে আদপেই দেখা যায়নি ওখানে, বরং এটাই বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ আছে যে সে সম্ভবত রাগৎস ছেড়েই বেরোয়নি।

আরো দু-দিন কেটেছে, মাইরার অবস্থার কোনো বদল হয়নি। মার্ককে বরং আগের চাইতে একটু শান্ত দেখিয়েছে। আমি শুধু ফাঁক খুঁজেছি কখন ডাক্তার রডারিখের কাছে শহর ছেড়ে চলে যাবার কথাটা পাড়বো।

চোদ্দই জুন দিনটা কিন্তু আগের কয়েকদিনের মতো শান্ত ছিলো না। লোকের উত্তেজনা আর রোষ গিয়ে চরমে পৌঁছেছে, কর্তৃপক্ষ বুঝতে শুরু করেছেন এই উত্তেজনা প্রশমন করার ব্যাপারে তাঁরা কতটাই অক্ষম।

এগারোটা নাগাদ, আমি যখন দানিউবের তীর ধরে হাঁটছি, আমার কানে এই কথাগুলো এলো :

ফিরে এসেছে!... ফিরে এসেছে!

কে-যে ফিরে এসেছে, সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হবারই কথা নয়। তবু একজন পথচারীকে ডেকে আমি জিগেস করেছি কী ব্যাপার। তাতে সে বলেছে : তার বাড়ির

চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। অন্য-একজন অমনি গায়ে পড়ে বলেছে: মিনারের জানলায় তার ঐ অতি-বদখৎ বিশ্রী মুখটা দেখা গেছে।

এ-সব কথা বিশ্বাস করা ঠিক হবে কি না কে জানে। আমি নিজেই তখন হনহন করে গেছি বুলভার তেকেলির দিকে।

অমন বেপরোয়াভাবে কি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নিজেকে জাহির করবে? শুধু বেপরোয়াই নয়, একটু হাঁদার মতোই ঠেকেছে ব্যাপারটা। কেউ যদি তাকে একবার বাগে পায়, তবে তার যে কী দশা হবে সে কি তা জানে না? অকারণে সে অমনতর ঝুঁকি দেবে কেন? কেন তার অতিপরিচিতবিশ্রীমুখ সে দেখাতে দেবে তার বাড়ির জানলায়?

সত্য হোক, মিথ্যা হোক, খবরটার মাহাত্ম ছিলো। আমি গিয়ে দেখি, এর মধ্যেই কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়েছে সেখানে, পুলিশ বেষ্টনী বানিয়ে কর্ডন করে তাদের ঠেকাতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। শুধু-যে বাড়ির চারপাশেই, তা নয়। আশপাশের রাস্তাতেও ভিড় উপচে পড়ছে। আর বারেবারেই চীৎকার করে জিগির তুলছে : ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর কালো হাত-ভেঙে দাও, খুঁড়িয়ে দাও! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস–মুর্দাবাদ!

অযৌক্তিক কিন্তু অমোচনেয়–কী কারণ থাকতে পারে এই বিশ্বাসের পেছনে যে সে ওখানে আছে, সে, আর তার সঙ্গে আছে তারই অজস্র অদৃশ্য সাগরেদ? এই অভিশপ্ত বাড়িটার গায়ে যে উম্মাদ জনতা বাঁধভাঙা প্রস্রবণের মতো ভেঙে পড়েছে, এই উত্তাল জলতরঙ্গ রোধিবে কে? পারবে পুলিশ তাদের ঠেকাতে? আর ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি সেখানে থেকে থাকে, পারবে সে এই উম্মাদ জনতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে? আর

জানলায় যদি তাকে দেখা গিয়েই থাকে, সে তবে তখন মোটেই অদৃশ্য ছিলো, তার বস্তুচেহারাই দেখেছে লোকে। আবার অদৃশ্য হয়ে যাবার আগেই তো সে ধরা পড়ে যাবে, আর তাকে ছিঁড়ে খাবে জনতা।

কর্ডন সত্ত্বেও, মঁসিয় স্টেপার্কের অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও, রেলিঙগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, বাড়ির মধ্যে হামলে পড়েছে ভিড়, দরজা ভেঙেছে, চুরমার হয়ে গেছে জানলার কাঁচ, ভেতর থেকে আশবাব ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে উঠোনেলনে, ল্যাবরেটরির সব যন্ত্রপাতি চূর্ণবিচূর্ণ, পদদলিত। তারপর একতলা থেকে লেলিহান লোলজিহ্বা মেলে দিয়ে হাওয়া চেটেছে আগুন, তারপর পাকে-পাকে শিখা পেঁচিয়ে ধরেছে গোটা বাড়িটাই, আর হানাবাড়িটা থুবড়ে পড়েছে দাউদাউ আগুনে, হয়তো-বা জাহান্নামেরই আগুন সেটা।

আর ভিলহেল্ম স্টোরিৎস? মিথ্যেই লোকে তাকে হাড়ে বেরিয়েছে বাড়িটায়, বাগানে, উঠোনে। সে এ-সব জায়গার কোথাও নেই–অথবা এও বলা যায়, তাকে খুঁজে পাওয়া ছিলো অসম্ভব।

দশ জায়গা থেকে আগুনের জিভ লকলক চেটেছে বাড়িটাকে, আস্ত গিলে খেয়েছে, একঘণ্টা পরে পড়ে থেকেছে শুধু চারটে ভাঙাচোরা দগ্ধ দীর্ণ দেয়াল।

হয়তো বাড়িটা যে ধ্বংস হয়ে গেছে, সে একদিক থেকে ভালোই হলো। কে জানে, এতে রাগৎসের লোকের উত্তেজনার প্রশমন হলেও হতে পারে। তারা হয়তো ভেবে বসতে পারে যে হানাবাড়িটার সঙ্গে-সঙ্গে অভিশপ্ত ভিলহেল্ম স্টোরিৎসও ভস্মীভূত হয়ে গেছে–অদৃশ্যই হোক, আর দৃশ্যই হোক।

কিন্তু কোথায় তার ঐ ভস্মাবশেষ?

.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হানাবাড়িটা ধ্বংস হয়ে যাবার পর শহরের টগবগ উত্তেজনা একটু শান্ত হয়েছে, অন্তত লোকে এই ভেবে আশ্বাস পেয়েছে যে শয়তানের ডেরাটা ধ্বংস করে দেয়া গেছে বটে। অনেকে আবার এও ভেবে নিয়েছে যে এই পিশাচসিদ্ধ স্বয়ং ছিলো তখন বাড়িটায়, আর সেও ঐ বহ্নিমান চিতায় পুড়ে মরেছে। আসলে কিন্তু ছাইভস্ম তন্নতন্ন করে খুঁজেও এই বিশ্বাসের যাথার্থ্য আদৌ প্রমাণ করা যায়নি। বাড়িটা আক্রান্ত হবার সময় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি বাড়িতে থেকেও থাকে তবে সে এমন-কোথাও লুকিয়েছিলো আগুন অনেক খুঁজেও যেখানে তার সন্ধান পায়নি।

এদিকে, স্পেমবার্গ থেকে আরো চিঠি এসেছে, আর তাদের বয়ান অবিকল এক না-হলেও একটা বিষয়ে সবাই একমত : তাকে সেখানে দেখা যায়নি, তার স্যাঙাৎ হেরমানকেও সেখানে দেখা যায়নি, আর এরা দুজনে যে কোথায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে সে-বিষয়ে কারুই কোনো ধারণা নেই।

দুর্ভাগ্য এটাই যে শহরের উত্তেজনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও রডারিখ-ভবনে কিন্তু ঠিক তার উলটোটাই ঘটেছে। মাইরার মানসিক ভারসাম্যহীনতার কোনো হেরফের হয়নি। অচৈতন্য, সমস্ত সেবাযত্নে নিঃসাড়, সে এখনও কাউকে চিনতেই পারে না–শুধু ফ্যালফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এতদিনে ডাক্তাররা আর আশা দেখাবার মতো দুঃসাহস পাচ্ছেন না। তবে, যদিও অতিরিক্ত দুর্বল সে, তার জীবনের কোনো আশঙ্কা নেই। সে শুধু পড়ে আছে এলায়িত, আলুথালু, অনড়, মৃত্যুর মতো বিবর্ণ। যদি

কেউ তাকে তুলে ধরে বসাতে চায়, তার বুক থেকে বেরিয়ে আসে চাপা কান্না, চোখে ফুটে ওঠে সাতরাজ্যের আতঙ্ক, হাতদুটো অস্থির ওঠে-নামে, অসংলগ্ন সব কথা অস্ফুট বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। তবে কি তার স্মৃতি ফিরে আসছে ধীরে, অতি ধীরে? সে কি আবার মনে-মনে বেঁচে নিচ্ছে সেইসব দুঃসহ আতঙ্ক, সান্ধ্য-মজলিশের দৃশ্য, ক্যাথিড্রালের কেলেঙ্কারি? এখনও কি তার কানে বেজে যাচ্ছে তার আর মার্কের প্রতি উদ্দিষ্ট সেই ভয়ংকর অভিসম্পাত? হোক বিভীষিকা, তবু এও ভালো, যে তার মন অতীতের স্মৃতিকে রক্ষা করতে পেরেছে।

ভাবা কি যায়, কীভাবে বেঁচে আছে এই বাড়ির মানুষগুলো? মার্ক বাড়ি ছেড়ে এক পাও নড়ে না। ডাক্তার আর মাদাম রডারিখের সঙ্গে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মাইরার রোগশয্যার পাশে, রোগিণীকে নিজের হাতে দাওয়াই দেয় পথ্য খাওয়ায়, আর তার অস্থির চোখ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় মাইরার চোখে চৈতন্যের কোনো ছাপ ফুটে উঠছে কি না।

ষোলো তারিখের বিকেলবেলায় আমি একা-একাই এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়েছি রাগৎসের পথে-পথে, হঠাৎ মাথায় একটা ভাবনার উদয় হয়েছে : দানিউবের ডান তীরে–ওপারে–চলে গেলে কেমন হয়। অনেকদিনই ভেবেছি, একদিন যেতে হবে ওদিকটায়, কিন্তু এ-সব বিপর্যয়ের মধ্যে অ্যাদ্দিন একফোঁটাও ফুরসৎ পাইনি যে নিজের খেয়ালখুশি মতো বেড়াবো। তাছাড়া বেড়াবার আনন্দের প্রশ্ন অবশ্য এমন অবস্থায় ওঠেই না। তবু আমি এগিয়ে গেছি সেতুর দিকে, পেরিয়ে গেছি নদীর মাঝখানকার দ্বীপটা, শেষটায় এসে পা রেখেছি সারবিয়ার তীরে।

ভেবেছিলুম একটু বেড়িয়েই ফিরে আসবো, শেষে কিন্তু অনেকটাই সময় কেটে গেলো। সেতুর কাছে যখন ফিরে এসেছি, তখন সাড়ে-আটটার ঘণ্টা বেজেছে; নদীর পাড়েই একটা সারবিয় সরাইখানায় সেরে নিয়েছি ডিনার। জানি না মাথায় তখন কোন ভূত চেপেছিলো। সরাসরি ফিরে-যাবার বদলে, আমি শুধু সেতুটার প্রথম অর্ধেকটা পেরিয়েছি, তারপর নেমে গিয়েছি মস্ত সেই সড়কটা দিয়ে সোজা মাঝনদীর সেই দ্বীপটাতে।

দশ গজও গিয়েছি কি না সন্দেহ, আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছে মঁসিয় স্টেপার্কের। তার সঙ্গে আর কেউ ছিলো না; আমাকে দেখবামাত্র আমার কাছে এসে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন, এবং ঘুরে-ফিরে তো সেই একই কথা–ভিলহেল্ম স্টোরিৎস বিনা তো কোনো গীত নেই।

দুজনে মিলে হাঁটতে-হাঁটতেই আলোচনা করছিলুম। হয়তো বিশ মিনিটের বেশি হবে না, আমরা পৌঁছে গেছি দ্বীপটার উত্তরবিন্দুতে। সবে রাত নেমে এসেছে তখন, গাছপালার তলায় ফাঁকা পরিত্যক্ত রাস্তায় ছায়া ঘনিয়েছে। শ্যালেগুলো সব রুদ্ধদ্বার, পথে কারু সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়নি।

রাগৎস-এ ফিরে যাবার সময় হয়েছে। আমরা ফিরে আসতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ কতগুলো কথা আমার কানে পৌঁছুলো। তক্ষুনি আমি থমকে পড়েছি, মঁসিয় স্টেপার্কের হাতটা চেপে ধরে তাকেও থামিয়েছি। তারপর ঝুঁকে ফিশফিশ করে তার কানে-কানে বলেছি-যাতে আর-কেউ শুনতে না-পায়- ঐ শুনুন! কে যেন কথা বলছে... আর ঐ গলা–রুক্ষ, চেয়াড়ে... ঐ গলা তো ভিলহেল্ম স্টোরিসের!

তেমনি নিচু গলায় মঁসিয় স্টেপার্ক বলে উঠেছেন, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস!

হ্যাঁ ।

আমাদের ও দেখতে পায়নি!

না। রাত সবই সমান করে দেয়–আমাদেরও ওর মতোই অদৃশ্য করে দেয়।

গলাটা অস্পষ্টভাবে কানে আসছে–কিংবা বলা যায় গলাগুলো, কারণ অন্তত দুজন লোক নিশ্চয়ই আছে ঐ আবছায়ায়।

হুঁ... একা নয়, মঁসিয় স্টেপার্ক ফিশফিশ করে বলেছেন।

না... সম্ভবত ওর সেই কাজের লোক

মঁসিয় স্টেপার্ক আমাকে একরকম টেনেই নিয়ে গেছেন একটা গাছতলায়, মাটিতে গুড়ি মেরে বসে পড়েছেন। অন্ধকারকে ধন্যবাদ, হয়তো তার সৌজন্যে আমরা কোনোরকমে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আরো-একটু কাছে গিয়ে স্পষ্ট করে শুনতে পাবো এরা কী বলছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যেখানে আছে বলে আন্দাজ করেছি তার থেকে দশ-পা দুরে গিয়ে আমরা গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে আছি। তাদের আমরা দেখতেই পাইনি, দেখতে পাবো বলেও আশা করিনি-আর সেইজন্যেই নিরাশও বোধ করিনি। বরং কেমন যেন চনমনেই বোধ করেছি। তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবার পর থেকে আমাদের এই পহেলা

দুশমনটি যে কোথায় আছে আর কী-সব বদ মৎলব আঁটছে সেটা জানবার কোনো সুযোগই আমরা পাইনি। হয়তো আজ একে পাকড়াবারও একটা মওকা মিলে যাবে।

উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছি আমরা। আমরা যে ধারে-কাছেই কোথাও আছি, তা বোধহয় ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি। ডালপালার মাঝে গুঁড়ি মেরে, ঝুঁকে, শ্বাস ফেলবারও সাহস হচ্ছে না, আমরা অবর্ণনীয় মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে কান পেতে শুনছি কী-শলাপরামর্শ করছে তারা, কখনও স্পষ্ট কখনও একটু-বা অস্পষ্ট, কেননা প্রভুভৃত্য এই গাছপালার ফাঁকে পায়চারি করতে করতেই বলছিলো কথাবার্তা।

প্রথম যে-কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি, সেটা ভিলহেল্ম স্টোরিসের।আমরা কাল থেকে ওখানে যেতে পারবে তো?

কাল থেকে, বলেছে তার অদৃশ্য সহচর–সম্ভবত তার কাজের লোক হেরমান, আর আমরা যে কোথায় আছি তা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।

কখন তুমি রাগৎসে ফিরে গিয়েছিলো?

আজ সকালেই।

বেশ... আর ঐ বাড়িটা? ভাড়া নেয়া হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, বেনামে।

তুমি ঠিক জানো যে আমরা খোলাখুলিই থাকতে পারবো ওখানে? কেউ আমাদের চেনে না ঐ–

হতাশাটা কোন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করাই যায়। কী দুর্ভাগ্য! ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যখন শহরটার নাম বলেছে, কথা বলতে-বলতে সে দূরে চলে গিয়েছে আমাদের কাছ থেকে, শহরটার নাম আমরা শুনতেও পারিনি। তবে যতটুকু শুনেছি, তাতেই বোঝা গেছে আমাদের এই দুশমনটি আর খুব-একটা দেরি না-করেই যাতে দৃশ্যমান হয়ে-যাওয়া যায়, মানুষী রূপ ফিরে পায়, তার ওপরই নির্ভর করে আছে। এত তাড়া কীসের তার? কেনই-বা এ-রকম একটা ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে? তবে কি বেশিদিন অদৃশ্য থাকলে ঐ রাসায়নিকের প্রভাবে স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি হয়?

স্বরগুলো আবার যখন কাছে ফিরে এলো, হেরমান তখন কী-একটা কথা পেড়ে তারই জের টেনে বলে চলেছে যাব শেষটুকুই শুধু আমরা শুনতে পেয়েছি :ঐ ছদ্মনাম নিলে রাৎসের আহাম্মক পুলিশগুলো আমাদের কোনোদিনই খুঁজে বার করতে পারবে না।

রাগৎসের পুলিশ?... তার মানে হাঙ্গেরিরই কোথাও তারা থাকতে চাচ্ছে?

তারপর আবার তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলো। তার ফলেই মঁসিয় স্টেপার্ক প্রায় অশ্রুস্ট স্বরে বলতে পেরেছেন,কোন্ শহর? কী-সব ছদ্মনাম? প্রথমে আমাদের এই তথ্যগুলোই জেনে নিতে হবে-যে-করেই হোক।

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই পায়ের আওয়াজ কাছে এসে পড়েছে, আমাদের চেয়ে মাত্র কয়েক পা দূরে এসে তারা থেমেছে।

স্প্রেমবার্গে যাওয়া কি, জিগেস করেছে হেরমান, এতই জরুরি?

ভীষণ। কারণ টাকাকড়ি সব সেখানকারই ব্যাঙ্কে আছে। এখানেও আছে, তবে। এখানে ব্যাঙ্কের ধারে-কাছেও নিরাপদে যাওয়া যাবে না। আর ওখানে

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে রক্তমাংসের শরীরে গিয়ে সেখানে দেখা দেবেন?

অগত্যা। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী? চোখে না-দেখে কেউ তো আর ঝুলি থেকে কানাকড়িও বার করবে না।

তাহলে আমি যা ভেবেছিলুম, সেটাই ঘটেছে। স্টোরিৎস এখন এমন-একটা জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে অদৃশ্য হয়ে-থাকাটা তার পক্ষে আর মোটেই সুবিধেজনক। নয়। তার এখন টাকা চাই, আর সেইজন্যে এখন তাকে তার এই আশ্চর্য ক্ষমতাটাকে ত্যাগ করতে হবে। সে কিন্তু তখনও বলে চলেছে : সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো এটাই যে কী-যে করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ঐ আকাটগুলো গিয়ে আমার ল্যাবরেটরিটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে—দু-নম্বর সলিউশনের একটা শিশিও আর নেই। ভাগ্যিশ গাড়লগুলো বাগানের মধ্যকার গোপন জায়গাটা খুঁজে পায়নি, কিন্তু এখন তো সেটাও ঐ ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। সে-জায়গাটা গিয়ে তোমায় সাফ করে দিতে হবে।

যেমন বলবেন, তা-ই হবে, বলেছে হেরমান।

পরশু দশটা নাগাদ এসো। দিন বা রাত্রি–সবই তো সমান এখন আমাদের কাছে, তবে একটু স্পষ্ট দেখা যাবে, এই যা।

কেন? কাল নয় কেন?

কাল আমাকে অন্য-একটা কাজ করতে হবে। আবার একটা জম্পেশ গোছের তাকলাগানো কাণ্ডের ফন্দি এঁটেছি আমি–আর আমরা তো জানিই কে-সে এ-কাজটা খুব-একটা পছন্দ করবে না।

দুজনে আবার পায়চারি করতে-করতে দূরে চলে গিয়েছে। ফের যখন কাছে ফিরে এসেছে, তখন :

না, আমি রাগস ছেড়ে চলে যাবো না, কিছুতেই না, গররর করে উঠেছে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস। যতক্ষণ মাইরা আর ঐ ফরাশি ছোকরা এখানে থাকবে, পরিবারটাকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়বো। কী-যে ঘৃণা করি ওদের!

একটা যেন ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে, মানুষের ভাষার বদলে। তখন সে আমাদের একেবারে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো, হয়তো হাত বাড়ালেই তাকে পাকড়ে ফেলা যেতো তখন। কিন্তু আমাদের সমস্ত মনোযোগ তখন হেরমানের কথার ওপর গিয়ে পড়েছে :এখন রাগৎ-এ সব্বাই জানে যে আমরা ইচ্ছে করলেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি, কিন্তু কেমন করে, সেটা জানে না।

আর, সেটা তারা কোনোদিনই জানবেও না, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস ঘোষণা করেছে। রাগ্রৎস্ এখনও আমার শেষ দ্যাখেনি। ভেবেছে, আমার বাড়ি পুড়িয়ে ফেলে বুঝি আমার সব গোপন কথাই পুড়িয়ে ফেলেছে!–গাড়লের দল!... না, রাগৎ আমার প্রতিহিংসার হাত থেকে রেহাই পাবে না। এই শহরের একটা ইট, একটা পাথরও আমি আস্ত রাখবো না!

শহরের সর্বনাশ ঘটাবার সংকল্প যেখানে ঝনঝন করে বেজে উঠেছে, সেই কথাগুলো তখনও বোধহয় শেষ হয়নি, গাছপালাগুলো ভীষণভাবে নড়ে উঠেছে। মঁসিয় স্টেপার্ক আর নিজেকে সামলাতে না-পেরে বুনো মোষের মতো কণ্ঠস্বরগুলোর দিকে ছুটে গেছেন, চীৎকার করে বলে উঠেছেন, আমি একটাকে পাকড়েছি, ভিদাল! আপনি অন্যটাকে পাকড়ান!

তাঁর হাত, দৃশ্যমান না-হলেও, রক্তমাংসেরই কোনো শরীরের ওপর পড়েছে। কিন্তু তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিয়েছে কেউ, যে উলটে তিনিই চিৎপটাং পড়ে যাচ্ছিলেন, শুধু শেষ মুহূর্তে আমি তাকে আঁকড়ে ধরে ধাক্কার বেগটা কমিয়ে দিয়েছি।

আমি ভেবেছিলুম, আমরাই বেকায়দায় পড়েছি, আমরা তো আর আমাদের শত্রুদের দেখতে পাচ্ছি না–এরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি। বরং হো-হো করে আমাদের বামদিকে কেউ বিদ্রুপের সুরে অট্টহাসি হেসে উঠেছে, আর তারপরেই দূরে মিলিয়ে গেছে ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

শয়তানটাকে বাগে পেয়েও কাবু করতে পারিনি! আপশোশ করে চেঁচিয়ে উঠেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক। তবে একটা জিনিশ এখন আমরা নিঃসংশয়ে জেনে গিয়েছি –অদৃশ্য হয়েছে বলে এদের শরীর যে আঁকড়ে ধরতে পারবো না, তা নয়।

কিন্তু বরাৎটাই খারাপ, তারা তবু আমাদের হাত এড়িয়ে পিঠটান দিয়েছে, এবং কোথায় যে তাদের গা-ঢাকা দেবার আস্তানা, তার কোনো হদিশই আমাদের জানা নেই। তা সত্ত্বেও মঁসিয় স্টেপার্কের উৎফুল্লভাবটার কোনো কমতিই হয়নি।

এবার বাছাধনদের বাগে পেয়েছি, ফেরবার পথে নিচু গলায় কোনো গোপন কথা আমায় ফাঁস করে দেবার ভঙ্গিতে তিনি আমায় বলেছেন, শত্রুদের দুর্বল জায়গাটা আমরা জানি, জানি যে স্টোরিৎস তার ভাঙা বাড়িটায় পরশুদিন যাবে। তাতে আমরা দু-ভাবে তাকে কজা করতে পারবো। একটা ভেস্তে গেলেও অন্যটা সফল হবেই!

মঁসিয় স্টেপার্কের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আমি রডারিখ-ভবনেই ফিরে গিয়েছি। সেখানে, মাদাম রডারিখ আর মার্ক যখন মাইরার শুশ্রূষা করবার জন্যে রোগিণীর ঘরেই থেকে গেছে, আমি ডাক্তার রডারিখের সঙ্গে একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে তাকে খুলে বলেছি এইমাত্র দ্বীপে কী হয়েছে।

ডাক্তারের মনে হয়েছে ভিলহেল্ম স্টেরিৎস যেভাবে হুমকি দিয়েছে, গোটা রাগৎস সমেত রডারিখ পরিবারের ওপর যেভাবে বদলা নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে আছে, তাতে বোধহয় সবাইকে নিয়ে রাস ছেড়ে চলে যাওয়াই মঙ্গল। এবার এখান থেকে পালাতে হবে সবাইকে, এবং পালাতে হবে গোপনে–যত শিগগির পারা যায়, ততই ভালো।

আমিও আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, আমি তার প্রস্তাবে সায় দিয়েছি, তবে আমার শুধু একটাই খটকা আছে। মাইরার শরীরের যা অবস্থা, তাতে সে কি পথের ধকল সইতে পারবে?

তার স্বাস্থ্যের কোনো ঊনিশবিশ হয়নি নতুন করে, ডাক্তার রডারিখ আমায় জানিয়েছেন, শরীরে তার কোনো কষ্ট নেই। শুধু তার মনের ওপর দিয়েই দারুণ একটা ঝড় চলেছে।

সেটা সে সময়ে সামলে উঠবে, আমি আশ্বাস দিয়েছি, হাওয়াবদল হলে এমনিতেই মনমেজাজ ভালো হয়ে যায়, তার ওপর এমন-কোনো দেশে যদি যায় যেখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই

কিন্তু হায়! খেদ ব্যক্ত করেছেন ডাক্তার, আমরা কি এখান থেকে চলে গিয়েই বিপদটাকে এড়াতে পারবো? ভিলহেল্ম স্টোরিৎস কি আর কোনো দুষ্ট গ্রহের মতো আমাদের পেছন নেবে না?

কোথায় যেতে চাচ্ছি, কখন যেতে চাচ্ছি, এ-সব যদি আমরা গোপন রাখতে পারি, তাহলে সে আমাদের পেছন নেবে কী করে?

আর গোপন! মন-খারাপ-করা সুরে বলে উঠেছেন ডাক্তার।

মার্কের মতো স্বয়ং ডাক্তার রডারিখও তাহলে এখন জিগেস করছেন, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস-এর কাছ থেকে কোনোকিছুই গোপন রাখা যায় কি না! সে হয়তো এখন এই ঘরে বসে-বসে আমাদেরই সব আলোচনা শুনছে!

তবু যাওয়াই ঠিক হয়েছে, এবং মাদাম রডারিখও কোনো আপত্তি তোলেননি। তারও ধারণা, হাওয়াবদল করলেই বোধহয় মাইরা সেরে উঠবে। মার্কেরও কোনো দ্বিমত নেই। আমি অবশ্য তাকে দ্বীপের ঘটনাটা খুলে বলিনি, বলে ফায়দাটাই বা কী হতো, মাঝখান থেকে সে আরো-ঘাবড়ে যেতো! তবে কাপ্তেন হারালানকে আমি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব খুলে বলেছি। যাবার ব্যাপারে তারও কোনো আপত্তি নেই। সে শুধু জিগেস করেছে : আপনিও আসবেন তত আপনার ভাইয়ের সঙ্গে?

আর কীই-বা করতে পারি, বলো–

আমি কিন্তু যাবো না। এমন দৃঢ় গলায় সে কথাটা বলেছে যে মনে হয়েছে তার এই সংকল্পের আর-কোনো নড়চড় হবে না।

যাবে না?...

না... আমি রাগৎ-এই থাকবো, কেননা শয়তানের বাচ্চাটাও এখানেই আছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, থেকে গেলেই আমি ভালো করবো।

তর্ক করে কোনো লাভ নেই, অতএব এ নিয়ে আমি কোনো তর্কই করিনি, বরং বলেছি, বেশ, তাহলে তা-ই হবে, কাপ্তেন।

আমি কিন্তু আপনার ওপর ভরসা করে আছি, মঁসিয় ভিদাল–আপনি আমার বদলে বাড়ির সকলের কাছে-কাছেই থাকুন। এখন তো আপনি আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন।

সে তুমি আমার ওপর ভরসা করতে পারো, আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছি।

আর তার পরেই আমি যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেছি। দিনে-দিনেই বেরিয়ে গিয়ে দুটো ভালো দেখে গাড়ি ভাড়া করেছি, যাতে আরামে যাওয়া যায়, তারপর মঁসিয়। স্টেপার্কের সঙ্গে দেখা করতে গেছি : আমাদের পরিকল্পনাটা তাকে অন্তত জানিয়ে যাওয়া উচিত। তিনিও আমাদেরই তরফে রায় দিয়েছেন, এটা আপনারা খুব ভালো ভেবেছেন। শহরশুদ্দু লোকজনও যদি তা-ই করতে পারতো তো খুবই ভালো হতো!

তাঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। দেখাবে না-ই বা কেন? কাল রাতে আমরা নিজের কানে যা শুনে এসেছি তারপর কেই-বা আর স্বস্তিতে থাকতে পারে?

সাতটার সময় আমাকে শহরে গিয়ে নিজের চোখে একবার দেখে আসতে হবে সব ঠিকঠাক ব্যবস্থা হয়েছে কি না।

আটটার সময় ঘোড়ায়-টানা গাড়িগুলো এসে হাজির হয়েছে। একটাতে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন রডারিখদম্পতি, অন্যটায় আমি আর মার্ক। দুটো গাড়ি দুটো আলাদা রাস্তা দিয়ে শহরের বাইরে যাবে–যাতে পর-পর দুটো গাড়ি দেখে কারু মনে কোনো সন্দেহ উঁকি না-মারে।

আর ঠিক তখনই এমন-একটা ঘটনা ঘটেছে, যেটা ছিলো কল্পনাতীত-নাটুকে ঘটনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভীষণ, ভয়াবহ।

গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে তৈরি, একটা প্রধান ফটকে, অন্যটা বাগানের দিকে, খিড়কির পাশে। ডাক্তার রডারিখ মার্ককে নিয়ে মাইরার ঘরে গেছেন, তাকে ধরাধরি করে নিচে নামিয়ে আনবেন বলে।

আতঙ্কে হতচকিত, স্তম্ভিত হয়ে, তারা দাঁড়িয়ে পড়েছেন চৌকাঠে।

বিছানা শূন্য!

মাইরা যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে!!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মাইরা উধাও হয়ে গিয়েছে!

আতঙ্কিত চীৎকারে সারা বাড়িটা যখন কেঁপে উঠেছে, গোড়ায় কেউই বুঝতে পারেনি কী হয়েছে...উধাও? তার তো কোনোই মানে হয় না। শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অবিশ্বাস্য!

মাইরা তার রোগশয্যায় যে-ঘরটায় শুয়েছিলা, আধঘণ্টা আগেও মার্ক আর মাদাম রডারিখ সে-ঘরে ছিলেন। ততক্ষণে তাকে পথের জন্যে পোশাক পরানো হয়ে গিয়েছিলো, শান্তই ছিলো সে, নতুন-কোনো অস্থিরতা তার ঘুমের মধ্যটা ছিঁড়ে দিচ্ছে বলে মনে হয়নি। তার একটু আগেই মার্ক তাকে পথ্য খাইয়েছে, তারপর নিজে গেছে। খাবারটেবিলে। আর খাওয়া শেষ হতেই ডাক্তার রডারিখকে নিয়ে সে মাইরার ঘরে ফিরে গেছে-তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসবে বলে, কোচগাড়ির কাছে। আর ঠিক তখনই। এই জবরদস্ত নাটুকে আঘাতটা পড়েছে, আচমকা! তারা তাকে তার ঘরে, তার বিছানায় দেখতে পায়নি। ঘরটা পড়ে আছে ফাঁকা, পরিত্যক্ত, জনমানবহীন!

মাইরা! আর্ত ডুকরে উঠেই মার্ক ছুটে চলে গিয়েছে জানলায়, গিয়ে ছিটকিনিটা খোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ছিটকিনি খুলতে সে পারেনি সে, জং-ধরে যেন সেটা শক্তভাবে এঁটে আছে! কেউ যদি মাইরাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকে, গুম করে থাকে, তবে তাকে এই জানলা খুলে কেউ নিয়ে যায়নি।

মাদাম রডারিখ ছুটে এসেছেন আলুথালু, তার পেছন-পেছন কাপ্তেন হারালান। তার সারা বাড়িটা ছুঁড়ে বেরিয়েছেন, চীৎকার করে ডেকেছেন, মাইরা!... মাইরা!

সে-যে কোনো উত্তর দেয়নি, সেটা তো সহজেই বোঝা যায়, কেউই তার কোনো সাড়া পাবে বলেও আশা করেনি। কিন্তু এই-যে ঘর থেকে সে উধাও হয়ে গেছে, এর যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা কী হবে? তার পক্ষে কি সম্ভব ছিলো যে সে বিছানা ছেড়ে উঠবে, তারপর পাশে, মায়ের ঘরের মধ্য দিয়ে গিয়ে, সিঁড়ির পইঠা দিয়ে নিচে নেমে যাবে?-- অথচ কেউই তাকে দেখতে পায়নি!

আমি তখন কোচগাড়িগুলোয় মালপত্র ঠিকমতো গুছিয়ে রাখার কাজটা তদারক করছিলুম–এমন সময় এই চীৎকার ও শোরগোল শুনে আমি আঁৎকে উঠেছি। ছুটে আমি উঠে গিয়েছি দোতলায়।

ডাক্তার রডারিখ আর মার্ক ক্রমাগত চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডেকেই চলেছে আর খ্যাপার মতো এ-ঘরে ও-ঘরে ছুটোছুটি করছে।

মাইরা! আমি জিগেস করেছি, এ তুই কী বলছিস, মার্ক?

ডাক্তারের যেন কথা বলবার শক্তিটুকুও আর ছিলো না। তিনি শুধু ভাঙা গলায় বলেছেন, আমার মেয়ে–উধাও হয়ে গেছে!

মাদাম রডারিখ ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, তাকে ধরাধরি করে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। কাপ্তেন হারালানের মুখটা বিকৃত হয়ে আছে,

কোটর থেকে এই-বুঝি চোখদুটি ফুটে বেরুবে, সে শুধু আমার কাছে এসে বলেছে : সে… আবারও সে!

কিন্তু আমি শুধু কোনোরকমে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করেছি। কাপ্তেন হারালানের শঙ্কার পেছনে যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু স্টেরিৎসই এসে যে কাজটা করেছে, এ-কথা মানা যাবে কী করে? আমরা যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছি, সবাই যে রকম হুঁশিয়ার ছিলুম, তাতে এটা মানা শক্ত যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এসে এ-বাড়িতে ঢুকতে পেরেছিলো। তর্কের খাতিরে না-হয় মেনেই নেয়া গেলো যে যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে যখন বাড়িটায় হুড়োহুড়ি চলেছে, তখন সে একফাঁকে সকলের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে–কিন্তু তা করতে হলে তাকে তো সর্বক্ষণ নজর রাখতে হয়েছে বাড়িটার ওপর, তক্কেতক্কে থাকতে হয়েছে, কখন একটা মওকা মেলে, আর তখন নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য তাড়াহুড়োয় পুরো কাজটা হাসিল করতে হয়েছে। অথচ এই সন্দেহটাকে সত্য বলে মেনে নিলেও, কাউকে এসে সে গুম করে ফেলেছে, এটা অবিশ্বাস্য। গ্যালারির কাছের দরজাটা ছেড়ে একমুহূর্তের জন্যেও আমি কোথাও যাইনি–কোচগাড়িটা দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই, মাইরা সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাগানে যাবে-অথচ আমি তাকে দেখতে পাবো না, এটা কী করে হয়। না-হয় মেনেই নিলুম যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্ষমতা ধরে, কিন্তু সে, মাইরা?…

আমি নিচে গ্যালারিতে গিয়ে কাজের লোককে ডাক দিলুম। বুলভার তেকেলির দিকে দরজাটা তালা বন্ধ, তার চাবি আমি নিজের কাছেই রেখেছি। তারপর পুরো বাড়িটা, চিলেকোঠা, মাটির তলার ভাড়ারঘর, মিনার আর তার অলিন্দ-সবকিছু আমি তন্নতন্ন করে হাড়ে দেখেছি, একটা কোণাও বাকি রাখিনি। তারপর বাগান…

কাউকেই দেখতে পাইনি আমি।

আমি মার্কের কাছে ফিরে গেলুম। সে তখন খোলাখুলি, প্রায় হাউহাউ করেই, কাঁদছে। তাকে এখন আমি কোন সান্ত্বনা দিই?

আমার মনে হচ্ছিলো, প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে মঁসিয় স্টেপার্ককে গিয়ে সবকিছু জানিয়ে আসা।আমি টাউনহলে যাচ্ছি। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। আমি বলেছি কাপ্তেন হারালানকে।

কোচগাড়িগুলো তখনও দাঁড়িয়েছিলো। গাড়িতে করেই চটপট গিয়ে টাউনহলে পৌঁছেছি আমরা।

মঁসিয় স্টেপার্ক তার খাশকামরাতেই কতগুলো নথিপত্র খুলে কী-সব দেখছিলেন। আমি তাকে সব খুলে বলেছি। সাধারণত মঁসিয় স্টেপার্ককে কখনও খুব-একটা ভড়কে যেতে দেখিনি আমি, কিন্তু এবারে তিনিও তার বিস্ময় চাপতে পারেননি।

স্তম্ভিতভাবে বলে উঠেছেন, মাদমোয়াজেল রডারিখ উধাও!

হ্যাঁ, আমি তাকে জানিয়েছি। শুনে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে, মনে হতে পারে অসম্ভব। তবে সে আপন খেয়ালে কোথাও চলে গিয়েছে কি না, অথবা তাকে কেউ গুম করেছে কি না জানি না–তবে মোদ্দা কথা হলো সে আর ও-বাড়িতে নেই!

তার মানে সেই দুবৃত্ত স্টোরিৎসই এর পেছনে আছে! অস্ফুট স্বরে বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক। কাপ্তেন হারালানের সঙ্গে তিনিও একমত যে স্টোরিৎসই এই দুষ্কর্মের হোতা। একটু চুপ কর থেকে তিনি বলেছেন, এই সেই ভীষণ চক্রান্ত যার কথা সেদিন বলছিলো হেরমানকে!

মঁসিয় স্টেপার্ক মোটেই ভুল বলেননি। হ্যাঁ, সত্যি-তো, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তো সেদিনই বলেছিলো যে সে এমন-একটা কাজ করতে চলেছে যাতে সবাই একেবারে কেঁপে উঠবে। আর আমরা সবাই এমনই হাঁদা যে আমরা আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করিনি।

মঁসিয় স্টেপার্ক ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আপনারাও আমার সঙ্গে যাবেন তো?

এক্ষুনি, আমরা সমস্বরে সাড়া দিয়েছি।

শুধু একমিনিট সবুর করুন। আমাকে কতগুলো নির্দেশ দিয়ে যেতে হবে।

একজন সার্জেন্টকে ডেকে তারপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন : একদল সেপাইকে নিয়ে গিয়ে রডারিখ-ভবনের চারপাশে সারাক্ষণ কড়া পাহারা রাখতে। তারপরে নিচুগলায় তাঁর সহকারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কী-সব শলাপরামর্শ করেছেন। তারপর আমরা তিনজনে ঐ কোচগাড়িটায় করেই ডাক্তারের বাড়ি ফিরে গিয়েছি।

দ্বিতীয়বার বাড়িটাকে লণ্ডভণ্ড করে সবকিছু তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো লাভই হয়নি। তবে মাইরার ঘরে ঢুকতে গিয়ে মঁসিয় স্টেপার্ক হঠাৎ বলে

www.bengaliebook.com

উঠেছেন,মঁসিয় ভিদাল, আপনি একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছেন না কি ঘরটায়? এর আগেও এ-গন্ধটা কোথাও যেন নাকে এসেছে।

আর, সত্যি, মৃদু একটা ঝাপসা গন্ধ ঝিম ধরে আছে হাওয়ায়, আর এবারে আচমকা আমার মনে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, মঁসিয় স্টেপার্ক। মনে আছে, স্টোরিসের ল্যাবরেটরিতে নীল শিশিটা যখন পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিলো, তখন ঠিক এমনি-একটা গন্ধ বেরিয়েছিলো!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন, মঁসিয় ভিদাল, এটা ঠিক সেই গন্ধ। আর তা থেকে কতগুলো অনুমান করা যায়। যদি এই তরল পদার্থ লোককে অদৃশ্য করে দিতে পারে, তাহলে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস সম্ভবত মাদমোয়াজেল রডারিখকে বাধ্য করেছিলো তা পান করতে, তারপর তাকে নিজের মতোই অদৃশ্য করে ফেলে কাঁধে করে নিয়ে গেছে।

শুনে, আমরা যেন বজ্রাহত হয়ে গেছি! হ্যাঁ, তা-ই তো, নিশ্চয়ই এ-রকমই কিছু একটা ঘটেছে। এখন আমার মনে আর-কোনো সন্দেহই নেই : আমরা যখন তার বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিলুম, তখন ভিলহেল্ম স্টোরিৎস স্বয়ং ল্যাবরেটরি ঘরে অদৃশ্য অবস্থায় ছিলো, আর সে-ই ইচ্ছে করে তখন শিশিটা ঠেলে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেলেছিলো, আর আমাদের হাতে না-পড়ে সেই তরল রাসায়নিক পদার্থ তক্ষুনি হাওয়ায় উবে গিয়েছিলো। হ্যাঁ, এটা সেই বিদঘুঁটে গন্ধটাই! তারই রেশ আমরা পাচ্ছি এ-ঘরে! হ্যাঁ, যাত্রার প্রস্তুতির জন্যে আমরা যখন বারেবারে দরজা খুলে যাওয়া-আসা করেছি, সে তখন একফাঁকে চুপিসাড়ে এ-ঘরে ঢুকে পড়ে মাইরা রডারিখকে গুম করে নিয়ে গেছে।

কী-একখানা রাত্তিরই যে কেটেছে। আমি সারাক্ষণ বসে থেকেছি মার্কের পাশে, ডাক্তার রডারিখ থম মেরে বসে থেকেছেন মাদাম রড়ারিখের পাশে! কী-যে অধীরভাবে আমরা অপেক্ষা করেছি কখন দিন ফোটে, আলো হয়!

আলো হয়?... কিন্তু দিনের আলোই বা আমাদের কোন কাজে আসবে?... ভিলহেল্ম স্টোরিংসের কাছে কি দিনরাত্রির কোনো ফারাক আছে? সে কি জানে না যে তাকে সারাক্ষণ ঘিরে আছে ঘনতামসী, অবতামসী, আঁধার-নিশা?

ভোর না-হওয়া পর্যন্ত মঁসিয় স্টেপার্ক আমাদের সঙ্গেই থেকেছেন, রাজভবনে খবর দিতে পর্যন্ত যাননি। যাবার আগে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন–যা বলেছেন তার মাথামুণ্ডু কোনো মানে বুঝতে পারিনি আমি–বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে তো তার কোনো অর্থই হয় না–বলেছেন, শুধু একটা কথা, মঁসিয় ভিদাল। কিছুতেই হতাশ হবেন না। সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে আপনাদের দুঃসময়ের শেষ হয়ে

এসেছে।– এমনতর উৎসাহব্যঞ্জক কথা শুনে হয়তো আমার খুশি হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু আমার মনে হলো এত-সব কাণ্ড দেখে মঁসিয় স্টেপার্কেরও মাথাটা খারাপ হয়ে যায়নি। তো? এ-কথার কোনো জবাব দেবো কি, আমি বুঝি হাবার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছি তার মুখের দিকে। আমি ভুল শুনিনি তো কথাগুলো? এমনিতেই আমার তখন বিমূঢ় দশা, সব শক্তি সব উৎসাহ কেউ যেন নিংড়ে বার করে নিয়ে গিয়েছে আমার মধ্য থেকে।

আটটা নাগাদ খোদ রাজ্যপাল এসে হাজির সান্ত্বনা আর আশ্বাস দিতে। ডাক্তার রডারিখকে তিনি জানিয়েছেন মাইরাকে উদ্ধার করবার জন্যে চেষ্টার কোনোই ত্রুটি হবে না। আমি ডাক্তার রডারিখের মতোই শুধু তেতো-একটু শুকনো হেসে তার আশ্বাস শুনেছি। রাজ্যপাল, বেচারা, তিনিই বা এ-অবস্থায় কী করতে পারেন?

কিন্তু ভোরবেলাতেই দাবানলের মতো মাইরার গুম হবার কথা গোটা রাগৎ-এ ছড়িয়ে পড়েছে–আর তার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছে, সেটা বর্ণনা করার ভাষা বা অভিব্যক্তি –কিছুই আমার নেই।

নটার আগেই লিউটেনান্ট আর্মগড় এসে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে-বেচারাই বা কী আর বলবে? তবে কাপ্তেন হারালান কিন্তু বন্ধুকে দেখেই যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝুলিয়ে তাকে শুধু একটা কথাই বলেছে : এসো।

সামরিক বাহিনীর এই দুই অফিসার যখন দরজার কাছে গেছে, হঠাৎ আমার মধ্যে অপ্রতিরোধ্য একটি বাসনা জেগেছে তাদের অনুসরণ করার। মার্ককেও তখন আমি ডেকেছি আমাদের সঙ্গে চলে আসতে। কিন্তু তার কানে পৌঁছেছিলো কি ডাকটা? জানি না। জবাবে টু শব্দটিও করেনি সে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি অফিসার দুজন হনহন করে নদীর তীর ধরে হেঁটে চলেছে। পথচারীদের কেউ-কেউ থমকে থেমে রডারিখ-ভবনের দিকে তাকাচ্ছে, তাদের মুখ-চোখে সমবেদনা আর আতঙ্কের একটা মিশ্র ছাপ।

আমি যখন গিয়ে অফিসার দুজনের নাগাল ধরেছি, কাপ্তেন হারালান একবারও আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আমি যে সঙ্গে-সঙ্গে আসছি, এটা যদি কেউ তাকে তখন বলতো, তবে সে তা বুঝতে পারতো কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। শুধু লিউটেনান্ট আমগাড় আমায় জিগেস করেছে, আপনিও কি আমাদের সঙ্গে আসছেন?

হ্যাঁ। তবে আপনারা কোথায়...

লিউটেনান্ট শুধু অস্পষ্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে। কোথায় যাচ্ছি আমরা?... তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে? যে-দিকে দু-চোখ যায়। এ-অবস্থায় অবশ্য তার চেয়ে ভালো পরিকল্পনা আর কী-ই বা হতে পারতো?

আমরা নীরবে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর, হঠাৎ দুম করে থেমে পড়েছে কাপ্তেন হারালান, কাটা-কাটাভাবে জিগেস করেছে : ক-টা বাজে?

সোয়া নটা। তার বন্ধু তার ঘড়ি দেখে বলেছে।

তারপরে ফের আমরা চলতে শুরু করেছি–নীরবে, আর হয়তো–খানিকটা উদ্দেশ্যহীন। মাঝে-মাঝেই কাপ্তেন হারালান এমনভাবে তার পা তুলে হেঁটেছে, মনে হয়েছে কেউ যেন পেরেক ঠুকে তার পা-দুটো মাটির সঙ্গে আটকে দিতে চাচ্ছে। আর বারেবারে জিগেস করেছে :কটা বাজে?নটা পঁচিশ... সাড়ে নটা... দশটা বাজতে কুড়ি, বলেছে তার বন্ধু, আর অমনি কাপ্তেন হারালান আবার বিমূঢ় পদক্ষেপে পথ হেঁটেছে। বাঁ-দিকে মোড় ঘুরে আমরা পেরিয়ে এসেছি ক্যাথিড্রালের সামনের চত্বরটা।

মনে হচ্ছে মরে গেছে যেন সবাই, রাগৃৎস-এর এই বড়োলোক পাড়ায়, এই অভিজাতপল্লিতে কেউই যেন নেই আর। ক্বচিৎ চোখে পড়ছে দু-একজন পথচারী, বেশির ভাগ দরজা-জানলাই বন্ধ, যেন কোনো সমবেত শোকের দিন।

রাস্তার শেষপ্রান্তে এসে দেখা গেলো লম্বা একটা মরা সাপের মতো পড়ে আছে বুলভার তেকেলি। রাস্তাটা ফাঁকা, পরিত্যক্ত, পড়ে আছে। সেই অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে সহজে কেউ এই রাস্তায় আর আসে না।

কোনদিকে যাবে এবার কাপ্তেন হারালান? ওপরে, দুর্গের দিকে? না, নিচে, নদীর দিকে? আবারও সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে পথের ওপর, যেন বুঝতে পারছে না কী করবে। আবারও সেই একই প্রশ্ন অস্ফুট বেরিয়ে এসেছে তার মুখ থেকে : কটা বাজে, আমগাড়?

দশটা বাজতে দশ, উত্তর দিয়েছে লিউটেনান্ট।

অবশেষে সময় হয়েছে, ঘোষণাই যেন করেছে হারালান। এবার সে হনহন করে হেঁটে গেছে বুলভার দিয়ে।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের বাড়ি ঘিরে যে-বেড়া ছিলো, তার পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে গেছি, হারালান কিন্তু হানাবাড়ির ভগ্নস্তূপের দিকে একবারও ফিরেও তাকায়নি। গতি না কমিয়েই সে আস্ত বাড়িটাকে ঘিরে হেঁটেছে, পেছনের গলিটায় এসে না-পৌঁছুনো অব্দি একবারও থামেনি। সেখান থেকে সাত ফিট উঁচু একটা ভাঙা-পোড়া দেয়াল দিয়ে ধ্বংসস্তূপটা ঘেরা।

আমাকে একটু তুলে ধরো তো, সে ইঙ্গিত করেছে, দেয়ালের ওপরটা দেখিয়ে।

ঐ কথা কটিই মুহূর্তে সব হেঁয়ালির সমাধান করে দিয়েছে। মাইরার দুর্ভাগা সহোদর কী করতে চাচ্ছে, চট করেই তখন তা যেন আমি বুঝে গিয়েছি।

বেলা দশটা-দু-দিন আগে আমরা আড়াল থেকে যে-কথাবার্তা শুনেছিলুম, তাতে বেলা দশটাই কি বলেনি ভিলহেল্ম স্টোরিৎস? আর সে-কথা কি আমিই খুলে বলিনি কাপ্তেন হারালানকে?, এখুনি ঐ পিশাচ এখানে আসবে, দেয়ালের আড়ালে, যে গুপ্তস্থানে সে লুকিয়ে রেখেছে তার ঐ অজ্ঞাত রাসায়নিক তরল, সেখানে গিয়ে ঢুকবে! সে যখন তার দুরভিসন্ধি কাজে খাটাতে ব্যস্ত থাকবে, তখন অপ্রস্তুত তার ওপর আমরা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো কি?

পরস্পরকে সাহায্য করে ক-মিনিটের মধ্যেই আমরা টপকেছি দেয়ালটা। আমরা গিয়ে নেমেছি ছোট্ট একচিলতে পায়েচলার পথে, তার দুপাশে ঘন ঝোঁপঝাড়। এখানে লুকিয়ে থাকলে স্টোরিৎস তো দূরের কথা, খোদ বীলজেবাবেরও হয়তো সাধ্য হবে না। যে আমাদের দেখতে পায়।

এখানে লুকিয়ে পড়ুন, আস্তে দৃঢ় স্বরে আমাদের বলেছে কাপ্তেন হারালান। বাগানের দেয়ালের গা ঘেঁসে বাড়ির দিকে যেতে-যেতে চট করেই সে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে।

আমরা প্রায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকেছি একঝলক। তারপর, অপ্রতিরোধ্য কৌতূহলের তাড়ায়, আমরা এগিয়ে গেছি পায়ে-পায়ে-ঝোঁপের মধ্য দিয়ে, নুয়ে, ঝুঁকে, সন্তর্পণে, চুপিসাড়ে, শেষটায় আমরাও বাড়িটার কাছে চলে গেছি। গাছপালার ঝাড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকেই আমাদের চোখে পড়েছে হানাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। মাঝে শুধু ভোলা জমি আছে বিশ গজ, তারপরেই সেই বাড়ি।

গুঁড়ি মেরে বসে, রুদ্ধনিশ্বাসে, আমরা অপলকে, ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থেকেছি বাড়িটার দিকে।

বাড়িটা তো নয়, যা আছে তা শুধু তার চার দেয়ালই, আগুনে-পোড়া, কালো। নিচে পড়ে আছে ইটপাথর, পোড়া কাঠের টুকরো, দুমড়ে-মুচড়ে বেঁকে-যাওয়া লোহার শিক, ঢিবির মতো ছাইভস্ম, আর আশবাবপত্রের ঝলসানো টুকরো-টাকরা।

অপলকেই আমরা তাকিয়ে থেকেছি সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে। ঈশ! বাড়িটার সাথে সাথে তারা যদি ঐ অভিশপ্ত আলেমানটিকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পারতো! যদি তার সঙ্গে-সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যেতো তার ঐ ভয়াবহ আবিষ্কার?

লিউটেনান্ট আর আমি ব্যগ্র চোখ বুলিয়ে গেছি ঐ খোলা জমির ওপর–আর তার পরেই ভীষণ চমকে গেছি! তিরিশ পাও দূরে হবে না, কাপ্তেন হারালান আমাদেরই মতো গুঁড়ি মেরে আছে একটা ঝোঁপের পাশে, যেখানটায় গিয়ে সে থেমেছে, তারপরেই ঝোঁপের সারি বেঁকে গিয়েছে বাড়ির কোণায়, বাড়ির সঙ্গে ঝোঁপটার ব্যবধান ছ-গজও হবে কি না সন্দেহ। সেই কোণাটার দিকেই অনিমেষলোচনে তাকিয়ে আছে কাপ্তেন হারালান।

একটুও নড়ছে না সে। গুঁড়ি মেরে আছে সে, উদ্যত, পেশীগুলো টানটান, যেন কোনো হিংস্র বুনো জানোয়ার-লাফ মারবার ঠিক আগের মুহূর্তটায়।

সে যেদিকটায় তাকিয়েছিলো, আমরাও এবার সেদিকটাতেই তাকিয়েছি। কিছু একটা আশ্চর্য নিশ্চয়ই ঘটছে সেদিকটায়। আমরা যদিও কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না, তবুবুঝতে পারছি ঐ ধ্বংসস্তূপের ইটকাঠপাথর দুর্বোধ্য কোনো প্রহেলিকার মতোই নড়ে যাচ্ছে! আস্তে, সন্তর্পণে, হুঁশিয়ার হাতে কেউ যেন সেই ইটকাঠপাথর সরাচ্ছে!

আমাদের ঘাড়ে হাত চেপে রেখেছে যেন কোনো পৈশাচিক রহস্য, আমাদের চোখগুলো বুঝি ঠিকরেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছে কোটর থেকে। সত্যটা যেন ধাঁধিয়েই দিয়েছে আমাদের চোখ। ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আছে ওখানে। মজুরদের যদি নাও দেখা। যায় চোখে, তাদের কাজকর্ম কিন্তু স্পষ্টই চোখে পড়ে যায়, হোক না তারা অদৃশ্য।

হঠাৎ যেন খ্যাপার মতো হুংকার দিয়ে উঠলো কেউ... কাপ্তেন হারালান একলাফে ডিঙিয়ে গেছে ফাঁকা জমিটা, যেন কোনো অদৃশ্য বাধার ওপরই লাফিয়ে পড়েছে।... যেন ছুঁ মারতে চাচ্ছে সে, এগিয়ে যেতে চাচ্ছে, ঠেলা খেয়ে পেছিয়ে আসছে, দুই হাত খুলে কোন্ অদৃশ্যকে যেন সে জড়িয়ে ধরেছে প্রাণপণে, যেন কোনো মল্লযুদ্ধ চলেছে, অদৃশ্যের সঙ্গে কোনো পাঞ্জা,...

এসো! হাত লাগাও! চেঁচিয়ে উঠেছে সে, বাগে পেয়েছি এবার শয়তানটাকে?

লিউটেনান্ট আর আমার বুঝি একমুহূর্তও লাগেনি ঐ ধস্তাধস্তির কাছে গিয়ে। পৌঁছুতে।

বাগে পেয়েছি বাছাধনকে আবারও বলেছে সে, হাত লাগান, ভিদাল! আমগাড়!

হঠাৎ আমার মনে হলো কার যেন অদৃশ্য হাত প্রচণ্ড জোরে আমায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছে, আমার চোখে-মুখে এসে পড়ছে কার ফোঁসফোঁস নিশ্বাস। হ্যাঁ, এ একেবারে একটা হাতাহাতি লড়াই, ফ্রি-স্টাইল কুস্তি, যেন কোনো নিয়মকানুন–মানা এক মল্লযুদ্ধ! এই-তো সে, ঐ ভয়ংকর, ঐ অদৃশ্য মানুষ, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, অথবা অন্যকোনো পিশাচ! সে যে-ই হোক না কেন, এবার আমরা তাকে কাবু করে ফেলেছি, এবং আমাদের কবল থেকে তার আর উদ্ধার নেই, এবার তাকে বলতেই হবে মাইরাকে নিয়ে সে কী করেছে। আমরা জানি কী করে কাউকে দিয়ে কথা বলাতে হয়!

অর্থাৎ মঁসিয় স্টেপার্ক যা বলেছিলেন, তা-ই ঠিক, সে তার দৃশ্যমানতাকে ধ্বংস করতে পারে বটে, কিন্তু অশরীরী হয়ে যেতে পারে না। এ-তো আর কোনো ভূতপ্রেত নয়, রক্তমাংসের কোনো শরীর, যেটা এখন প্রাণপণে যুঝছে, ধস্তাধস্তি করছে!

আর অবশেষে আমরা তাকে জব্দ করতে পেরেছি। তার একটা হাত চেপে ধরে রেখেছি আমি, আর অন্যহাতটা পাকড়েছে লিউটেনান্ট আর্মগাড়।

মাইরা কোথায়? বল, মাইরাকে তুই কী করেছিস? যেন জ্বরের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠেছে, এমনভাবে জিগেস করেছে কাপ্তেন হারালান।

কোনো সাড়া নেই। দুবৃত্তটি এখনও হাল ছাড়েনি, এখনও সে তার হাতদুটো হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে সটকে পড়তে চাচ্ছে। এই দুবৃত্তটি আবার অসীম বলশালীও বটে–

আমরা তিনজনে মিলেও যেন তাকে সামলাতে পারছি না। একবার যদি সে আমাদের হাত এড়িয়ে পালাতে পারে, তবে আর তাকে কখনও পাকড়ানো যাবে কি না সন্দেহ।

মাইরা কোথায়? বলবি কি না বল? কাপ্তেন হারালান তখন বুঝি কাণ্ডকাণ্ড জ্ঞানই হারিয়ে ফেলেছে।

বলবো না! ককখনো না!

এই হাঁফাতে-থাকা রূঢ় কর্কশ গলা শুনে আর-কোনো সন্দেহই থাকেনিঃ এ খোদ ভিলহেল্ম স্টোরিৎস, তার কোনো সাগরেদ নয়!

কিন্তু তিনের সঙ্গে এক আর কতক্ষণ যুঝবে! সে-তো আর চিরকাল এই ধস্তাধস্তি চালিয়ে যেতে পারবে না।

হঠাৎ এক ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে লিউটেনান্ট আমগাড়; তারপরেই আমার মনে হয়েছে আমার ঠ্যাঙের মধ্যে কেউ যেন আচমকা ল্যাং কষিয়েছে! আমি টাল সামলাতে না-পেরে ছিটকে পড়ে গেছি, হাতটা ছেড়ে দিতে হয়েছে আমায়। তারপরেই কেউ যেন সজোরে বিরাশি সিক্কার একটা থাপ্পড় কষিয়েছে কাপ্তেন হারালানের মুখে! সে টলতে টলতে যেন শূন্যকে আঁকড়েই টাল সামলাতে চেয়েছে।

পালালো! পালালো? এ-তো চীৎকার নয়, যেন কোনো হিংস্র জানোয়ারের ক্রুদ্ধ গর্জন।

না, সন্দেহ নেই আর, প্রভুর সাহায্যে কোত্থেকে আচমকা যেন হেরমান এসে উদয় হয়েছে।

আমি কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়েছি, যদিও মাথা তখনও ঘুরছে, জোর চোট লেগেছিলো! লিউটেনান্ট আমগাড় চিৎপাত পড়ে আছে ভুঁয়ে, প্রায় সংজ্ঞাহীন-আর আমি ছুটে গেছি তাকে সাহায্য করতে, ভেবেছি তার ওপর হয়তো স্টোরিৎসই চেপে বসে আছে। কিন্তু মিথ্যেই আশা করেছি। আমরা যা আঁকড়ে ধরতে পেরেছি তা শুধুই শূন্যতা, একমুঠো খোলাহাওয়া।

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আবারও আমাদের কবল থেকে পালিয়ে গিয়েছে।

তারপরেই হঠাৎ ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে জনাকতক সেপাই, অন্যরা টপকে আসছে দেয়াল, কেউ-কেউ যেন বেরিয়ে আসছে ঐ ধ্বংসপ্ল কুঁড়েই, পাতাল থেকেই যেন। চারপাশ থেকে দলে-দলে কাতারে-কাতারে আসছে সেপাইরা। শয়ে-শয়ে। কারু পরনে সেপাইয়ের পোশাক, কয়েকজনের গায়ে পদাতিক বাহিনীর উর্দি। মুহূর্তের মধ্যে তারা আমাদের ঘিরে চারপাশে গণ্ডি তৈরি করে ফেলেছে, তারপর বৃত্তটা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে, ছোটো, আরো-ছোটো...।

আর শুধু তখনই আমি ধরতে পেরেছি মঁসিয় স্টোপার্কের ঐ আশাব্যঞ্জক বাণীর অর্থ। স্টোরিৎস সেদিন নিজের অজান্তেই আমাদের কাছে ফাস করে দিয়েছিলো তার দুরভিসন্ধি। তালেগোলে আমি খেয়াল না-করলেও, মঁসিয় স্টেপার্ক কিন্তু মোটেই ভোলেননি স্টোরিৎস কী মৎলব এঁটেছে, আর সেই অনুযায়ীই তিনি ব্যবস্থা করেছেন,

এমনই নিখুঁতভাবে যে দেখে আমার সত্যি তাক লেগে গিয়েছে। কেননা এই কয়েকশো লোকের একজনকেও কিন্তু আমরা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকবার সময় দেখতে পাইনি।

বৃত্ত ক্রমেই ছোটো হয়ে এসেছে, যেন কেন্দ্রে পৌঁছেছে। এইবারে ফাঁদে পড়েছে স্টোরিৎস আর তার চেলা। আর তাদের রেহাই নেই!

আর এই মোটা কথাটাই যেন ততক্ষণে তার নিজের মাথাতেও গিয়ে ঢুকেছে। কারণ হঠাৎ আমাদের কানের পাশেই কেউ যেন রুদ্ধ আক্রোশে গররর করে উঠেছে। তারপর যেই মনে হয়েছে লিউটেনান্ট আমগাড় তার জ্ঞান ফিরে পেতে চলেছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, কেউ যেন হ্যাঁচকা একটা টান মেরে তার কোষ থেকে খুলে নিয়েছে তলোয়ারটা, একটা অদৃশ্য হাত সেটা নেড়ে যেন ভয় দেখাতে চাচ্ছে, হাওয়ায় বনবন করে ঘোরাচ্ছে!

এই হাত আর-কারু নয়, নিশ্চয়ই ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের, এভাবেই জনকতককে ঘায়েল করে এবার সে তার গায়ের ঝাল মেটাবে! পালাতেই যখন পারবে না, তখন সে তার শেষ মোক্ষম ঘাটা মেরে যাবে, কাপ্তেন হারালানকেই নিকেশ করে দেবে!...

শত্রুর দৃষ্টান্ত দেখে কাপ্তেন হারালানও কোষ থেকে তখন বার করে এনেছে তার তলোয়ার। যেন কোনো দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, এমনিভাবে তলোয়ার হাতে তারা দাঁড়িয়েছে পরস্পরের মুখোমুখি–একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্যজনকে কেউই দেখতে পাচ্ছে না!... তলোয়ারে-তলোয়ারে ঠোকাঠুকি লড়াই হচ্ছে, ফুলকি উড়ছে,

ঝনঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে... আর এত দ্রুত শুরু হয়েছে এই দৃশ্য অদৃশ্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ যে আমরা তাতে কোনো বাধাই দিতে পারিনি। আর এটাও বোঝা যাচ্ছে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস অসিযুদ্ধেও দারুণ নিপুণ। সে জানে তলোয়ার কী করে চালাতে হয়। আর কাপ্তেন হারালান? সে খ্যাপার মতো আক্রমণই করে চলেছে, আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করছে না। তার কাঁধে পড়েছে তলোয়ারের কোপ, ফিনকি : দিয়ে বেরিয়েছে রক্ত, কিন্তু তবু ঝলসে উঠছে তার তলোয়ার–সামনে কীসের গায়ে যেন বিঁধেছে গিয়ে সেটা সজোরে! একটা আর্তনাদে তালা ধরে গেছে যেন আমাদের কানে, তারপরেই আমাদের সামনের জমিতে সমস্ত ঘাস যেন থেলে চেপটে গিয়েছে...

মানুষের একটা শরীর পড়েছে ঘাসের ওপর প্রচণ্ড জোরে, ভিলহেল্ম স্টোরিসের শরীর, তার বুকে এফোঁড়-ওফোড় বিঁধে গিয়েছে তলোয়ারের ফলা... ফিনকি দিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে রক্ত উঠেছে, আর রক্তের সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহটা থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে যেন, আর অমনি রক্তমাংসের শরীর ফিরে পাচ্ছে তার আকৃতি, ত্রিরায়তনিক, চাক্ষুষ, রক্তমাংসের শরীর, মরণযাতনায় থরথর!

কাপ্তেন হারালান তখন নিজেকে ছুঁড়ে ফেলেছে ভিলহেল্ম স্টোরিসের ওপর। চীৎকার করে জিগেস করেছে তাকে : মাইরা? মাইরা কোথায়?

কিন্তু একটা নিষ্প্রাণ লাশ পড়ে আছে তখন ঘাসের ওপর, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা, চোখদুটো বিস্ফারিত, ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে যেন, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস এর দৃশ্যমান মৃত্যুযন্ত্রণায় দুমড়ে-যাওয়া শরীরটা আর-কোনোদিনই কোনো জ্যান্ত মানুষের ভষায় কথা বলবে না।

ভয়ও দেখাবে না!

.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এইই হলো ভিলহেল্ম স্টোরিসের জীবনের শোচনীয় পরিণাম।

তবে, হায়, তার এই মৃত্যু এলো বড়-বেশি দেরি করে। এখন যদিও তার কাছ থেকে রডারিখ পরিবারের নতুন করে ভয় পাবার আর কিছু নেই, তবু তার মৃত্যু কিন্তু অবস্থাটার উন্নতি করার বদলে বরং আরো-শোচনীয় করে তুলেছে, কেননা তার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মাইরাকে ফিরে পাবার সব আশাই হারিয়ে গেছে।

এদিকে এখন এই নতুন হতাশা এসে দখল করে বসেছে হারালানকে-খুশি হবার বদলে সে যেন কি-রকম হতভম্বভাবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তার এই শত্রুর দিকে। শেষটায় যেন এই অপূরণীয় সর্বনাশকে মেনে নেবার জন্যেই, একটা হাতছাড়া ভঙ্গি করে, হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে রডারিখ ভবনের দিকে–কী করে যে এই শোচনীয় পরিণামটার কথা সে বাড়ির লোকের কাছে ভাঙবে, তা-ই যেন সে ভাবতে পারছিলো না।

আমি আর লিউটেনান্ট আমগাড় কিন্তু অকুস্থলেই থেকে গিয়েছি, আর হঠাৎ দেখতে পেয়েছি মঁসিয় স্টেপার্কও যেন কোত্থেকে হঠাৎ এসে উদয় হয়েছেন। প্রায় কয়েকশো লোক ভিড় করে আছে এখানটায়, অথচ সবাই কী-রকম যেন মোহ্যমান আর বিহ্বল হয়ে আছে, সকলেরই বুকের ওপর চেপে বসে আছে অদ্ভুত-এক স্তব্ধতা, চূড়ান্ত কৌতূহলের সঙ্গে এসে মিশেছে অকথ্য-এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা, নীরবে শুধু ঠেলাঠেলি

করছে কেউ-কেউ, মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাচ্ছে কীভাবে পড়ে আছে ভিলহেল্ম স্টোরিংসের অসিবিদ্ধ মৃতদেহ।

সকলেরই চোখ চুম্বকের মতো আটকে আছে লাশটার ওপর। একটু বাঁ-কাৎ হয়ে আছে দেহটা, রক্তে জামাকাপড় মাখামাখি, মুখটা পাণ্ডুর বিবর্ণ, তার হাতটা তখনও বদ্ধ মুঠোয় আঁকড়ে আছে লিউটেনান্ট আমগাড়ের তলোয়ারটা, বাঁ-হাত বেকায়দায় পড়ে কেমন কিম্ভুতভাবে মুড়ে আছে।

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে মৃতদেহটার দিকে তাগিয়ে থেকে শেষটায় স্তব্ধতা ভেঙে মঁসিয় স্টেপার্ক বলে উঠেছেন :এ কি তবে সত্যি সে-ই?

সেপাইরা আমাদের কাছে ঘনিয়ে এসেছিলো, তাদের চোখে-মুখে এখনও একটা শঙ্কার চাপ। তারাও ভিলহেল্ম স্টোরিৎসকে চিনতে পেরেছে। যা দেখছেন, তাকে বিশ্বাস করবার জন্যেই যেন মঁসিয় স্টেপার্ক হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন মৃতদেহটির আপাদমস্তক।

মরে গেছে। মরে ভূত হয়ে গেছে! বলে, তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন!

চেঁচিয়ে তিনি তারপর একটা নির্দেশ দিয়েছেন সেপাইদের, আর তক্ষুনি জনা-বারো সেপাই ঠিক সেই জায়গাটা থেকেই আবর্জনা সরাতে শুরু করেছে, মরবার আগে ধ্বংসস্তূপের যে-জায়গাটা থেকে স্টোরিৎসই জঞ্জাল সরাতে শুরু করেছিলো।

আমরা আড়ালে থেকে যে-কথাবার্তা শুনেছি, মঁসিয় স্টেপার্ক যেন আমার মনের প্রশ্নটা পড়ে ফেলেই উত্তর দিয়েছেন, তাতে মনে হয় এখানেই সেই গোপন জায়গাটা খুঁজে

পেয়ে যাবো। মনে আছে রাস্কেলটা কী বলেছিলো? অনেকটাই তরল রাসায়নিক সে লুকিয়ে রেখেছে এখানে, যার সাহায্যে সে একাই গোটা শহরটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে বলে ভেবেছিলো। যতক্ষণ-না সেই গুপ্ত জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এখান থেকে আমি এক পাও নড়ছি না। এখানকার সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে তবেই আমি ছাড়বো। স্টোরিৎস মারা গেছে। বিজ্ঞান আমাকে যে-অভিশাপ দেয় দিক, আমি চাই তার সঙ্গে-সঙ্গে যেন তার সমস্ত গুপ্তরহস্যও খতম হয়ে যায়।

আর তখন আমার মনে হয়েছে : মঁসিয় স্টেপার্ক সম্ভবত সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। যদিও আমার মতো যারা কোনো-না-কোনোভাবে বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের সঙ্গে জড়িত, তাদের কাছে অটো স্টোরিসের এই অবিষ্কার যথার্থই কৌতূহলোদ্দীপক কিছু, তবু আমার মনে হচ্ছিলো, এর হয়তো ব্যাবহারিক কোনো প্রয়োগ আদপেই নেই–বরং এ হয়তো স্বভাবদুবৃর্তদের নতুন-নতুন অপকর্মেই উসকে দেবে।

শিগগিরই ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ধাতুর পাত–একটা ঢাকনাই সেটা, আর ঢাকনাটা তুলতেই তার তলায় দেখা গেছে সরু-একটা সিঁড়ির প্রথম পইঠাগুলো।

আর অমনি কে যেন আমার হাতটা চেপে ধরেছে, আর কাতর স্বরে কে যেন বলে উঠেছে : দয়া করুন! দয়া ।

আমি তড়াক করে ঘুরে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু কাউকেই চোখে পড়েনি–অথচ আমার হাতটা তখন কেউ চেপে ধরে আছে, আর অনুনয়টা তখনও শোনা যাচ্ছে।

সেপাইরা হাতের কাজ ফেলে অবাক হয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে! আমিও যে কতটা বোমকে গিয়েছি তা বলে বোঝাতে পারবো না। অন্য হাতটা বাড়িয়ে আমার আশপাশটা হাড়েছি আমি তখন। ঠিক আমার কোমর বরাবর আমার হাত যেন কার চুলের ওপর পড়েছে, আর তার একটু-নিচে–কার যেন মুখ, চোখের জলে ভেজা। স্পষ্টই কেউ-একজন যেন নতজানু হয়ে আছে এখানে, কান্নাকাটি অনুনয়-বিনয় করছে, অথচ তাকে আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না! আমি কি-রকম ঘাবড়ে গিয়ে তোলাতে তোৎলাতে বলেছি : কে তুমি?

কে যেন বলেছে : হেরমান!

তুমি আবার কী চাও?

কান্নাভেজা ছোট্ট কতগুলো কথায় স্টোরিসের অদৃশ্য সাগরেদ তখন আমাদের বলেছে, সে মঁসিয় স্টেপার্কের সিদ্ধান্তের কথা শুনেছে–এখানে যা-ই পাওয়া যাবে, তা-ই নাকি ধ্বংস করে ফেলা হবে–আর তা যদি হয় তবে সেহেরমান–সে কী করে আবার তার মানুষী আকৃতি ফিরে পাবে? তাকে কি সারা জীবন তবে মানুষের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে থাকতে হবে–নিঃসঙ্গ, চির-একাকী? সে অনুনয় করে বলেছে, মঁসিয় স্টেপার্ক যদি কৃপা করে সবগুলো শিশি ধ্বংস করে ফেলার আগে অন্তত একটা শিশি থেকে একটোক যদি তাকে খেতে দেন, তবে সে বর্তে যাবে।

স্টেপার্ক তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন বটে, তবে হেরমানও তত ফেরারি আসামী, আইনের চোখে সেও অপরাধী, ফলে সে যাতে আর-কোনো ঝামেলা পাকাতে না-পারে,

সেইজন্যে তাকে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তার হুকুমে, চারজন হেঁইয়ো-জোয়ান সেপাই এসে জাপটে ধরেছে অদৃশ্য মানুষকে। তারা যে তাকে কখনো ছেড়ে দেবে না, এ-বিষয়ে শুধু-তখনই আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি।

যে-চারজন লোক অদৃশ্য বন্দীকে জাপটে ধরে ছিলো, তাদের আগে-আগে আমি আর মঁসিয় স্টোপার্ক নেমেছি ঐ সিঁড়ি দিয়ে, গিয়ে পৌঁছেছি মাটির তলার একটা ভাড়ারঘরে, মণিকোঠায়, ওপরের ঢাকনা-দরজা ভোলা আছে বলে তা দিয়ে ক্ষীণ একটু আলো এসে ঢুকেছে ভেতরে, সেখানে, একসার সরু-সরু তাকের ওপর, পর-পর অনেকগুলো শিশি সাজানো আছে-তাদের কোনোটার গায়ে লেবেল আঁটা-১, আবার কোনোটার গায়ে লেবেল-২।

হেরমান অধীর স্বরে দু-নম্বর একটা শিশি চেয়েছে, আর মঁসিয় স্টেপার্ক নিজেই সেটা তার হাতে তুলে দিয়েছেন। তারপর অবর্ণনীয় একটি তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে যদিও এমন-কিছু যে ঘটবে, সেটা আমাদের বোঝা উচিতই ছিলো–আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখেছি শিশিটা যেন আপনা থেকে শূন্যে উঠে গিয়ে একটা পাক খেলো, তারপর উপুড় হয়ে গেলো, যেন কেউ শিশিটা থেকে ঢকঢক করে কিছু পান করছে।

তারপরে ঘটলো আরো-তাজ্জব, আরো-চমকপ্রদ একটা ব্যাপার। যতই সে ঢকঢক করে পানীয়টা পান করছে, ততই যেন শূন্যের মধ্যে আস্তে-আস্তে সাকার হয়ে উঠছে হেরমান। প্রথম দেখা গেলো আবছা-একটা আকৃতি, মণিকোঠার আবছায়ায় ঝাপসা তাকে দেখা যাচ্ছে, তারপরেই ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট হয়ে, উঠেছে তার আকৃতি, তার পরিণাহ, আর

www.bengaliebook.com

শেষটায় আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি, আমি যেদিন রাগৎস এসে পৌঁছেছিলুম, সেদিন সন্ধেবেলায় এই লোকটাই আমার পেছন নিয়েছিলো।

মঁসিয় স্টেপার্কের ইঙ্গিতে বাকি শিশিগুলো কিন্তু তক্ষুনি ভেঙে ফেলা হয়েছে, আর তাদের ভেতর যে-তরল পদার্থ ছিলো তা মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তেই যেন বাষ্প হয়ে গিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এর পরে ফের আমরা সদলবলে ওপরে, দিনের। আলোয়, ফিরে এসেছি।

তাহলে? এবার আপনি কী করবেন বলে ভেবেছেন, মঁসিয় স্টেপার্ক? তাকে জিগেস করেছে লিউটেনান্ট আমগাড়।

উত্তর এলো, আমি মৃতদেহটা এক্ষুনি টাউনহলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

প্রকাশ্য দিবালোকে? সকলের চোখের সামনে দিয়ে?

হ্যাঁ, প্রকাশ্যে, সারা রাৎসেরই জানা উচিত যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মারা গেছে। নিজের চোখে মৃতদেহটা না-দেখলে তারা সে-কথা বিশ্বাসই করবে না।

যতক্ষণ-না কবরে যাচ্ছে, আমি মন্তব্য করেছি, ততক্ষণ-বা তারাই এ-কথা বিশ্বাস করে কী করে?

কবরে যদি যায় আদৌ, বলেছেন মঁসিয় স্টেপার্ক।

মানে? আমি বুঝি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কী-রকম তাকিয়ে থেকেছি।

হ্যাঁ, মঁসিয় স্টেপার্ক ব্যাখ্যা করে বলেছেন, আমার মতে মৃতদেহটা পুড়িয়ে হাওয়ায় ছাইগুলো উড়িয়ে দেয়াই ভালো হবে-যেমন তারা করতো মধ্যযুগে, ডাইনি মারতে গিয়ে।

তারপর তিনি একটা স্ট্রেচার আনতে বলেছেন মৃতদেহটার জন্যে, আর তার বেশির ভাগ সেপাইকে নিয়ে কয়েদি সমেত চলে গিয়েছেন টাউনহলের দিকে। হেরমানকে এখন খুবই সাধারণ নগণ্য লোক হিশেবে দেখাচ্ছে, যেই সে দৃশ্যমান হয়েছে অমনি যেন তার সব জারিজুরিও উধাও হয়ে গিয়েছে। আর আমি লিউটেনান্ট আর্মগাড়কে সঙ্গে করে ফিরে গিয়েছি রডারিখ-ভবনে।

কাপ্তেন হারালান এদিকে বাড়ি ফিরে এসে বাবার কাছে সবকিছু খুলে বলেছে। মাদাম রডারিখের শরীর-মনের দশার কথা চিন্তা করে তাকে কিছু খুলে বলা হবে না বলেই ঠিক হয়েছে। ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের মৃত্যু তো আর তার মেয়েকে তার কাছে ফিরিয়ে দেবে না।

মার্কও এখনও-অব্দি ব্যাপারটা জানে না। তাকে অবশ্য বলতেই হবে সব, আর সেইজন্যেই আমরা তাকে ডেকে পাঠিয়েছি ডাক্তারের পড়ার ঘরে। সে কিন্তু, সব শুনে, প্রতিশোধ নেবার উল্লাসে আদৌ ভরে ওঠেনি। বরং আবার ভেঙে পড়েছে কান্নায়, আর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে নিদারুণ হতাশায় বলে উঠেছে : ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মারা গেছে!... তুমি তাকে হত্যা করেছো!... সে মরে গিয়েছে, কিন্তু মারা যাবার আগে কিছুই বলে যায়নি!... মাইরা!... আমার মাইরা!... হায়, আমি তাকে আর-কখনও চোখেও দেখবো না!...।

শোকের এই প্রচণ্ড প্রকাশের সামনে কীই-বা সান্ত্বনা দিতে পারতুম আমি!

অথচ তবু আমি চেষ্টা করেছি। না-না, আমাদের সমস্ত আশা হারিয়ে ফেললে চলবে না। আমরা এখনও জানি না বটে মাইরা কোথায়, তবে একজন লোক সে-খবর জানে, সে হলো হেরমান, ভিলহেল্ম স্টোরিসের সাগরেদ, তাকে তো এখন আমরা পাকড়াও করেছিসে তো এখন হাজতে আছে, তালা বন্ধ। তাকে আমরা জেরা করতে পারি, প্রশ্ন করতে পারি; আর ব্যাপারটায় যেহেতু তার প্রভুর মতো তার কোনো অতিরিক্ত আগ্রহ নেই, একটু চাপ দিলেই সে সবকথা ফাঁস করে দেবে, খুলে বলবে মাইরা কোথায় আছে।... গোড়ায় যদি নাও বলতে চায়, আমরা তাকে নানাভাবে বলতে বাধ্য করতে পারি, যদি দরকার হয় সেজন্যে আমরা বিস্তর টাকাও খরচ করবো। আর তাতেও যদি না-হয় তো তাকে খুব কষে ধোলাই দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেপাইরা সবখানেই থার্ড ডিগ্রি ব্যবহার করে : কারু পেট থেকে গোপন কথা বার করবার যথেষ্ট উপায় জানে তারা।... মাইরা আবার ফিরে আসবে তার আপনজনের কাছে, তার স্বামীর কাছে, আর সেবা-যত্ন-শুশ্রূষায় আবার সে পুরোপুরি সেরেও উঠবে.....

কিন্তু এর একটা কথাও যদি মার্কের কানে গিয়ে থাকে! সে যেন কোনো কথা শুনবে না বলেই পণ করে আছে। তার ধারণা, মাইরা কোথায় আছে, সেটা একজনই বলতে পারতো, এবং সে এখন আর বেঁচে নেই। তার পেট থেকে সব কথা আদায় করে নেবার আগে তাকে হত্যা করা আমাদের উচিত হয়নি।

কেমন করে যে মার্ককে শান্ত করবো, তা-ই আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, আর এমন সময়ে, হঠাৎ আমাদের কথার চাপান-উতোরে বাধা পড়ে গেলো বাইরের তুলকালাম

হট্টগোলে। আমরা সবাই ছুটে চলে গিয়েছি কোণের জানলায়, তার পাল্লাটা বুলভারের দিকে খোলে।

এখন আবার নতুন করে কী ঘটছে?... আমাদের মনের অবস্থা তখন যা ছিলো, তাতে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস যদি পুনর্জীবন লাভ করে এখানে এসে উদয় হতো তাতেও বোধহয় আমরা এতটুকু অবাক হতুম না।

কিন্তু তা নয়। সে মৃত্যু থেকে ফিরে আসেনি মোটেই। বরং তার মৃতদেহ নিয়ে মিছিল চলেছে লাশকাটা ঘরের দিকে। একটা খাঁটিয়ার ওপর চাপানো হয়েছে মৃতদেহটা, তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে চারজন সেপাই, পেছন-পেছন মস্ত একটা ভিড়। তাহলে সারা রাগস এক্ষুনি জেনে যাবে যে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস মারা গেছে এবং তার বিরচিত আতঙ্কেরও তার রাজত্বের সাথে-সাথেই অবসান হয়েছে।

মঁসিয় স্টেপার্ক শহরের প্রত্যেকটা রাস্তায়, প্রত্যেকটা মোড়ে মৃতদেহটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাচ্ছেন। শুধু বুলভার ধরেই নয়, সব কটা বড়োরাস্তা ধরে যাবে এই মিছিল, যাবে সবচেয়ে জনবহুল পাড়াগুলো দিয়ে, সবশেষে আসবে টাউনহলে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিলো, মিছিলটা যদি রডারিখ-ভবনের পাশ দিয়ে না-যেতো, তাহলেই হয়তো ভালো হতো।

মার্কও এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়, আমাদের সকলেরই সাথে। সেই রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা দেখেই সে আর্ত একটা চীৎকার করে উঠেছে-পারলে সে হয়তো নিজের জীবন দিয়েও এই লাশটায় প্রাণ ফিরিয়ে আনতে।

ভিড় কিন্তু খ্যাপা একটা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। বেঁচে থাকলে, তারা নিশ্চয়ই ভিলহেল্‌ম স্টোরিৎসকে ফাঁসিতে ঝোলাতো। হয়তো খণ্ড খণ্ড করে কাটতো তাকে কুপিয়ে। মরে গেছে বলেই তার মৃতদেহটাকে তারা আর ছোয়নি। কিন্তু মঁসিয় স্টেপার্ক যেমন ভেবেছিলেন তারাও তেমনিঃ তাকে সাধারণ মর্তমানবের কবর দিতে তারা রাজি নয়। তারা চাচ্ছে তাকে যেন লাল চকটায় প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়, অথবা যেন মৃতদেহটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় দানিউবের জলে । দানিউব তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দূরে, কৃষ্ণসাগরের শেষকিনারে।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে শতকণ্ঠের উল্লাস বেজেছে বাড়ির সামনে, তারপর আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেছে মিছিল, আর স্তব্ধতা নেমে এসেছে পরিপূর্ণ।

কাপ্তেন হারালান হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে সে এক্ষুনি টাউনহলে যাবে। সেখানে সে এক্ষুনি জেরা করবে হেরমানকে, আর একফোঁটাও সময় নষ্ট করা চলবে না। আমরা তার প্রস্তাবে সায় দিতেই, সে তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে লিউটেনান্ট আমগাড়কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

আমি মার্কের পাশেই সময় কাটিয়েছি । অমন শোকাহত প্রহর আমি এর আগে আর-কখনও কাটাইনি।... আমি তো তাকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারিইনি, বরং উলটে তার ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে, এই বুঝি সে আমাদের হাত ফসকে বিকারের ঘেরের মধ্যে চলে যাবে। একবার যদি তার মাথাখারাপ হয়ে যায়, তবে তাকে সারানো বিষম মুশকিল হবে। আমার কথা সে কানেই নিতে চাচ্ছে না। তর্ক করারও কোনো সাধ, কোনো প্রবৃত্তি তার নেই যেন। শুধু একটা ভাবনার ঘোরেই সে পাক খাচ্ছে, স্থির

অপরিবর্তনীয় এক দুর্ভাবনা : মাইরা কোথায়–এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে তার খোঁজ করা উচিত। আর তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, অঁরি। এই তার এক গোঁ।

তাকে, অনেক সাধ্যসাধনা করে, শুধু এটুকুতেই রাজি করাতে পেরেছি যে কাপ্তেন হারালানের ফিরে-আসা অব্দি আমরা অপেক্ষা করবো। কাপ্তেন হারালান অবশ্য তার বন্ধুকে নিয়ে চারটের আগে ফিরে আসেনি, আর যে-খবর সে নিয়ে এসেছে সেটা আমাদের কাছে আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিলো না। হেরমানকে জেরায়-জেরায় জেরবার করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দাই হয়নি। মিথ্যেই হারালান, মঁসিয় স্টেপার্ক, এমনকী খোদ রাজ্যপাল অব্দি, তাকে ভয় দেখিয়েছেন, অনুনয়-বিনয় করেছেন, মিনতি করেছেন। মিথ্যেই তাকে ধনদৌলতের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, মিথ্যেই তাকে বলা হয়েছে খবরটা না-বলে দিলে কী কঠোর সাজা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু তার কাছ থেকে একটাও কথা বার করা যায়নি। হেরমান একবারও তার কাহন বা কৈফিয়ৎ পালটায়নি। সে জানে না মাইরা কোথায় আছে । এমনকী স্টোরিৎস যে তাকে চুরি করে নিয়ে এসেছিলো, সে-তথ্যটাও তার নাকি অজানা ছিলো। তার প্রভু তাকে সব কথা খুলে বলা সম্ভবত সমীচীন বোধ করেনি।

তিন ঘণ্টা ধরে যাবতীয় চেষ্টা ও ধস্তাধস্তির পর প্রশ্নকর্তাদের মেনে নিতে হয়েছে তার এজাহার : হেরমান সত্যিকথাই বলছে। সে-যে কিছু জানে না, এ-বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো অবকাশই নেই। আর তাই, সহায়হীনা মাইরাকে আবার চোখে দেখার আশা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

কী শোচনীয় সমাপ্তিই না হলো দিনটার। বিধ্বস্ত বসে থেকেছি আমরা চেয়ারে, দুঃখেতাপে নুয়ে-পড়া, কেউ কোনো কথা বলিনি, আর মুহূর্তের পর মুহূর্ত গড়িয়ে গেছে নীরবে। কীই-বা আর নতুন বলতে পারতুম, যা আমরা আগে অন্তত একশোবার নিজেরাই বলাবলি করিনি?

আটটার একটু আগে কাজের লোক এসে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ডাক্তার রডারিখ এখনও তার শোকার্তা স্ত্রীকে স্তোক দিয়ে চলেছেন তার শোবার ঘরে; ড্রয়িংরুমে বসে আছে অফিসার দুজন, আর মার্ক; আর আমিও সেখানে বেহাল বসে আছি। কাজের লোক বাতি রেখে চলে যেতেই ঢং-ঢং করে আটটার ঘণ্টা পড়তে শুরু করেছে।

আর ঠিক তক্ষুনি গ্যালারির দরজা দুম করে খুলে গিয়েছে। নিশ্চয়ই দমকা হাওয়ার ঝাঁপটায় খুলে গিয়েছে পাল্লাটা, কেননা কাউকেই আমি দরজার আশপাশে দেখিনি। কিন্তু যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ সেটা হলো পাল্লাদুটোর আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাওয়া।...

আর তারপর–না-না, এ-দৃশ্য আমি জীবনের শেষদিন অব্দি ভুলবো না!–শোনা গেছে-স্পষ্ট শোনা গেছে রিনরিনে গলার স্বর। না, না, কোনো রূঢ় রুক্ষ চোয়াড়ে স্বর নয়, যেটা ঘৃণাবিদ্বেষের স্তব গেয়ে অন্য-একটা সন্ধ্যায় আমাদের অপমান করেছিলো--বরং সহজ, সতেজ, উৎফুল্ল, সুরেলা একটা স্বর, যে-গলার স্বর আমাদের চেনা, আমাদের প্রিয়, অর্থাৎ মাইরার কণ্ঠস্বর!

মার্ক, বলে উঠেছে উৎফুল্ল, সুরেলা, রিনরিনে গলা, আর আপনি, মঁসিয়ে অঁরি, আর হারালান–এখানে বসে-বসে কী নিয়ে গুলতানি হচ্ছে সকলের? ডিনারের সময় হলো, আর আমি যে খিদেয় মরে যাচ্ছি!

মাইরা, স্বয়ং মাইরাই! মাইরা–যে তার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে পেয়েছে। মাইরা-যে মাইরা এখন সুস্থ, স্বস্থ, সজ্ঞান!... যে-কেউ শুনে বলতো, সে হয়তো এক্ষুনি সহজভাবে নিজের ঘর থেকেই নেমে এসেছে, যেমন রোজ নেমে আসে ডিনারের আগে। এ এমন এক মাইরা, যাকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না!... এ-যে অদৃশ্য মাইরা!

মাইরার এই সহজসরল কথাগুলো যেভাবে আমাদের চমকে দিয়েছিলো, তেমন। বোধহয় আর-কোনো কথাই পারেনি। চেয়ারে যেন গজাল মেরে কেউ আটকে দিয়েছে। আমাদের, হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা, আমরা বসেই থেকেছি, নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারিনি, কেউই উঠে সেদিকে যাইনি, যেখান থেকে এই গলার স্বর ভেসে আসছিলো। অথচ মাইরা আছে ওখানে, ঐ-তো, জ্যান্ত, সজ্ঞান, আর অদৃশ্য– কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই!...

কোত্থেকে এসেছে সে?... যে-বাড়িতে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাকে লুকিয়ে রেখেছিলো?... সেখান থেকে সে নিজের বুদ্ধিতেই পালাতে পেরেছে। তবে, শহরের মধ্য দিয়ে নিজেই হেঁটে-হেঁটে চলে এসেছে বাড়ি?... আর দরজা ছিলো বন্ধ, কেউই তার জন্যে সাদরে সাগ্রহে দরজা খুলে দেয়নি।

না–তার উপস্থিতির আসলে রহস্যটা বুঝে ফেলতে আমাদের খুব-একটা দেরি হয়নি। যে-ঘরে ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তাকে অদৃশ্য করে রেখে গিয়েছিলো, সেই ঘর থেকেই এসেছে সে। আমরা সারাক্ষণ যখন ভেবেছি তাকে স্টোরিৎস নিশ্চয়ই বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়েছে, সে কিনা তখন তার বিছানা ছেড়েই ওঠেনি। সে পড়ে থেকেছে। সেখানে, এলায়িত, লম্বালম্বি, নড়তে-চড়তে অক্ষম, সারাক্ষণ স্তব্ধ ও সংজ্ঞাহীন–এই চব্বিশ ঘণ্টাই! এটা কারুই মাথাতেও ঢোকেনি যে সে হয়তো তার বিছানাতেই পড়ে থাকতে পারে–আর, সত্যি-তো, এমনটা ভাববেই বা কেন?

ভিলহেল্ম স্টোরিৎস নিশ্চয়ই তক্ষুনি তাকে গুম করে নিয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু শেষ অব্দি সে তাকে কিডন্যাপ করতোই নিশ্চয়ই–যদি-না, আজ সকালেই, কাপ্তেন হারালানের তলোয়ারের ফলা চিরকালের মতো তার সে-সাধ ঘুচিয়ে দিতো!

আর এখন, এইখানে, অদৃশ্য দাঁড়িয়ে আছে মাইরা–আর সে পাগল নয় এখন সম্ভবত যে-তরল রাসায়নিক তাকে খাইয়ে দিয়েছিলো ভিলহেল্ম স্টোরিৎস তা-ই তাকে সারিয়ে তুলেছে! আর মাইরা জানেও না সেদিন ক্যাথিড্রালের ঐ কেলেঙ্কারির পর থেকে ঝড়ের বেগে কত-কী ঘটে গিয়েছে সারা রাগৎস-এ। মাইরা আমাদেরই মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আমাদের সঙ্গে, আমাদের চোখে দেখতে পারছে। চিনতে পারছে দেখে, কিন্তু এখনও, প্রদোষের আবছায়ায়, এটা বুঝতে পারছে না যে আমরা তাকে চাক্ষুষ দেখতে পারছি না।

মার্ক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার দুই বাহু প্রসারিত, যেন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে...

আর মাইরা বলে উঠেছে, কী ব্যাপার বলো তো, তোমাদের? আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, অথচ তোমরা কোনোই সাড়া দিচ্ছে না। আমাকে দেখে যেন ভূত দেখেছে বলে মনে হচ্ছে তোমাদের? কী হয়েছে, বলো তো?... মা-ই-বা এখানে নেই কেন? মা-র কি শরীর খারাপ করেছে?

আবারও খুলে গিয়েছে দরজা, আর এবার ঘরে এসে ঢুকেছেন ডাক্তার রডারিখ । মাইরা তক্ষুনি নিশ্চয়ই ছুটেই গেছে তার দিকে–অন্তত সেটাই আমরা ভেবেছি, কারণ অবাক হয়ে সে বলে উঠেছে, বাবা!... তোমার আবার কী হলো?... মার্ক আর হারালানকেই বা অমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন?

ডাক্তার রডারিখ অমনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, অভিভূত, স্তম্ভিত-চৌকাঠে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি বুঝে ফেলেছেন সবকিছু। আর মাইরা তাঁর কাছে গিয়ে আদর করে চুমু খেয়েছে তাকে, আবারও জিগেস করেছে, কী ব্যাপার, বলো তো? মা? মা কই?

তোর মা ভালোই আছেন, মাইরা, বলেছেন ডাক্তার রডারিখ। এক্ষুনি নিচে নামবেন। কিন্তু তোর এখন বিশ্রাম করা উচিত্ত মাইরা, বিশ্রাম।

সেই মুহূর্তে মার্ক তার স্ত্রীর হাত খুঁজে পেয়েছে, তাকে আস্তে টেনে নিয়েছে নিজের দিকে, যেন কোনো অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে–অথচ মাইরা তো আর মোটেই অন্ধ নয়, সে-ই বরং সবাইকেই দেখতে পাচ্ছে, আমরাই শুধু তাকে দেখতে পাচ্ছি না। মার্ক তাকে নিয়ে গিয়ে তার পাশে বসিয়েছে...

হঠাৎ তার উপস্থিতি এমন-অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কেন, কিছুই বুঝতে না পেরে, মাইরা বোধহয় একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলো। বিশেষত এবার যখন মার্ক কাঁপা গলায় অস্ফুট কথাগুলো বলেছে, তখন তো আরো : মাইরা!... আমার মাইরা!... এ কি তবে সত্যি তুমি? এ কি তবে সবই সত্য? ... আমি তোমাকে ছুঁতে পারছি এখানে... আমার পাশে!... ওহ্, মাইরা, আর আমায় ছেড়ে চলে যেয়ো না, কিছুতেই না...

মার্ক, তোমায় কেমন যেন বিমূঢ় আর হতভম্ব দেখাচ্ছে-তোমাদের সবাইকেই–যেন আমায় তোমরা ভয় পাচ্ছো!. বাবা, তুমিই বলো। সত্যি বোলো কিন্তু। কোনো কি ঝামেলা পাকিয়েছে?

মার্কের বুঝি মনে হয়েছে যে সে উঠে যাবার চেষ্টা করছে। সে তাকে আবারও আলতো করে টেনে বসিয়েছে, পাশে। না, সে বলেছে, মনখারাপ করার কিছু হয়নি। কোনোই গোল নেই–কোনোই ঝামেলা বাধেনি, কিন্তু মাইরা– আবার-একবার কিছু বলো তুমি– তোমার গলা শুনতে দাও আবার

হ্যাঁ; এই দৃশ্য–এটা আমরা বসে-বসে দেখেছি; এই কথাগুলো–সেও আমরা শুনেছি। আমরা বসে থেকেছি সেখানে, অনড়, নিশ্চল, রুদ্ধানিশ্বাস, আর ভয়ে যেন আধমরা হয়ে আছি সবাই-শুধুমাত্র যে-লোক মাইরাকে তার দৃশ্যরূপ, চাক্ষুষরূপ, মানুষী-আকৃতি ফিরিয়ে দিতে পারতো, সে এখন আর বেঁচে নেই, আর মরবার সময় তার সব রহস্য সব গুপ্তকথাই সে নিয়ে গেছে পরপারে!

.

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এই-যে পরিস্থিতি–যেটা পুরোপুরি আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে-তার কি কোনো মধুর পরিসমাপ্তি হতে পারে? কে এমন হাবা আছে যে এ-কথা ভাববে? সাহস করে সে কে এসে এখন বলবে যে মাইরা এখন চিরকালের মতো দৃশ্যপৃথিবী থেকে মুছে যায়নি? তাকে ফিরে পেয়ে আমরা যেমন উল্লাস বোধ করেছি, তেমনি তীব্র মর্মপীড়াতেও ভরে গিয়েছি। সে কি তবে কোনোদিনই আর তার শ্রী আর লাবণ্য ফিরে পাবে না?

আর এসব প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাবে এ-রকম পরিস্থিতিতে রডারিখ পরিবারের জীবন তখন কেমন করে কাটতে পারতো।

পুরো অবস্থাটা বুঝে ফেলতে বেশি সময় লাগেনি মাইরার। ম্যান্টলপীসের ওপরকার আয়নার সামনে দিয়ে যাবার সময় সে তার আপন প্রতিবিম্ব দেখতে পায়নি... কী-এক শঙ্কায় অস্ফুট-একটা আর্তনাদ করে সে সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমাদের দিকে, বুঝতে পেরেছে যে নিজের ছায়া সে দেখতে পাচ্ছে না...

আর যখন আর্ত কান্নায় সে ভেঙে পড়েছে, আমাদের তাকে খুলে বলতে হয়েছে সবকিছু, আর মার্ক সারাক্ষণ তার চেয়ারের পাশে নতজানু হয়ে বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে-মিথ্যেই চেষ্টা করেছে তাকে শান্ত করতে। দৃশ্য-মাইরাকে সে ভালোবাসতো, সে অদৃশ্য-মাইরাকেও ভালোবাসবে। একইরকম। আর এই কথা শুনে মাইরার বুকটা যেন ফেটে গিয়েছে।

পরে, রাত্তিরে, ডাক্তার রডারিখ মাইরাকে চাপ দিয়েছেন, তাড়া দিয়ে বলেছেন একবার তার মায়ের ঘরে যাওয়া উচিত। দূরে-দূরে সরে-থাকার চাইতে মায়ের কাছাকাছি থাকাই ভালো, অন্তত কথা তো বলতে পারবে।

আর এভাবেই কেটে গিয়েছে কয়েকটা দিন। আমাদের আশ্বাস যে-সান্ত্বনা দিতে পারেনি, সময় সেটা দিয়েছে; মাইরা মেনে নিয়েছে তার এই নিয়তি। তার মনের জোর নিশ্চয়ই প্রচণ্ড, নইলে আমাদের দিনাদৈনিক জীবনযাপনের ধরন আবার সেই অভ্যস্ত পথে ফিরে যেতে কী করে। সারাক্ষণ কথা বলেই সে বুঝিয়ে দিতো যে সে আমাদের কাছে-কাছেই আছে। আমার এখনও মনে পড়ে সে কেমন করে শুরু করতে দিন

এই-যে বন্ধুরা, শোনো, আমি কিন্তু কাছাকাছিই আছি... কিছু চাই তোমাদের? ঠিক আছে, আমি এনে দিচ্ছি।... অঁঁরি, তুমি কী চাচ্ছো, বলো তো?-ওহ, যেবইটা টেবিলে ফেলে রেখে এসেছো?... এই-যে, নাও তোমার কেতাব।... তোমার কাগজ? সে-তো তোমার পাশেই পড়ে গিয়েছে।...

বাবা, দিনের এই সময়েই রোজ তোমাকে চুমু খেতুম... হারালান, তুই আবার অমন দুঃখী-দুঃখী মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?... তোকে তো কতবার বলেছি, আমি সবসময় হাসিখুশি থাকি, তাহলে তোরই বা অমন মনখারাপ করার কী হলো? ... আর মার্ক, এই-যে, এই নাও আমার দুই হাত।... বাগানে বেড়াতে যেতে চাও? চলো। ... অঁঁরি, দেখি, তোমার হাতটা দাও-তো, চলো... বিস্তর গুলতানি করার আছে আমাদের... জবর আড্ডা দেয়া যাবে।

বাড়ির লোকের অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় কোনো বদল আসুক, এটা সে কিছুতেই চায়নি। সে আর মার্ক অনেকক্ষণ ধরে সময় কাটিয়েছে রোজ, আর স্ফুট-অস্ফুট স্বরে কখনও তার মধুর গুঞ্জন সে থামায়নি, কেননা সারাক্ষণ তাকে ভরসা জুগিয়ে যেতে চেয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে ভবিষ্যতের ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তার, একদিন নিশ্চয়ই এই অদৃশ্যমানতা ঘুচে যাবে... কিন্তু সত্যি কি ভেতরে-ভেতরে এমনতর কোনো আস্থা তার আছে? বা ছিলো?

একটা বদল, শুধু-একটাই, এসেছে আমাদের জীবনে। মাইরা বুঝতে পেরেছে এ অবস্থায় তার উপস্থিতি আমাদের কাছে কতটা বেদনাদায়ক হবে, তাই সে খাবারটেবিলে ককখনো এসে আমাদের সঙ্গে বসে না। আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পরই এসে সে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, ড্রয়িংরুমে। দরজা খুলে যায়, বন্ধ হয়, আর সে বলে ওঠে : এই-যে বন্ধুরা, আমি এসে গেছি! আর তারপর একেবারে শুভরাত্রি না-জানানো অব্দি সারাক্ষণ আমাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে কাটায়।

এটা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই, মাইরা রডারিখের উধাও-হয়ে-যাওয়াটা শহরে যে-তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছিলো, তার পুনরাগমন–না কি পুনরাবির্ভাব?-শহরে তার চেয়েও ঢের-বেশি হুলুস্থুল তুলেছিলো।

চব্বিশে জুন সকালবেলায় মার্ক আড়ালে ডেকে নিয়ে কথা বলেছে আমার সঙ্গে, আগের চাইতে তার অস্থিরতা অনেক কম এখন। বলেছে, অঁরি, আমি যে-সিদ্ধান্তটায় এসে পৌঁছেছি তাতে তোমারও সায় চাই। আমার স্থির বিশ্বাস, এটা তুমি অনুমোদন করবে।

তুই পুরো ভরসা রেখেই সব বলতে পারিস আমাকে, আমি তাকে বলেছি, আমি জানি তুই অযৌক্তিক-কিছু বলবি না।

যুক্তি, তবে মোটেই আবেগহীন নয়, অঁরি। মাইরা তো এখনও, সত্যি-বলতে, আমার আংশিক বউ-আমাদের বিয়ে কিন্তু ক্যাথিড্রালে পুরোপুরি সাঙ্গ হয়নি, চার্চের অনুমোদনের কথাগুলো তখনও বলা বাকি ছিলো। কিন্তু আধাশেঁচড়া বিয়ের তো কোনো মানে নেই, আমি তাই চাচ্ছি এই অবস্থার শেষ হোক । মাইরার জন্যে তো বটেই, তার বাড়ির লোকের জন্যেও ওটা জরুরিই–আর আমাদেরও এটা দরকার।

আমি আবেগের বশে মার্কের হাত চেপে ধরেছি।আমি তোর কথা বুঝতে পারছি, মার্ক, এতে বাধা কোথায়, তা তো আমি ভাবতে পারছি না–

যাজক যদি মাইরাকে দেখতেই না-পান, মার্ক বলেছে, ব্যাপারটা কেমনতর যেন ঠেকবে, তবু তিনি-তো শুনতে পাবেন যে মাইরা নিজের মুখে উচ্চারণ করছে সে আমাকে স্বামী হিশেবে গ্রহণ করতে রাজি আছে। আমিও ঘোষণা করবো যে আমি কাকে আমার বিবাহিতা পত্নী বলে গ্রহণ করলুম। চার্চের বিধানকর্তারা এতে কোনো আপত্তি করবেন বলে আমার মনে হয় না।

আমিও তো আপত্তির কোনো কারণ দেখছি না। তুই মিথ্যে কিছু ভাবিসনে, মার্ক, আমি গিয়ে এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করছি।

আমি যখন প্রধানযাজকের সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তার আগেই আমি তার সহকারীদের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি কোনো মুশকিল দেখা দিতে পারে কি না। বুড়ো যাজক

আমায় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে ব্যাপারটা নিয়ে তারা আগেই একটা ফয়সালা করে নিয়েছেন-খোদ রাগৎস-এর আর্চবিশপ বিয়েটার অনুমোদন দিয়েছেন। সে অদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু এতে তো কোনো সন্দেহই নেই যে নববধু বেঁচেই আছে, আর সেইজন্যে সে বিয়েও করতে পারে। আগেই তো বিয়ের তিন-চতুর্থাংশ অনুষ্ঠান সরকারিভাবেই ক্যাথিড্রালে সম্পন্ন হয়েছিলো, তাই ঠিক হলো আগামী দোসরা জুলাই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

পয়লা জুলাই রাতে মাইরা আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে, যেমন সে আগের বারও করেছিলো, কালকে কিন্তু, অঁঁরি। ভুলো না যেন!

প্রথম অনুষ্ঠানটির মতোই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন হয়েছে সন্ত মিখায়েলের ক্যাথিড্রালে। আর একইভাবে আসর সরগরম হয়েছে, একই অতিথিরা এসেছে-আর ঝেটিয়ে এসেছে শহরের লোক, চার্চ থেকে বাইরেও উপচে পড়েছে ভিড়। এটা ঠিক যে, ভিলহেল্ম স্টোরিৎস আর বেঁচে নেই। তার সাগরেদ হেরমান এখন কয়েদখানায় । তবু যদি-লোকের বুকের মধ্যে ধুকপুক করছিলো শঙ্কা–সেই জার্মানের প্রেতাত্মা এসে আবার নতুন-কোনো ঝামেলা পাকায়!

কিন্তু আবার নতুন করে ক্রমানুযায়ী পর-পর শেষ হয়েছে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব, আর খ্রিষ্টযাগ শেষ হবার পর, বুড়ো প্রধানযাজক সকলের সামনে কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগেস করেছেন :

মাইরা রডারিখ, তুমি কি এখানে আছো?

হ্যাঁ, আমি এখানেই আছি।

বুড়ো যাজক মার্ককে বলেছেন :.মার্ক ভিদাল, তুমি কি এখানে-উপস্থিত মাইরা রডারিখকে তোমার বিবাহিতা পত্নী বলে গ্রহণ করতে সম্মত আছো?

আছি। বলেছে মার্ক।

মাইরা রডারিখ, তুমি কি এখানে-উপস্থিত মার্ক ভিদালকে তোমার বৈধ পতি রূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত আছো?

আছি। এমন স্বরে মাইরা কথাটা বলেছে সে ক্যাথিড্রালের মধ্যে সমবেত সকলের কানে গিয়ে পৌঁছেছে কথাটা : আছি।

মার্ক ভিদাল আর মাইরা রডারিখ। প্রধানযাজক তখন ঘোষণা করেছেন, আমি তোমাদের ধর্মস্বীকৃতভাবে বিবাহিত পতি-পত্নী বলে ঘোষণা করছি।

অনুষ্ঠানের পর, ভিড়, দু-ভাগ হয়ে দু-পাশে সরে গিয়েছে, যাতে নবদম্পতি অনায়াসে হাত-ধরাধরি করে হেঁটে যেতে পারে। বিয়ের অনুষ্ঠানে এমন সময় একটা বিকট হৈ-হট্টগোল হয় সাধারণত, তেমন উৎকট-কিছুই এবারে কিন্তু হয়নি। সবাই চুপ করে থেকে, গলা বাড়িয়ে দেখতে চেয়েছে আশ্চর্য-কিছু, অসম্ভব-কিছু। কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে নড়েনি–তবে কেউই আবার সকলের আগেভাগে গিয়ে দাঁড়াতে চায়নি। . কৌতূহল যেমন তাদের হিড়হিড় করে টেনে এনেছে এখানে, তেমনি কী-একটা অজানা আশঙ্কাও যেন তাদের ঘাড় ধরে টেনে রাখতে চেয়েছে পেছনে।

আর একটু-হয়তো-অস্বস্তিতেই ভুগছে এমন দু-ভাগ ভিড়ের মধ্য দিয়ে বর-বধু, তাদের স্বামীরা, স্বজনবন্ধুরা, সবাই হেঁটে গিয়েছে ক্যাথিড্রালের নথিসেরেস্তা রাখার টেবিলের দিকে, সেখানে খুলে রাখা সেরেস্তায় মার্ক ভিদালের স্বাক্ষরের পাশে যুক্ত হয়েছে আরো-একটি নাম, মাইরা রডারিখ, যে-নামটি স্বাক্ষর করেছে এমন-একটি হাত, যাকে কেউই দেখতে পায়নি–যাকে কেউই কোনোদিনও দেখতে পাবে না।

.

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এইই ছিলো সেই দিন, দোসরা জুলাই, ১৭৫৭; এই অদ্ভুত কাহিনীর তুঙ্গমুহূর্ত, যেটা কোন-এক আজব খেয়ালে আমি পরে বসে-বসে লিপিবদ্ধ করেছি। কবুল করি যে সকলেরই এটা অবিশ্বাস্য ঠেকবে–আজগুবি যদি না-ও ঠেকে। আর তা যদি হয় তাকে ধরে নিতে হবে এই অনভ্যস্ত লেখকের অক্ষমতা হিশেবে। কাহিনীটা কিন্তু যতই অবিশ্বাস্য ঠেকুক, সর্বৈব সত্য, এর একটি কথাও মিথ্যে নয়–আর যদিও অতীত আখ্যান হিশেবে অদ্বিতীয় বলে ঠেকবে, আমি আশা করবো ভবিষ্যতেও এই কাহিনী যেন অদ্বিতীয়ই থেকে যায়। আর-কারু জীবনে এমন-কিছু ঘটে যাক, তা আমি চাইবো না।

বাহুল্য হবে বলা যে, মার্ক আর মাইরা আগে যে-পরিকল্পনা করেছিলো, এখন তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন আর ফ্রানসে যাবার কোনো কথাই ওঠে না, আর এও বুঝতে পেরেছি পরেও শুধু ক্কচিৎ-কখনোই মার্ক পারী আসবে-সে বরং চিরকালের জন্যে এই রাগৎসেই বাসা বাঁধবে। আমার যতই খারাপ লাগুক, এ-ব্যাপারটা শেষ অব্দি আমায় মেনেই নিতে হয়েছে।

মার্ক আর মাইরার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে তারা যদি ডাক্তার ও মাদাম রডারিখের কাছাকাছিই বাসা বাঁধে। সময় একসময় এই ঘনিষ্ঠতাকেই নিবিড় করে তুলবে, আর মার্কও এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সে-যে সবসময়েই কাছে আছে, এই ধারণাটা তৈরি করে দিতে ক্রমেই পটীয়সী হয়ে উঠেছে মাইরা, আমরা সবসময়েই বুঝতে পেরেছি সে কোথায় আছে, কী করছে। সে-ই যেন বাড়ির আত্মা–আর আত্মার মতোই। অদৃশ্য ।

আর সত্যি-বলতে, তার পার্থিব অস্তিত্ব পুরোটাই তো আর ঘুচে যায়নি, মার্ক তার যে-আশ্চর্য ছবিটা এঁকেছিলো, সেটা কি টাঙানো নেই দেয়ালে–সবসময়? মাইরার। সবচেয়ে ভালো লাগতো তার পাশে বসতে, আর আশ্বাস দিয়ে বলতে;এই-তো আমি, আবারও দৃশ্যমানা, আমি যেমন নিজেকে দেখতে পাচ্ছি তেমনি তোমারও তো আমায় দেখতে পাচ্ছো।

বিয়ের পর আরো-কয়েকটা সপ্তাহ আমি কাটিয়েছি রাগৎস-এ। আর পুরো সময়টাই অন্তরঙ্গভাবে কাটিয়েছি রডারিখ-ভবনে–কী বিষম সংকটেই যে পড়েছিলো এই চমৎকার পরিবারটি। একদিন এদের সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবলেই আমার ভারি কষ্ট হতো, কিন্তু সবচেয়ে লম্বা ছুটিও তো একদিন শেষ হয়ে যায়, আর আমাকেও পারী। ফিরে যেতে হবে, আমার জীবিকার ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে।

আবারও আমি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি ফ্রাসে এসেলোকে কী ভাবে জানি না, আমার এনজিনিয়ারিং-বিদ্যা এখন আমার আরো-ভালো লেগেছে। অথচ অনিচ্ছুক আমাকে যে-আশ্চর্য ঘটনাগুলোর উত্তাল ঘূর্ণিপাকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো, তা ছিলো এতই রহস্যময় ও চমকপ্রদ যে আমি কখনোই ঘটনাগুলো ভুলতে পারিনি। কেবলই থেকে-থেকে, ঘুরে-ঘুরে, ফিরে গিয়েছি ঘটনাচক্রের আবর্তের মধ্যে, আমার মন বারেবারে উড়ে গিয়েছে রাগৎস-এ, মার্ক আর মাইরার কাছে, যারা সবসময় ই আছে আমার মনের মধ্যে, অথচ শরীরীভাবে কতটাই না দূরে!

পরের বছর জানুয়ারি মাসে আমি যখন আবার সহস্রাধিক-একবার সেই ভয়ানক দৃশ্যটা মনশ্চক্ষুকে দেখছি যেখানে কাপ্তেন হারালানের তলোয়ারের ফলা বিধে গিয়েছিলো ভিলহেল্ম স্টোরিসের বুকে, হঠাৎ ধ্বক করে লাফিয়ে উঠেছে আমার উত্তাল হৃৎপিণ্ড! এত সহজ, এত স্বতোপ্রকাশ, এত সরল এই সমাধান যে আমি নিজেই তাজ্জব হয়ে গেছি এতদিন কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি বলে। কী হাঁদা আমি, আকাট বোকা একটা! কোথায় অ্যাদ্দিন চাপা পড়ে ছিলো আমার বুদ্ধিশুদ্ধি, যুক্তির বোধ, কোন-সে অন্ধ আবেগের আলোড়নে তা হারিয়ে গিয়েছিলো? দুয়ে-দুয়ে চার করবার কথাটা কি-না একবারও আমি ভাবিনি, অথচ আমি কিনা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলুম সব ঘটনার!

সেদিন চোখের সামনে ভেলকির মতো ভিলহেল্ম স্টোরিৎসের অদৃশ্য নিপ্রাণ দেহ গলগল করে রক্ত বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে পেয়েছিলো তার দৃশ্যমানতা! যেন হঠাৎ আলোর-ঝলকানিতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো, দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ফুটে উঠতেই। আরে! যে-রহস্যময় রাসায়নিক রক্তে মিশে গিয়ে তাকে অদৃশ্য করে তুলেছিলো, রক্তস্রাবের সঙ্গে-সঙ্গে তা তার শিরাগুলো থেকে বেরিয়ে গেছে, আর তাকে দৃশ্যমান করে তুলেছে!

হারালানের অসির ফলা যা করতে পারে, কোনো শল্যচিকিৎসকের ছুরির ফলাও তো তা-ই করতে পারে! অর্থাৎ যা চাই, তা শুধু কোনো শল্যচিকিৎসকের ওস্তাদ হাতের কারসাজি–একবারে যদি না-ও হয়, একাধিকবার অপারেশনের পর, ব্যবচ্ছেদের পর, তা তত সহজেই সম্ভব! মাইরা যে-রক্ত হারাবে, নতুন রক্ত গজাবে সে-জায়গায়, আর এমন-একদিন তারপর প্রভাত হবে যেদিন ঐ অভিশপ্ত রাসায়নিক আর একবিন্দুও থাকবে না তার ধমনীতে।

তক্ষুনি, প্রায় ভূতে-পাওয়ার মতোই আমি মার্ককে চিঠিতে লিখে জানিয়েছি সব, কিন্তু চিঠিটা ডাকে দেবার আগেই, হঠাৎ দেখি মার্কেরই কাছ থেকে একটা চিঠি এসে হাজির হয়েছে। আর তা পড়ে মনে হয়েছে এখন–অন্তত আপাতত-এ-চিঠিটা আর না-পাঠানোই ভালো, কারণ আমার পরামর্শ আপাতত তাদের কোনো কাজেই আসবে না। সে চিঠি লিখে জানিয়েছে, সে বাবা হতে চলেছে। এখন কোনো রক্তস্রাব না মাইরার না তার বাচ্চার পক্ষে ভালো হবে।

আমার ভাইপো-বা ভাইঝি–জন্মাবে মে মাসের শেষ দিকে । শুনে আমি অমনি সব ব্যবস্থা করেছি, আর ঠিক পনেরোই মে ১৭৫৮-তে গিয়ে ফের হাজির হয়েছি রাগংস-এ। মার্কের মতো, নবজাতকের বা নবজাতিকার জন্যে আমার অধীরতাও খুব কিছু কম নেই।

জন্ম হলো সাতাশে মে–আর সেইদিনটা আমার স্মৃতি থেকে কোনোদিনই আর মুছে যাবে না। লোকে বলে, অঘটন আজও ঘটে, আজও অলৌকিক এসে প্রমাণ করে দেয় ঈশ্বরের অপার করুণা। আর সেদিন যে-অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিলো, আমি অঁরি ভিদাল, এনজিনিয়ার, তার জলজ্যান্ত সাক্ষী।

কেননা অঘটনই এটা-তেমনি অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য। প্রকৃতি নিজেই মঙ্গল বর্ষায় আমাদের ওপর, মানুষের কোনো উদ্ভাবনী কৌশলের প্রয়োজনই হয় না সবসময়। মাইরা ঐ সাতাশে মে ল্যাজারাসের মতোই কবর থেকে উঠে এসেছে। মার্ক, হতভম্ব, ভ্যাবাচাকা; উল্লাসে কী-যে করবে ভেবেই পাচ্ছিলো না। একসঙ্গে দুজনের জন্ম দেখেছে। সেতার বাচ্চার এবং বাচ্চার মায়ের–মাইরাকে যেন আরো-সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন এতদিন চোখের

আড়ালে লুকিয়েছিলো বলেই। সন্তানের জন্ম দেবার সময় যে অজস্র রক্তস্রাব হয়েছে, তা থেকেই ফের দৃশ্যমানতায় ফিরে এসেছে মাইরা–আর নতুন করেই তার যেন জন্ম হয়েছে, কোনো শল্যচিকিৎসকের আর সাহায্য লাগেনি। আর, বলে রাখি, ভাইপোই হয়েছে আমার।

আর নবজাতক আর তার মাকে দেখতে গিয়ে আমি শুধু মনে-মনে প্রার্থনা করেছি : ঈশ্বর করুন, আর-কেউ যেন কোনোদিনও ভিলহেল্ম স্টোরিসের ঐ গুপ্তরহস্য পুনরাবিষ্কার না-করে। অদৃশ্য হবার কৌশল জেনে আমাদের কোনো লাভ নেই। আমরা চাই দৃশ্যমানকে-ইন্দ্রিয়গম্য কোনো রূপ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো আকৃতি, যাকে আমরা দু চোখ ভরে সারা জীবন দেখতে পারবো।